উমরাও জান

মির্জা মুহাম্মদ হাদী রুসওয়া

অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

মির্জা মোহাম্মদ হাদি রুসওয়া'র উপন্যাস

উমরাও জান

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
অনূদিত

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.pathagar.com

প্রকাশক | মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল | ফেব্রুয়ারি ২০০৭
মাঘ ১৪১৩

প্রচ্ছদ | ফরিদী নুমান

বর্ণবিন্যাস | ইয়াশা কম্পিউটার
২০ পি কে রায় লেন, বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ | নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য | একশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

UMRAO JAN—by Mirza Muhammad Hadi Ruswar—Translated by Anwar Hossain Manju, Published by Ahmed Publishing House, Dhaka-1100. First Edition : February 2007

Price : Tk. 175.00 only.

ISBN 984-11-0592-2

www.pathagar.com

ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকা

উমরাও জানা আদা ও তার স্রষ্টা
মির্জা মোহাম্মদ রুসওয়া

'উমরাও জান আদা' উপন্যাসটির ভূমিকায় মির্জা মোহাম্মদ হাদি রুসওয়া বর্ণনা দিয়েছেন যে তিনি কিভাবে লক্ষ্ণৌর বাঈজির কাহিনী লিখতে উদ্বুদ্ধ হলেন;

"প্রায় দশ বছর আগে আমার এক বন্ধু মুনশী আহমদ হোসাইন, যিনি দিল্লির কাছাকাছি কোথায়ও থাকতেন, তিনি লক্ষ্ণৌতে আসেন এবং পতিতা পল্লী চকে এক বাড়ির দোতলায় কক্ষ ভাড়া নেন। সেখানে একদল বন্ধু মিলিত হতো এবং মধুর কয়েকটি ঘন্টা কাটাতো কবিতা আবৃতি ও কবিতার ওপর আলোচনা করে।

মুনশী আহমদ হোসাইনের পাশের ঘরটিই ছিল এক বাঈজি'র যার আচার পদ্ধতি তার পেশার অন্যান্য মহিলাদের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। তাকে কখনো বারান্দায় দেখা যেত না এবং কোন দর্শনার্থী তার কাছে গেছে এমনও কখনো জানা যায়নি। তার ঘরের জানালাগুলো ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল এবং রাস্তামুখী দরজা সবসময় বন্ধ থাকতো। তার ভৃত্যরা বাড়িতে প্রবেশ করতে ব্যবহার করতো পিছনের দরজা। মুনশী আহমদ হোসাইনের কক্ষ থেকে বাঈজি'র ঘরে যাওয়ার একটি পথ থাকলেও সেটি তা লৌহ দন্ড দিয়ে স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ ছিল। কখনো কখনো আমরা রাতের বেলায় এক মহিলাকে গান গাইতে শুনতাম এবং সেটিই ছিল সেই ঘরে জীবিত কারো অস্তিত্বের আভাস।

এক সন্ধ্যায় আমরা বরাবরের মতো গজল চর্চা করছিলাম। আমি কয়েকটি লাইন আবৃতি করার পর পাশের ঘর থেকে কোমল কণ্ঠে প্রশংসা ভেসে এলো, 'ওয়াহ! ওয়াহ!' এতে আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। মুনশী সাহেব জোরে বলে উঠলেন, "এভাবে কোন কবির প্রশংসা করা শোভন নয়। আপনি যদি কবিতার ভক্ত হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপস্থিতি দিয়ে আমাদের ধন্য করছেন না কেন?" কেউ কোন উত্তর দিল না। আমরা আমাদের মুশায়রা'য় ফিরে গেলাম।

কিছুক্ষণ পরই একজন পরিচারিকা ভিতরে এসে জানতে চাইলো, "আপনাদের মধ্যে মির্জা রুসওয়া কে?" আমার বন্ধুরা আমাকে দেখিয়ে দিল। "আপনি কি মেহেরবানী করে আমার মালকিনের সাথে একটু কথা বলে তাকে কৃতার্থ করবেন?" সে প্রশ্ন করলো।

www.pathagar.com

"আমি কি জানতে পারি তোমার মালকিন কে?"

"আমাকে মাফ করবেন জনাব, তার পরিচয় প্রকাশের অনুমতি দেয়া হয়নি আমাকে? আমার বন্ধুরা আমাকে খোঁচা দিতে লাগলো, কোন না কোন সময়ে তোমার সাথে তার ভালো পরিচয়ে হয়েছে, তা না হলে তিনি কেন এভাবে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন?"

আমি তখনো মাথা চুলকাচ্ছিলাম মহিলা সম্পর্কে কিছু আন্দাজ করতে পারি কিনা, পরিচারিকা বলে উঠলো, "জনাব, আমার মালকিন আপনাকে ভালো করেই চেনেন, সে জন্যেই তিনি চান যে আপনি তার সাথে সাক্ষাৎ করুন।"

পরিচারিকাকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন বিকল্প ছিল না।

দেখা গেল ওই মহিলাটিই উমরাও জান, যাকে রুসওয়া বহু বছর আগে চিনতেন। প্রাথমিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর রুসওয়া উমরাও জানকে পীড়াপীড়ি করে রাজী করালেন মুনশী আহমদ হোসাইনের ঘরের বারান্দায় চিকের আড়ালে এসে বসতে। এ ঘটনাকে রুসওয়া বর্ণনা করেছেন এভাবে;

"গ্রীষ্মের চন্দ্রালোকিত এক রাত। মুনশী সাহেবের বারান্দা পানি সিঞ্চিত জায়গাটিকে শীতল করার জন্যে। মেঝেতে গালিচা বিছানো এবং তার ওপর সাদা চাদর। কুমোরদের তৈরি নতুন সোরাহি থেকে মাটি ও নির্মল পানির সুবাস ভেসে আসছে। সোরাহিগুলো কার্ণিশে সাজানো। সুগন্ধি পান রাখা হয়েছে রিকাবে। হুক্কায় জড়ানো ফুলের মালা এবং তামাকের ধোঁয়ায় আগরবাতির গন্ধ। চাঁদের আলো ছাড়াও আলো ছড়াচ্ছে কাঁচের আঁধারে ঢাকা কেঁপে কেঁপে উঠা মোমবাতির শিখা। মোমবাতি রাখা হলো কবির সামনে, অর্থাৎ তার আবৃতির পালা।

মুশায়রায় উমরাও জান একটি কবিতা আবৃতি করলো, যার শেষ লাইনগুলো ছিল :

কে শুনবে আমার বেদনার্ত হৃদয়ের কাহিনী
আমি বিক্ষিপ্ত ঘুরেছি বিশাল এই পৃথিবীতে
আরো অনেক কিছু শেখার আছে আমার।

লাইনগুলো রুসওয়াকে উদ্বুদ্ধ করলো উমরাও জানকে তার জীবন কাহিনী তাকে বলার জন্যে। উমরাও জান কাহিনী বললো বেশ কিছু বৈঠকে, যা পরবর্তীতে গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিলেন রুসওয়া, অবশ্য উমরাও জানকে দেখিয়ে নেয়ার পর।

উমরাও জান এবং সুলতান সাহিব নাম দু'টি ইতিপূর্বে অসম্পূর্ণ এক উপন্যাস 'আফসহাই রাজ' এ প্রকাশ পেয়েছিল। রুসওয়া নাম দু'টি উদ্ধার করেছিলেন তার পরিত্যক্ত কাজ থেকে এবং নতুন উপন্যাসে তাদের চরিত্রে কিছুটা পরিবর্তন নিয়ে

www.pathagar.com

আসেন। 'আফ্‌সহাই রাজ' এর উমরাও জানের গায়ের রং কালো, দীর্ঘাকৃতির, মুখে বসন্তের দাগ এবং চেহারায় কিছুটা ছিনালীপনার ছাপ, এছাড়া উল্লেখ ছিল যে, তার নাচ সহনীয় পর্যায়ের হলেও গায়িকা হিসেবে একেবারেই বাজে। এই উপন্যাসের উমরাও জান আদা মোটামুটি আকর্ষণীয় হলেও সংস্কৃতিবান মহিলা, আচরণ মার্জিত এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে রুসওয়া তার ব্যক্তিত্ব ও কণ্ঠে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকায় একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যাতে তার নায়িকা দাবি করেছে যে গ্রন্থটিতে তার চরিত্রের সত্যিকার ও বিশ্বস্ত প্রতিফলন যাতে ঘটে।

"আমার যুক্তি লুণ্ঠন করে সে এখন
হাসছে এবং বলছে, আমার চিত্র যাতে
আমার মুখের মতোই সুন্দর হয়।"

যে চরিত্রের অস্তিত্ব নেই মির্জা রুসওয়া তা সৃষ্টি করায় বিশ্বাসী ছিলেন না। 'আফ্‌সহাই রাজ' এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন; এই পৃথিবীতে সবচেয়ে লাভজনক ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের জীবনে যা ঘটে সেগুলো; শুধু বাইরের আচরণগত দিক নয়, তাদের ভিতরের অনুভূতি ও ভাবনাগুলোও। এসব বিষয় একটি উপন্যাসের মাধ্যমেও ফুটিয়ে তোলা সম্ভব যদি এই চিত্রগুলো বিশ্বস্ততার সাথে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। কিছু ব্যক্তির জীবন কাহিনীকে আমাদের উপন্যাসের ভিত্তি হিসেবে নেয়ার চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের নিজেদেরকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সমস্যার মধ্যে ফেলা অনাবশ্যক, যাদের সম্পর্কে আমরা প্রকৃতপক্ষে বিস্তারিত কিছুই জানিনা। আমাদের বন্ধু ও আত্মীয় স্বজনের পরিমন্ডলেই এমন অনেক অভিজ্ঞতা থাকতে পারে যেগুলো সত্যিকার অর্থেই উদ্ভুত ও আকর্ষণীয়। সমস্যা হচ্ছে, আমরা সেসব বিষয়ে মনোযোগ দেই না, কারণ আলেকজাণ্ডার, গজনীর মাহমুদ, অষ্টম হেনরি, রানী অ্যানে, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো ব্যক্তিদের নিয়ে লিখিত মোটামোটা ইতিহাস গ্রন্থ ঘাঁটার মতো সময় আমাদের নেই।" লক্ষ্ণৌর বাঈজি মির্জা রুসওয়ার কল্পনা বা নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। সে লক্ষ্ণৌতে নিজস্ব পেশায় নিয়োজিত ছিল এবং তার জীবন ও প্রেম নিয়ে রুসওয়ার করণীয় কিছু ছিল না।

মির্জা মোহাম্মদ রুসওয়ার জীবনী

মির্জা মোহাম্মদ রুসওয়ার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায় না এবং তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণীও স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। রুসওয়া নিজের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, তার পূর্ব পুরুষরা ভারতে আসেন পারস্য থেকে এবং তার প্রপিতামহ অযোধ্যার নওয়াবের সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা ছিলেন। যে রাস্তার পাশে তাদের পরিবারের বাসস্থান ছিল এখনো সেটি 'আজিটুন কি গলি' (Adjutant's Lane) নামে পরিচিত। তার দাদা ও পিতা গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন, শুধু এটুকুর উল্লেখ ছাড়া রুসওয়া তাদের সম্পর্কে আর কিছু বলেননি।

www.pathagar.com

১৮৫৭ সালে লক্ষ্মৌ শহরে মির্জা রুসওয়ার জন্ম এবং সেখানেই তিনি প্রাথমিক পড়াশুনা শেষ করেন। তার ষোল বছর বয়সে তার বাবা মা মারা যান এবং মামার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন, যিনি তাকে তার পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশ থেকে বঞ্চিত করেন। রুসওয়ার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠে সে সময়ের বিখ্যাত এক লিপিকার হায়দার বখশের সাথে। তিনি রুসওয়াকে যে শুধু পড়াশুনা শিখিয়েছেন তাই নয়, তার প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তাও করেছেন। (হায়দার বখশ রাজস্ব টিকেট জাল করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি ধরা পড়েন এবং দীর্ঘ মেয়াদের কারাদন্ড লাভ করেন।) অন্যান্য যারা রুসওয়াকে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছেন তাদের অন্যতম বিখ্যাত উর্দু কবি দাবীর।

রুসওয়া বাড়িতেই পড়াশুনা করে ম্যাট্রিকুলেশন এবং মুনশী ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি রুরকি'র থমাসন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে ওভারশিয়ার হিসেবে ডিপ্লোমা নেন। কিছুদিনের জন্যে তিনি রেলওয়ে বিভাগে চাকুরি নিয়ে বালুচিস্তানে রেললাইন স্থাপনের কাজ তত্ত্বাবধান করেন। এই ব্যস্ততার বছরগুলোতেও তিনি লেখা ও পড়াশুনা অব্যাহত রেখেছিলেন। তার আগ্রহের বিষয় ছিল রসায়ন শাস্ত্র, আল কেমি ও জ্যোতির্বিদ্যা। কিছুদিন সরকারী চাকুরি করার পর তিনি পদত্যাগ করেন লক্ষ্মৌতে ফিরে আসেন শিক্ষকতার কাজ করতে ও লিখার কাজে মনোনিবেশ করতে। স্থানীয় মিশন স্কুলে তিনি শিক্ষকতার চাকুরি পান, এরপর খ্রিস্টান কলেজে লেকচারার হিসেবে যোগ দেন, যেখানে তিনি গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন ও ফারসি পড়াতেন। একসময় তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মৌ ত্যাগ করেন এবং এক বছরের জন্যে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অফ ট্রানস্লেশনে চাকুরি করেন। সত্তরোর্ধ বয়সে তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান এবং সেখানেই ১৯৩১ সালের ২১ অক্টোবর টায়ফয়েডে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

মির্জা মোহাম্মদ রুসওয়া'র প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে যখন তার বয়স ত্রিশ বছর। এটি ছিল একটি দীর্ঘ কবিতা, লায়লা ও মজনুর প্রেম কাহিনীর উপর ভিত্তি করে লিখা। কবিতাটি পাঠকদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। বরং কবিতাটির কিছু অংশের বিরূপ সমালোচনা করেছেন অতি সাধারণ ও নোংরা কবিতা বলে। কিন্তু এ ধরণের সমালোচনা রুসওয়ার উৎসাহকে দমন করতে পারেনি। জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি মাঝারি মানের কবিতা লিখে গেছেন।

রুসওয়ার বয়স যখন পঁয়তাল্লিশ বছর তখন প্রকাশিত হয় 'আফ্সহাই রাজের' প্রথম অংশ। পরবর্তীতে এটির আর হদিস পাওয়া যায়নি। তিন বছর পর প্রকাশিত হয় 'উমরাও জান আদা'। এটি, সাফল্য ছিল আশাতীত। সমালোচকরা সাথে সাথে এই গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন, কারণ তাদের কাছে লক্ষ্মৌর জীবন ও সংস্কৃতির ওপর এটি ছিল সেরা রচনা। উর্দু গদ্য সাহিত্যে রুসওয়ার অসাধারণ দখলেরও প্রশংসা করেন তারা। উপন্যাসটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে যায়। উপন্যাসের বিষয়বস্তুই

www.pathagar.com

যে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ বিক্রির কারণ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপন্যাসের ভাষা শৈলী ও গ্রন্থটিকে সব সময়ের জন্যে বাজারে চালু রেখেছে। তার আরো দু'টি উপন্যাস 'জাত-ই-শরীফ' এবং 'শরীফজাদা' খুব ভালো বাজার পায়নি। কিন্তু এরপর 'আখতারী বেগম' আবার পাঠকদের মাঝে সাড়া তোলে এবং উর্দুভাষী বুদ্ধিজীবীরা এই জীবনীভিত্তিক উপন্যাসের প্রশংসা করেন। রুসওয়ার সেরা দু'টি উপন্যাসের মধ্যে এটি সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করা হয়।

উপন্যাস ও কবিতা ছাড়াও মির্জা মোহাম্মদ রুসওয়া ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ধর্ম ও গ্রীক অধিবিদ্যা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ ছিল তার। অল ইন্ডিয়া শিয়া কনফারেন্সের সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনি এবং শিয়া মতবাদের ওপর বিশ খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেছেন।

সাহিত্য জগতে রুসওয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করা সত্ত্বেও তার সেরা উপন্যাস ও দর্শন ও ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদি তার আর্থিক সচ্ছলতা এনে দেয়নি। বরং তার জীবিকার জন্যে অর্থাগম হয়েছে, 'শয়তানের প্রেম', 'রক্তাক্ত প্রেমিক' 'খুনী রমণী' ইত্যাদি হালকা ধরণের গ্রন্থ থেকে। দ্বৈত মানের সাহিত্য ব্যক্তিত্বের চমৎকার উপমা ছিলেন রুসওয়া। বলা যায় তিনি নিষ্ঠাবান ডঃ জেকিলের মতো, মধ্যরাতে তেল পুড়ে সুক্ষ্ম গদ্য রচনা করেছেন, উর্দু শর্টহ্যান্ড পদ্ধতি উদ্ভাবন অথবা নক্ষত্রের গতিবিধি অবলোকনের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি তিনি মিঃ হাইডের মতো কদর্য—নগরীর পতিতা পল্লীগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং আবর্জনা মন্থন করে তা থেকে সামান্য পরিমাণে হলেও লাভ বের করে আনতে।

রুসওয়ার খামখেয়ালিপনা তাকে তার জীবদ্দশায়ই কাহিনীতে পরিণত করে। তিনি কাজে এতোটাই নিবিষ্ট থাকতেন যে চারপাশের সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যেতেন। এমন একটি কাহিনীও প্রচলিত আছে যে, কোন এক বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষায় তিনি এতোটাই মগ্ন ছিলেন যে, নিজের সন্তানের জানাজায় যেতে অস্বীকার করেছিলেন। কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়ে পড়লে তিনি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে দৈনিক বিশ ঘন্টা করেও কাজ করেছেন, মধ্যরাতে নিজেকে জাগ্রত রাখতে বরফ শীতল পানিতে গোসল করেছেন। তিনি দাম্ভিক প্রকৃতির এবং নিজের প্রতিভার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। কাজ করার ক্ষমতার পাশাপাশি তার স্মৃতিশক্তি ছিল অসামান্য, যার ফলে মাতৃভাষা ছাড়াও উর্দু, ফারসি, আরবি, হিব্রু, ইংরেজি, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখতে সক্ষম হয়েছিলেন অল্প দিনের মধ্যে। তার অন্যান্য আগ্রহের বিষয় ছিল জ্যোতির্বিদ্যা, উচ্চতর গণিত, পানির গতিবিদ্যা, ধাতব বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্র। নিজের জ্ঞানের সীমার বাইরে তিনি আর কোনকিছুই বিবেচনার আনতেন না। লক্ষ্ণৌ শহরে প্রথম যখন সাইকেল এলো, তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সাইকেল চালনা শিখতে অন্যদের কয়েক ঘন্টা লাগলেও এই যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে তার কয়েক সেকেন্ডের বেশী লাগবে না। তিনি কারো সাহায্য ছাড়াই সাইকেলে আরোহণ করেন, সাইকেল থেকে বেকায়দায় পড়ে গিলে কলার বোন ভেঙ্গে ফেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও নির্ভীকের মতো বাড়ি ফিরে এসে নিজেই ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগান এবং নিজের কাজ অব্যাহত রাখেন।

www.pathagar.com

রুসওয়া প্রণয়ী ধরণের লোক ছিলেন। একটি মাত্র প্রেমের ঘটনা তাকে বেশী কাতর করেছিল বলে মনে হয়, যা তার মসনবীর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। এই প্রেম ছিল অ্যাংলো-ফরাসী বাবা মা'র তরুণী কন্যার সাথে যার নাম অগাস্টিন এমইলে। রুসওয়ার মতোই তারও জন্ম লক্ষ্ণৌতে এবং তার মতোই অগাস্টিন ও বাবা মাকে হারায় ষোল বছর বয়েসে। এই প্রেমের ব্যাপারে রুসওয়ার নিজস্ব ব্যাখ্যা যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে মিস অগাস্টিন স্বয়ং রুসওয়াকে পীড়াপীড়ি করেন তার এস্টেটের ম্যানেজার হওয়ার জন্যে। অর্থ সম্পদহীন রুসওয়া অগাস্টিনের ব্যবসাকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং শিগগিরই তার প্রেমিকে পরিণত হন। তিনি অগাস্টিনের সাথে একবার বোম্বেতে বেড়াতে যান এবং একই হোটেলে অবস্থান করেন। এক সকালে অগাস্টিন একটি চিরকুট লিখে কম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যান যে, তিনি ফ্রান্সে যাচ্ছেন তার উত্তরাধিকার দাবি করতে এবং বিষয় চুকে গেলে শিগগিরই ফিরে আসবেন। আর ফিরে আসেননি তিনি এবং অস্থির রুসওয়া পরপর কয়েকটি বিয়ে করে সান্ত্বনা খুঁজে পান। বাঈজিদে সঙ্গলাভও এসময়ে তার প্রিয় ছিল। তার উত্তরসুরীদের অনেকে এখনো অজ্ঞাত অবস্থায় লক্ষ্ণৌতে এবং পাকিস্তানে বাস করছে।

রুসওয়া যেভাবে জীবনযাপন করতেন তার পোশাক পরিচ্ছদও ছিল অনুরূপ অদ্ভুত। তার হাতে যখন অর্থ থাকতো তখন লক্ষ্ণৌর অভিজাতদের মতো বের হতেন ফিনফিনে মসলিনের কুর্তা, সুন্দর ভাঁজ করা পায়জামা, সুচিকর্ম শোভিত টুপি এবং পায়ে মখমলের স্যান্ডেল পরে। কিন্তু অধিকাংশ সময় তিনি কাটাতেন গেঞ্জি ও লুঙ্গি পরে। এই সংক্ষিপ্ত পোশাকেই তিনি তার সব লিখা লিখেছেন অথবা লিপিকারদের বলেছেন মেঝের ওপর মাদুর বিছিয়ে বইপত্র নিয়ে পা আড়াআড়ি করে বসে।

আমার কাছে রুসওয়ার একটি ছবি আছে তার মধ্য বয়সের, ছবিতে তার সাথে তার এক সঙ্গী। দীর্ঘদেহী, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হালকা বাদামী গায়ের রং ছিল তার। পুরু গোঁফ ও সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। তার কপাল প্রশস্ত ও চোখ ছোট।-ফ্যাসফেসে কণ্ঠ ছিল তার। পুরো জীবন তার ভালো স্বাস্থ্য ছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে মির্জা রুসওয়া সর্বকালের সেরা উর্দু গদ্য লেখকদের অন্যতম। বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, তার সকল কাহিনীর স্থান লক্ষ্ণৌ। কারণ লক্ষ্ণৌর লোকজনই সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও পরিশীলিত উর্দুতে কথা বলতো এবং এই উপমহাদেশে উর্দুভাষীরা যে এখনো প্রাধান্য পায় লক্ষ্ণৌবাসীরাই সে কৃতিত্বের দাবীদার। লক্ষ্ণৌবাসীদের মার্জিত শোভনীয়তার কাছে অন্যদের কথাবার্তা নিতান্তই গেঁয়ো মনে হবে এবং তাদের বিনয়ী আচরণের সামনে অন্যদের উদ্ধত ও অমার্জিত মনে হবে। তাদের জীবনযাত্রাও একই ধরণের ছিল—খাদ্য, পানীয়, ধূমপান অভিন্ন। লক্ষ্ণৌর খাবার ভারতের অবশিষ্ট অংশের বাসিন্দাদের মুখে পানি আনে। শুধুমাত্র লক্ষ্ণৌবাসীই জানে কি করে একটি পানের খিলি বানাতে হয় এবং কোন মহিলার কাছ থেকে তা গ্রহণ

www.pathagar.com

করতে কি বিনয় ভাব প্রকাশ করতে হয়, কি করে তা চিবুতে হয় এবং কিভাবে রূপার চিলমচিতে পিক ফেলতে হয়। তাদের এইসব চমৎকার গুণাবলী আরো সুন্দরভাবে দেখা যেতো বাঈজিদের কোঠায়, যেখানে তরুণ অভিজাতদের পাঠানো হতো, যাতে তারা নিজেদেরকে শালীন ও মার্জিতভাবে গড়ে তুলতে পারে। এবং ঘটনাচক্রে তারা জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করতে শিখতো।

লক্ষ্ণৌর সংস্কৃতি ছিল কাব্য ও সঙ্গীত কেন্দ্রিক। অন্যান্য শিল্প ছিল অবহেলিত। যারা নিজেদেরকে সংস্কৃতিবান হিসেবে পরিচিত করতে আগ্রহী ছিল তারা কোন শিক্ষকের শিষ্যত্ব বরণ করতো এবং কিভাবে কবিতা লিখতে হয় তা শিখতো। কাব্য দেবী তাকে আনুকূল্য না করলে তারা কবিতা রচনায় নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করার চাইতে বরং অন্যের কবিতা থেকে চুরি করে হলেও কবি সাজার চেষ্টা করতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঘটনা ছিল মুশায়রা বা কবিতা পাঠের আসর, যেখানে বিখ্যাত সব কবিরা তাদের কবিতা আবৃতি করতেন এবং শ্রোতৃমন্ডলী উচ্ছাসে চিৎকার করে উঠতো, "ওয়াহ, ওয়াহ, মোকাররার, ইরশাদ!" ইত্যাদি। যখনই কিছু বন্ধু একত্রিত হতো সেটি পরিণত হতো মুশায়রায়।

বাঈজিদের অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকতো কবিতা ও সঙ্গীত। তারা স্বয়ং কবিতা রচনা করতো (উমরাও জান আদা নিজে কবিতা লিখতেন) অথবা অন্যদের রচিত কবিতায় সুর দিতো। ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতকে বাঈজিরাই শতশত বছর ধরে সংরক্ষণ করেছে বিকৃতি থেকে রক্ষা করে। 'উমরাও জান আদা' উপন্যাসে আমরা লক্ষ্ণৌর সবকিছুর স্বাদ পাই লক্ষ্ণৌর ভাষা, কবিতা ও সঙ্গীত এবং শহরবাসীর জীবনযাত্রা।

উমরাও জানের প্রেমিকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাদের সবার বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচের হলেও সবই লক্ষ্ণৌর বৈশিষ্ট্য। প্রথমেই বলতে হয় লক্ষ্ণৌর আদর্শ হিসেবে বিবেচিত নওয়াব সুলতান সাহেব। তিনি বিত্তবান, সুদর্শন, মার্জিত ও সংস্কৃতিবান। বেশ্যাপুত্র গওহর মির্জার সাথে তার চমৎকার সম্পর্ক, যে তার ভারুয়া ও আজীবন প্রেমিক হিসেবে ছিল। এরপর আসে কুরুচিসম্পন্ন নব্য ধনী বহিরাগত এক যুবক রশিদ আলী ওরফে রাখ্খান মিয়া, সে উমরাও জানকে বাঈজির পেশায় আনতে পারার কৃতিত্ব দাবি করতো, যদিও তার জানা ছিল না যে, এই কৃতিত্বের আসল দাবীদার গওহর মির্জা। আরেকজন ফয়েজ আলী, উদারমনা দস্যু এবং অপর একজন উকিল আকবর আলী খান, যিনি দিনের বেলায় সাক্ষীদের শিখাতেন কিভাবে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হবে এবং সন্ধ্যায় তিনি নামাজ আদায় করতেন। সত্তর বছর বয়স্ক এক বৃদ্ধেরও টান ছিল উমরাও জানের প্রতি, যিনি সম্পর্কটি বজায় রেখেছিলেন যেহেতু একজন বাঈজির সাথে সম্পর্ক রাখাও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তা না হলে লক্ষ্ণৌতে আভিজাত্য থাকে না।

উপন্যাসে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে এবং লেখক কোন একজনকেও পরিত্যাগ করেননি। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে এই চরিত্রগুলো আবার সামনে আসে এবং

www.pathagar.com

লেখককে সুযোগ দেয় তার শিথিল প্রান্তে গিট দিতে। প্রথম দিকের পৃষ্ঠাগুলোতে দিলওয়ার খানকে দেখা যায় উমরাও জানকে অপহরণ করতে, সে আবার শেষের পৃষ্ঠাগুলোতে আবির্ভূত হয় লুকিয়ে রাখা ধন খনন করতে এবং ধরা পড়ে তার যোগ্য শাস্তি লাভ করে ফাঁসিতে মৃত্যুদন্ডের মাধ্যমে। ছোট্ট রাম দাইও প্রায় একই সময়ে অপহৃত হয়েছিল। সে নওয়াব সুলতান মির্জার বেগমে পরিণত হয়, যিনি তার যৌবনে উমরাও জানের পৃষ্ঠাপোষকদের একজন ছিলেন। রুসওয়ার গল্প বলার ধরণ পিছনের ঘটনা টেনে আনার কৌশল এবং কৌশলটি তার প্রিয়। উপন্যাসের মধ্যে অনেকগুলো আয়না রয়েছে, যা চরিত্রগুলোকে পিছনের দিকে দেখতে সহায়তা করে।

রুসওয়া চমৎকার গল্পকার, কিন্তু কবি হিসেবে নৈর্ব্যক্তিক। দুর্ভাগ্যজনক হলো, তিনি কখনো নিজের এই দিকটি দেখতে সক্ষম হননি এবং তার সুন্দর গদ্যকে কবিতার সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন অনেক ক্ষেত্রে। যার ফলে 'উমরাও জান আদা'র বর্ণনাও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে।

মির্জা রুসওয়া তার কোন লিখা সংশোধন করার তোয়াক্কাও করতেন না। কারণ এটা তার মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। তার অধিকাংশ উপন্যাস রচিত হয়েছে যখন পাওনাদাররা তার দরজার সামনে জড়ো হয়ে শোরগোল করেছে এবং পাওনা আদায় না করে চলে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তার প্রকাশকেরা সবসময় তাকে অগ্রিম অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কোন উপন্যাস বা অনুবাদের জন্যে এং সবসময় তাদের লোকদের বলে দিয়েছে উপন্যাস লিখা শেষ হলেই যেন রুসওয়ার হাতে অর্থ দেয়া হয়। রুসওয়া এ পরিস্থিতির মধ্যেই কাজ করেছেন। সপ্তাহের ছুটির দিনে অবিরাম ডিকটেশন দিয়ে লিখা শেষ করেছেন।

বাজারে 'উমরাও জান আদা'র অনেকগুলো সংস্করণ রয়েছে। সবগুলো এক রকম নয়। আমি চারটি সংস্করণ যাচাই করে সবগুলো থেকে সর্বোত্তম বলে যে অংশ ভেবেছি তা গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রয়োগ করেছি। লেখক স্বয়ং যেহেতু তার কাজের সংশোধন নিয়ে মাথা ঘামাননি, অতএব আমি বহু জায়গায় স্ববিরোধিতা, পুনরাবৃত্তি এবং ঘটনার ভুল বর্ণনা দেখতে পেয়েছি। সেজন্যে আমাকে কিছু কিছু প্যারাগ্রাফ বা লাইন বাদ দিয়ে নতুন লাইন সংযোজন করার স্বাধীনতাও নিতে হয়েছে বাক্যগুলোকে যুক্ত করতে এবং ছোটখাট কিছু ভুল শোধরাতে।

সবশেষে আমি অক্সফোর্ডের সেন্ট অ্যান্টোনি কলেজের গাই উইন্ট (Guy Wint), বৃটিশ কাউন্সিলের জেন ক্রম-জনসন (Jane Croom-Johnson) এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই। যারা এই অনুবাদটি পাঠ করে আমাকে মূলবান পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

খুশবন্ত সিং

www.pathagar.com

উপন্যাসে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব

বহু বেগম (মৃত্যু ১৭৯৪) : অযোধ্যার দ্বিতীয় শাসক নওয়াব সুজা-উদ-দৌল্যাহ'র স্ত্রী। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কবর ফৈজাবাদে।

বেগম মালিকা কিশওয়ার : নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহের মা। তিনি তার কণিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা। শাহজাদা সিকান্দার হাশমতের সাথে ইংরেজদের কাছে গিয়েছিলেন অযোধ্যায় তার বংশের শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলতে। ১৮৫৭ সালে প্যারিসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ : অযোধ্যার শেষ নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ ১৮২২ সালে জন্মগ্রহন করেন। নওয়াব হিসেবে আসীন হন ১৮৪৭ সালে। বৃটিশরা তাকে মসনদ ত্যাগে বাধ্য করে ১৮৫৬ সালে, ১৮৭৭ সালে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

শাহজাদা মির্জা সিকান্দার হাশমত : ওয়াজেদ আলী শাহের ছোট ভাই। মায়ের সাথে ইংরেজদের কাছে গিয়েছিলেন অযোধ্যায় বংশীয় শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে উকালতি করতে। ১৮৫৮ সালে প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহজাদা মির্জা বিরজিস কাদের : ওয়াজেদ আলী শাহের পুত্র ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিরজিস কাদিরকে অযোধ্যার বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তিনি যেহেতু তখন শিশু ছিলেন, সেজন্যে তা মা হযরত মহল তার পক্ষে বৃটিশের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

"কোন্ কাহিনী অধিকতর আকৃষ্ট করে
যে পৃথিবীতে আমার বাস
কিভাবে বিচরণ করবো সেখানে,
অথবা আমার ভাগ্যে কি আছে?"

মির্জা রুসওয়া, আপনি কেন আমাকে আমার জীবনের আসল ঘটনা থেকে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে প্ররোচিত করে? আমার মতো একজন নারীর জীবনের কাহিনীর মাঝে আপনার কি আগ্রহ থাকতে পারে? আমার মতো অসুখী হতভাগী, যে কোন নোঙর ছাড়া সারাটা জীবন ভেসে বেরিয়েছে, গৃহহীন এক ভবঘুরে যে তার পরিবারকে সীমাহীন লজ্জার মধ্যে নিক্ষেপ করেছে; আমি এমন এক মহিলা, যার নাম এ পৃথিবীতে আজকের মতো ভবিষ্যতেও নিন্দিত হবে। যাহোক, আপনি পীড়াপীড়ি করলে তো আমাকে বলতেই হবে।

আমার পূর্ব পুরুষের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলে কি লাভ হবে আমার? এ ব্যাপারে সত্য কথাটা হলো, আমি এখন আর আমার আব্বা আম্মা ও দাদা দাদীর নামও স্মরণ করতে পারি না। যতোটুকু মনে করতে পারি তা হচ্ছে, ফৈজাবাদের শহরতলীতে কোথাও আমাদের বাড়ি ছিল। প্রতিবেশীদের মাটির কুঁড়েঘরের মাঝখানে আমাদের বাড়িটি ছিল ইটে গাঁথা। প্রতিবেশীরা অতি সাধারণ মানুষ ; ভিশতিওয়ালা, নাপিত, ধোপা এবং অন্যান্য শ্রমজীবী। আমাদের বাড়ি ছাড়া কাছেই আর একটি দোতলা বাড়ি ছিল। সেটি দিলাওয়ার খান নামে এক ব্যক্তির। আমার আব্বা বহু বেগমের (অযোধ্যার নওয়াব সুজা-উদ-দৌল্যা'র স্ত্রী) সৌধে কাজ করতেন। সেখানে তিনি কি কাজ করতেন অথবা তাকে কতো মাসোহারা দেয়া হতো আমি তা স্মরণ করতে না পারলেও আমার মনে আছে যে লোকজন তাকে জমাদার বলে সম্বোধন করতো।

আমি সারাদিন ধরে আমার ছোট ভাই এর সাথে খেলতাম। সে আমার এতো অনুরক্ত ছিল যে মুহূর্তের জন্যেও আমার কাছ ছাড়া হতো না। আপনাকে আমি বলে বুঝাতে পারবো না যে, আব্বা কাজ শেষে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলে আমরা কতোটা সুখী হতাম। আমি দৌড়ে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরতাম। আমার ছোট্ট ভাইটি 'আব্বা, আব্বা' বলে ছুটে এসে তার কুর্তার প্রান্ত আঁকড়ে ধরতো। আব্বার মুখে হাসি ফুটে উঠতো। তিনি আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেন এবং আমার ভাইকে কোলে নিয়ে

www.pathagar.com

চুমু দিতেন। কখনো খালি হাতে বাড়ি আসতেন না তিনি। কখনো আনতেন ইক্ষু, কখনো তিলের খাজা, কিংবা পাতার ঠোঙ্গায় অন্য কোন মিষ্টি। তার নিয়ে আসা খাবার আমরা ভাগ করতাম। তখন আমাদের ঝগড়া বাঁধতো। ইক্ষু কেড়ে নিতো সে, আমি মিষ্টি ভর্তি পাতার ঠোঙ্গা নিয়ে নিতাম। রাতের খাবার রান্না করতে ব্যস্ত আম্মিজান আমাদের কান্ডকারখানা লক্ষ্য করতেন। খুবই মজার ছিল ঘটনাগুলো। আমি আব্বাকে "আমার জন্যে একটি পুতুল আনেননি কেন, দেখুন আমার স্যান্ডেল ছিড়ে গেছে, আপনার তো এগুলো খেয়ালই নেই, সোনারু এখনো আমার হার বানিয়ে দেয়নি, অথচ আমার খালাতো ভাইটির দুধ ছাড়ানোর অনুষ্ঠান প্রায় এসেই গেল; তখন আমি কি গলায় দেব। আমি কিচ্ছু বুঝিনা, ঈদে আমার নতুন জামা চাই-ই," এসব বলে জ্বালাতন শুরু করার আগে বেচারি আব্বার বসার সময় পর্যন্ত হতো না।

রান্না শেষ আম্মা আমাকে ডাকতেন। আমি রুটির ঝুড়ি ও তরকারির হাঁড়ি নিয়ে আসতাম। গালিচার ওপর একটি সাদা চাদর বিছিয়ে দেয়া হতো। আম্মা খাবার পরিবেশন করতেন, আমরা খাবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম। খাওয়া শেষে আমরা আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতাম। আব্বা এশা নামাজ আদায় করতেন, আর আমরা শুয়ে পড়তাম। তিনি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতেন ফজর নামাজ আদায়ের জন্যে। আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে আবার সবগুলো বায়নার কথা বলতাম। "আব্বু, আজ কিন্তু আমার পুতুল আনার কথা ভুলে যাবেন না। আর অনেকগুলো পেয়ারা, আর কমলালেবু আনবেন...।"

ফজর নামাজ পড়ে আব্বা তসবি জপতেন। এরপর ছাদে উঠে কবুতরের খোপের মুখগুলো খুলে দিয়ে কবুতরকে দানা ছিটিয়ে দিতেন। কবুতর একসময় আকাশে পাখা মেলতো তার ইশারায় এবং কয়েক চক্কর ঘুরিয়ে তিনি নিচে নেমে আসতেন। ইতোমধ্যে আম্মা ঘর ঝাড়ু দিয়ে নাশতা তৈরি করতেন। কারণ আব্বাকে বেশ সকালে তার কাজে যেতে হতো। এরপর আম্মা তার সেলাই নিয়ে বসতেন। আমি আমার ছোট ভাইকে নিয়ে গলিতে নেমে পড়তাম অথবা বাড়ির সামনের তেঁতুল গাছের নিচে ওকে দাঁড় করিয়ে অন্য ছেলে মেয়েদের সাথে খেলতাম। কি চমৎকার ছিল সেই দিনগুলো। পৃথিবীর কোন কিছুর তোয়াক্কা ছিল না তখন। আমি সবচেয়ে ভালো খাবার খেতাম, সবচেয়ে ভালো জামা পরতাম। যেসব ছেলেমেয়ের সাথে খেলতাম তাদের সবার চাইতে ভালো অবস্থা ছিল আমার। এর চাইতে ভালো কিছু চাওয়ার থাকতে পারে তা জানা ছিল না। যে মহল্লায় আমরা থাকতাম সেখানে আমাদের বাড়ির চাইতে উঁচু বাড়ি আর কারো ছিল না। বাড়িটির সকল দিকে টানা বারান্দা, আর অনেকগুলো কামরা ছিল। আমার খেলার সঙ্গীরা থাকতো ছোট্ট ঘুপচি ঘরে। প্রয়োজনের চাইতে অনেক বেশী ছিল আমাদের হাঁড়ি পাতিল ও অন্যান্য বাসনকোসন। ঘরের মেঝে ছিল গালিচায় ঢাকা এবং গালিচার ওপর বিছানোর জন্যে পর্যাপ্ত সাদা চাদর ছিল। পড়শীরা আমাদের কাছ থেকে এসব জিনিস ধার নিতে আসতো। বাড়িতে পানি দিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাদের একজন ভিশতিওয়ালা ছিল। অন্যান্য মহিলারা নিজেরাই কুয়া থেকে পানি বয়ে আনতো। আব্বা যখন তার ইউনিফর্ম পরে ঘর থেকে বের হতেন। লোকজন মাথা নুয়ে তাকে সালাম জানাতো। আম্মা কারো

www.pathagar.com

বাড়ি বেড়াতে যেতেন পালকিতে চড়ে। মহল্লার অন্য মহিলাদের রাস্তা অতিক্রম করতে হতো পায়ে হেঁটে।

আমার সঙ্গীদের চাইতে দেখতে সুশ্রী ছিলাম আমি। যদিও আমি কখনো সুন্দরী ছিলাম না, তবু এখনকার মতো এতোটা সাদামাটা ছিল না আমার চেহারা। হলদে চাপা ফুলের চেয়ে ফর্সা ছিল আমার গায়ের রং। আমার কপাল ছিল প্রশস্ত, আর চোখ বড় বড়। বাচ্চাদের গালের মতো ভরাট ও গোলগাল ছিল আমার মুখ। আমার নাকটা ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা না হলেও চ্যাপটা বা মোটা ছিল না। বয়সের হিসাবে আমার শারীরিক গড়ন বেশ ভালো ছিল এবং এখনো যেমন ক্ষীণ বা ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের নই, তখনো তেমন ছিলাম না। ওই শরীরে আমি আঁটসাট লাল রেশমী পাজামা পরতাম। আমার ব্লাউজ ছিল 'নয়নসুক' কাপড়ের এবং ওড়না ফিনফিনে মসলিনের। দুই হাতে তিনটি করে রূপার চুঁড়ি, গলায় সোনার একটি হার ও নাকে সোনার নাকফুল (অন্য মেয়েরা পরতো রূপার নাকফুল) পরতাম। আমার কান সবে ফুটো করা হয়েছিল এবং লতিতে বেঁধে দেয়া হয়েছিল নীল সুতা। সোনারুর কাছে কানফুলের ফরমাশ দেয়া হয়েছিল।

আমার বয়স সবে মাত্র নয় বছর। তখনই আমার আব্বার বোনের ছেলের সাথে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওদের অবস্থা আমাদের চাইতে ভালো এবং নওয়াবগঞ্জে প্রচুর জমির মালিক ছিল তারা। বিয়ে স্থির হওয়ার আগে আমি আম্মার সাথে কয়েকবার ওদের বাড়ি গেছি। সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাত্রার ধরণ আমাদের চাইতে ভিন্ন ছিল। যদিও তাদের বাড়ি ইট বা পাথরে তৈরি ছিল না, কিন্তু বিশাল ফটকসহ বাড়িটিও বিশাল। তাদের গোশালা গাভী, ষাড় ও মহিষে পূর্ণ এবং দুধ ও ঘি এর কোন ঘাটতি ছিল না সেখানে। শস্য ভান্ডারে মজুত থাকতো প্রচুর খাদ্যশস্য এবং ভুট্টার মওসুমে ঝুড়ি ভরে ভরে ভুট্টার ছড়া আনা হতো। শীতকালে ইক্ষু স্তূপ হয়ে থাকতো।

আমার হবু বরের আব্বা আম্মা বিয়ের তারিখ স্থির করতে ব্যগ্র ছিলেন। আমার সম্ভাব্য স্বামীকে আমি দেখেছি। এমনকি আমরা এক সাথে খেলেছি পর্যন্ত। আমার বিয়েতে যৌতুক হিসেবে দেয়ার সবকিছু আব্বা কিনেছিলেন। শুধু রজব মাসে বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্যে আর সামান্য কিছু অর্থ তার প্রয়োজন ছিল।

রাতে আব্বা আম্মা যখন আমার বিয়ের আয়োজন নিয়ে কথা বলতেন আমি আড়ি পেতে শুনতাম এবং যা শুনতে পেতাম তাতে অত্যন্ত পুলকিত বোধ করতাম। আমার হবু স্বামী সম্পর্কে আমি অহংকার বোধ করতাম। আমার বান্ধবী করিমনের সম্ভাব্য স্বামীর চাইতে সে অনেক বেশী সুদর্শন ছিল। করিমনের জন কালো, আর আমার জন ফর্সা। করিমনের বরের মুখ ভর্তি ঘন দাঁড়ি, আমার বরের তখনো গোঁফই গজায়নি ভালো করে। তার বর নোংরা ধুতি ও সবুজ ফতুয়া পরে বাইরে বের হতো, আর আমার বর সবসময় সুন্দর জামাকাপড় পরিধান করতো। আমার মনে পড়ে ঈদের দিনে সে যখন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতো তখন তাকে কি চটপটেই না লাগতো। সে রেশমি পাজামা

www.pathagar.com

আর পায়ে মখমলের চপ্পল পরতো। মাথায় দিতো সুচিকর্ম করা টুপি এবং কাঁধ থেকে ঝুলতো সবুজ রং এর সুতির একটি চোগা। করিমনের বরের মাথায় ঢিলেঢালা ভাবে পেচানো থাকতো এক টুকরা কাপড় এবং পা খালি থাকতো।

আমি খুব ফুর্তিতে ছিলাম। আমার চাইতে ভাগ্যবতী আর কেউ হতে পারে তা ভাবতেই পারতাম না। মনে হচ্ছিল, শিগ্‌গিরই আমার স্বপ্ন পূরণ হবে। যতোদিন আমি আব্বা আম্মার সঙ্গে ছিলাম দুঃখ কি জিনিস তা বুঝতেও পারিনি। একবার শুধু কানামাছি খেলতে গিয়ে একটি আংটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। রূপার আংটি—খুব বেশী হলে এক আনা দামের হবে। কিন্তু তা বুঝার মতো বয়স হয়নি আমার এবং আংটি হারানোর দুঃখে এতো কেঁদেছিলাম যে আমার চোখ লাল হয়ে ফুলে গিয়েছিল। ব্যাপারটা আম্মাকে বলিনি। তিনি আমার আঙ্গুল আংটি শূন্য দেখে আমাকে জেরা করলেন এবং আমাকে আসল ঘটনা বলতে হলো। আমার মুখের ওপর জোড়ে চড় মেরেছিলেন তিনি। আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে চিৎকার করে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। আব্বা যখন বাড়ি ফিরে এলেন তখন আম্মাকে গালমন্দ করে আমার প্রতি মনোযোগী হলেন। আমি শান্ত হলাম।

আম্মার চাইতে আব্বাই আমাকে বেশী আদর করতেন। আমাকে কখনো তিনি শাস্তি দিতেন না, আর আম্মা পান থেকে চুন খসলেই আমাকে শাসন করতেন। তার আদরের ধন ছিল আমার ছোট ভাইটি। ওর কারণে আমি প্রায়ই মার খেতাম। তবুও ওকে খুব ভালোবাসতাম। কখনো কখনো আম্মার ওপর রাগ করে আমি ওর দিকে খেয়াল রাখতে অস্বীকার করতাম। কিন্তু উনি চলে যাওয়া মাত্র ওকে কোলে নিয়ে চুমু দিতাম। আম্মাকে আসতে দেখলেই তাড়াতাড়ি ওকে নামিয়ে দিতাম এবং সে কাঁদতে শুরু করতো। আম্মার ধারণা হতো যে আমিই ওকে কাঁদিয়েছি, অতএব তিনি আবার আমাকে বকুনি দিতে শুরু করতেন।

এসব সত্ত্বেও আমরা আঙ্গুলে সামান্য আঁচড়টুকু লাগলে আম্মা আমার পাশে চলে আসতেন। খাওয়া দাওয়া ভুলে যেতেন। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। আমাকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে তিনি লোকজনের কাছে ভালো দাওয়াই ও তাবিজের সন্ধান জানতে চাইতেন।

আমার বিয়ের জন্যে আম্মা তার ব্রেসলেট ও হার গলিয়ে, সেগুলোর সাথে সামান্য রূপা মিশিয়ে নতুন ডিজাইনের গহনা তৈরি করালেন। একই কারণে তার অন্য গহনাগুলো ও পালিশ করি যে ঝকঝকে করে তুললেন। নিজের জন্যে সামান্য কিছু বাসনকোসন রেখে বাকীগুলো আমাকে দেয়ার জন্যে নতুন করে ঝালিয়ে নিলেন। আব্বা যখন তাকে কিছু জিনিস তার নিজের ব্যবহারের জন্যে রাখতে বলতেন তখন তিনি উত্তর দিতেন : "আমার কথা ভাববেন না। আপনার বোন বড় জোতদারের বিবি। তিনি যাতে একথা মনে না করেন যে, আপনি আপনার কন্যাকে মূল্যবান কোন কিছুই দেননি। তিনি আপনার বোন হলেও আমাদের কন্যার শাশুড়ি। আপনি তো জানেন, শ্বশুর বাড়ির লোকজন কেমন হয়! আমাদের কন্যা খালি হাতে তার নতুন বাড়িতে গেলে তারা আমাদের খোঁচাবে।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমি জানি কেন আমি যাযাবরের পথ
বেছে নিয়েছিলাম, আমার দিনগুলোকে
আচ্ছন্ন করে রাখা একজনের মতো
কেন বিক্ষিপ্তের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি
আমার দার্শনিক বন্ধুর কাছে আমি কি
তা ব্যাখ্যা করতে পারি?

আমি প্রায়ই লোকজনকে বলতে শুনি যে বেশ্যাদের ঘরে যে মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে তাদের ভাগ্যের উন্নতির সুযোগ অতি সামান্য এবং কেউ তাদের কাছ থেকে শুধু বাজে কিছুই আশা করতে পারে। তারা এমন সব লোকজনের মাঝে বেড়ে উঠে যারা যৌনতা ও ব্যভিচার ছাড়া আর কোন বিষয়েই আলোচনা করে না। আর যাদের দিকেই তারা তাকায়, তাদের মা-বোন যেই হোক না কেন তাদের মাঝে শুধু অবক্ষয়ের দৃষ্টান্তই দেখতে পায়। শ্রদ্ধাভাজন বাবা-মা'র ঘরে জন্মগ্রহণকারী মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এমন হয় না। তারা যদি বাড়ি থেকে পালিয়ে মন্দ কোন পথ বেছে নেয়, তাহলে তো তাদের অজুহাত দেখানোর মতো আর কিছুই থাকে না এবং কোরবানির ভেড়ার মতো ভাগ্যই তাদের জন্যে উপযুক্ত—গলা কাটার আগে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে এক ফোটা পানিও তাদের প্রাপ্য নয়।

কি পরিস্থিতিতে আমাকে একজন বাঈজির পেশা গ্রহণ করতে হলো তা ব্যাখ্যা না করলে মানুষের ধারণা হবে যে, আমার মতো পারিবারিক পটভূমির অন্যান্য মেয়েদের মতোই সহজাত কামনা লিপ্সার কারণে জৈবিক চাহিদাই আমাকে এখানে টেনে এনেছে। তারা ভাববে যে আমার বিয়ে স্থির করতে বিলম্বের কারণে আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিলাম, আমার চোখ অন্য কোন পুরুষের ওপর পড়েছিল এবং তার সাথে বাড়ি থেকে পালিয়েছি, এবং সেই লোকটি আমাকে যখন পরিত্যাগ করেছে তখন আমি নিশ্চয়ই আরেকজনকে ধরেছি। সেই প্রেমও যখন ভালোভাবে গড়ায়নি, তখন আরেকটিকে ধরেছি এবং এভাবে ক্রমে এই পেশায় জড়িয়ে গেছি। তাদের এই উপসংহারে পৌঁছার জন্যে আমি তাদেরকে দোষারূপ করবো না, কারণ সচরাচর এমনটিই ঘটে থাকে। আমার জীবনেই তো আমি অনেক নামীদামী পরিবারের স্ত্রী ও কন্যাকে বিপথে যেতে দেখেছি এবং আমি জানি যে কোন্ পরিস্থিতি তাদের অধঃপতনের জন্যে দায়ী। প্রথম কারণ হচ্ছে, যৌবনে উপনীত

www.pathagar.com

হওয়ার পর যথাসময়ে কন্যাদের বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বাবা-মা'র অক্ষমতা। দ্বিতীয়তঃ কন্যাদের সম্মতি না নিয়েই কারো সাথে বিয়ে দিয়ে দেওয়া। অনেক বাবা-মা তাদের কন্যার জন্যে ঠিক করা পাত্রের বয়সের ব্যবধান, চেহারা, মেজাজ ইত্যাদি বিষয়ে কোন চিন্তা ভাবনা না করেই তার হাতে কন্যাকে তুলে দেয়। মেয়েটি যখন দেখতে পায় যে সে লোকটির সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না তখন তাকে ছেড়ে পালায়। অনেক মেয়ের কপালে দুর্দশা নেমে আসে তারা অকালে বিধবায় পরিণত হলে। যুবতী বিধবার অসহনীয় জ্বালা কে দেখবে। ভাগ্য ভালো হলে তারা আরেকটি স্বামী গ্রহণ করে। আর তা না হলে বাজে সংসর্গে পড়ে শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নামতে বাধ্য হয়। কিন্তু এসবের কোনটাই আমার ক্ষেত্রে ঘটেনি। দুর্ভাগ্য নিয়েই আমার জন্ম হয়েছিল। নিয়তিই আমাকে বিচ্ছিন্ন প্রান্তরে আবদ্ধ করে ফেলেছে। মন্দ পথ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ আমার জন্যে খোলা ছিল না।

দিলাওয়ার খান, যার বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে খুব দূরে নয়, ডাকাতদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্ণৌর কয়েদখানায় বহু বছর বন্দী ছিল সে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন সে কারো জামিনে সবে মাত্র মুক্তি পেয়েছে।

আব্বার বিরুদ্ধে দিলাওয়ার খানের অভিযোগ ছিল। কারণ তাকে যখন ফৈজাবাদে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাদের মহল্লার লোকদের ডাকা হয়েছিল তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে। আব্বাও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি সহজ সরল, সৎ লোক। মহারাণীর হাকিম তার হাতে কোরআন স্থাপন করে প্রশ্ন করে, "জমাদার সাহেব, আমাকে আসল সত্য বলুন যে, দিলাওয়ার খান কেমন লোক?" তার সম্পর্কে আব্বা যা জানতেন সবাই অকপটে বলেছিলেন। তার সাক্ষ্যেই দিলাওয়ার খানকে কয়েদখানায় পাঠানো হয়। সে এই অভিযোগ পুষে রেখেছিল এবং কয়েদ থেকে বের হয়ে এসে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আব্বাকে ক্ষ্যাপানোর জন্যে সে এক ঝাঁক কবুতর কিনে এবং সেগুলোর সাহায্যে আব্বার একটি কবুতর আটকে ফেলতে সক্ষম হয়। সেটিকে ছাড়িয়ে আনতে আব্বা তাকে চার আনা দিতে চান, কিন্তু সে আট আনা দাবি করে।

এক সন্ধ্যায় আব্বা ফিরে আসার আগে আমাকে বাড়ির বাইরে বের হতে হয়েছিল এবং তখন দিলাওয়ার খানকে তেঁতুল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। "এই যে খুকী এসো! তোমার আব্বা টাকা পয়সার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেছে," সে আমাকে বললো। "তুমি তোমাদের কবুতর ফিরিয়ে নিতে পারো।" আমি ফাঁদে পা দিলাম। আমি তার সাথে তার বাড়িতে গেলাম। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সে ভিতর থেকে দরজার খিল লাগিয়ে দিল। আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু সে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে মুখে একটি কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে। একটি রুমাল দিয়ে আমার হাত বেঁধে ফেলে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো আমাকে। পিছনের দরজা খুলে পীর বখশ নামে এক লোককে ডাকলো। দু'জন আমাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে একটি গরুর গাড়ীতে রাখলো। দ্রুত চললো গরুর গাড়ী।

www.pathagar.com

শয়তানের খপ্পরে আমি অসহায় এক শিকার। দিলাওয়ার খান হাঁটুর নিচে আমাকে চেপে রেখেছে এবং দম নিতেও কষ্ট হচ্ছিল আমার। তার হাতে ছিল একটি ছোরা এবং তার রক্তলাল চোখে খুনীর ছায়া। আমি ভয়ে এতোটুকু হয়ে গিয়েছিলাম।

গোধূলি রাতে গড়ালো এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো চারদিক। জোরে বাতাস বইতে লাগলো। আমার অস্থির ভিতর পর্যন্ত শীতল হলে গেল এবং আমি কাঁপতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে বাড়ির দৃশ্যাবলী ভিড় করছিল। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তপ্ত অশ্রু অবিরাম ঝরছিল। নিশ্চয়ই কাজ থেকে ফিরে আব্বা সব জায়গায় আমাকে খুঁজছেন, আম্মা বুক চাপড়াচ্ছেন জ্ঞানশূন্যের মতো, আর আমার ভাইটি তার বোনের দুর্দশা সম্পর্কে কোন আন্দাজ করতে না পেরে খেলছে। আম্মা, আব্বা, ভাই, বারান্দাসহ বাড়ি, উঠোন, রান্নাঘর—সব যেন চোখের সামনে ভাসছে। একটু পরপরই দিলাওয়ার খান ছোরা দেখিয়ে আমাকে হুমকি দিচ্ছে। আমি আতংকিত ছিলাম, যে কোন মুহূর্তে সে আমার বুকে সেটি বসিয়ে দিতে পারে। যদিও আমার মুখ থেকে কাপড়টি সরিয়ে নেয়া হয়েছিল, তবুও আমি একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। আমার এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিলাওয়ার খান ও পীর বখশ সারাক্ষণ কথা বলছিল আর হাসছিল। স্বভাবতঃই তারা বেশ আনন্দে ছিল। অশ্লীল ভাষায় তারা আমাকে ও আমার আব্বা আম্মাকে গালি দিচ্ছিল।

"কথায় আছে যে, সাহসী মানুষের পুত্র বারো বছর পর হলেও অপরাধের প্রতিশোধ নিয়ে থাকে।" দিলাওয়ার খান বললো, "পীর বখশ, তুমি তো দেখতে পাচ্ছো যে, আমি এখন সেই কথাটিকে সত্য প্রমাণ করেছি। এখন দেখা যাক ওই বেজন্মা কেমন করে সহ্য করে!"

"আসলেই আপনি প্রবাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন," পীর বখশ উত্তর দিল। "আপনাকে যে সাজা দেয়া হয়েছিল তার ঠিক বারো বছর পর, তাই না?"

"ঠিক বারো বছর। দেখো ভাই পীর বখশ, লক্ষ্ণৌর কয়েদখানায় আমার ওপর দিয়ে কি কঠিন আজাব গেছে! এখন ওই বেজন্মার সাজা ভোগের পালা। বহুদিন ধরে তাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তাছাড়া এটা তো শুধু আমার প্রথম ধাপ। আমি ওকে খুন করে।"

"আপনি এমন কথা বলবেন না!"

"তুমি আমাকে কি মনে করো? আমি যদি ওকে খুন না করি তাহলে আমি একটা হারামজাদা, পাঠানের বাচ্চা নই।"

"আমি জানি, আপনি আপনার কথায় অটল।"

"তুমি শুধু দেখে যাও, আমি কি করি।"

"এই মেয়েটির কি করবেন আপনি?" পীর বখশ প্রশ্ন করে।

www.pathagar.com

"খুন করে কোন গর্তে ফেলে দেব। এরপর রাত পোহাবার আগেই বাড়িতে ফিরে যাব।"

এসব কথাবার্তা শোনার পর আমার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। বুকটা কেঁপে উঠলো। শরীরের সকল অঙ্গ যেন অসার হয়ে পড়লো এবং গলাটা পিছনের দিকে ঢলে পড়লো, মৃত্যুর সময়ে যেমনটি হয়ে থাকে। কিন্তু ওই দানবের মুখে দয়ার সামান্যতম চিহ্নও দেখা গেল না। বরং আমার বুকের ওপর জোরে আঘাত করে বসলো। আমার যন্ত্রণা দ্বিগুণ হলো এবং গাড়ী থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম আমি।

"আপনি যদি মেয়েটিকে মেরে ফেলেন, তাহলে আমার টাকা দেবেন কিভাবে?" পীর বখশ জানতে চাইলো।

"আমি তোমার পাই পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেব।"

"কিন্তু সেই টাকা পাবেন কোথায়? আমি তো ভেবেছিলাম আপনি অন্য কিছু করতে চেয়েছেন!"

"আমি যদি অন্য কোন ভাবে টাকা সংগ্রহ করতে না পারি তাহলে আমার কবুতরগুলো বেঁচে দিয়ে তোমার পাওয়া পরিশোধ করবো।"

"আপনি একটা আহম্মক। কবুতর কেন বেঁচতে যাবেন আপনি। আমি কি আপনাকে আরেকটা উপায় বাতলাবো?"

"বলো।"

"বুড়ো মিয়া, চলুন মেয়েটিকে লক্ষ্ণৌতে নিয়ে বেঁচে দেই।"

মৃত্যুর ভয় আমার শ্রবণ শক্তিকে বিকল করে দিয়েছিল। দুই বদমাশের কণ্ঠ আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মধ্যে কোলাহলের মতো মনে হচ্ছিল। পীর বখশের কথাগুলো আমার কানে ঢুকলো এবং প্রাণ ভরে আমি তাকে দোয়া করলাম। কিন্তু আরেক খুনী কি করতে চায়?

"ঠিক আছে, সময় এলেই দেখা যাবে। আগে তো সামনে এগিয়ে যাই।"

"এখানে মুহূর্তের জন্যে থামি। আমাদের সামনে গাছের নিচে আগুন দেখা যাচ্ছে। হুক্কার জন্যে কিছু কাঠকয়লা নিয়ে নেই।" পীর বখশ কয়লা আনতে চলে গেলে আমার মনে হচ্ছিল যে দিলাওয়ার আমার জীবনের সমাপ্তি টেনে দেবে সে ফিরে আসার আগেই। আমি মৃগী রোগগ্রস্তের মতো কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার শুরু করলাম, দিলাওয়ার রাগে মুখ বিকৃত করে আমার দিকে ফিরে আমার মুখের ওপর চড় কষালো। "চুপ কর, হারামজাদী," সে চিৎকার করলো। "তা না হলে এই ছোরা তোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেব।" এরপর অশ্রাব্য গালি ছুঁড়তে লাগলো। "পীর বখশ খুব দূরে যায়নি। সে চিৎকার করে দিলাওয়ার খানকে বললো হাত নামাতে। "ওই কাজটি করবেন না, ভাই।"

www.pathagar.com

ঠিক আছে, ঠিক আছে। দিলাওয়ার খান তাকে আশ্বস্ত করলো। "যাও, কয়লা নিয়ে এসো।" একটু পরই পীর বখশ কয়েক টুকরা জ্বলন্ত কাঠকয়লা নিয়ে ফিরলো। হুক্কা ধরিয়ে তার সঙ্গীকে দিল। দিলাওয়ার খান হুক্কায় টান দিয়ে প্রশ্ন করলো, "ও কতো টাকায় বিকোবে বলে তোমার ধারণা? বেচার ব্যবস্থাটা কে করবে? এটা করতে গিয়ে আবার কোন ঝামেলায় পড়বো না তো?"

"আরে, আপনি এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? কেউ ধরতে পারবে না আমাদের। লক্ষ্মৌতে এই কারবার হরহামেশা হচ্ছে। আমার ওপর ছেড়ে দিন। লেনদেন আমি করবো। আপনি কি আমার বিবির ভাইকে চেনেন?"

"করিমের কথা বলছো?"

"হ্যাঁ। এটাই তার জীবিকার রাস্তা। অনেক ছেলে ও মেয়ে অপহরণ করে ওদের বেঁচে দিয়ে প্রচুর টাকা বানিয়েছে সে।"

"আজকাল সে কোথায় থাকে?"

"লক্ষ্মৌ ছাড়া আর কোথায় থাকবে ? গোমতি নদীর ওপারেই ওর শ্বশুর বাড়ি। ওখানে সে থাকবেই।"

"একটা ছেলে বা মেয়ে কতোতে বিকোয়?" একটু পর দিলাওয়ার খান জানতে চাইলো।

"ওদের চেহারা সুরতের ওপর নির্ভর করে।"

"এর দাম কতো হবে বলে তোমার মনে হয়?"

"একশ' টাকা। ভাগ্য ভালো হলে দেড়শ' পর্যন্ত হতে পারে।"

"তুমি কেমন আশা করবে। এর চেহারাও তো বলা মতো কিছু নয়। ওর জন্যে একশ' পেলেই অনেক।"

"চেষ্টা করতে ক্ষতি কি। ওকে মেরে ফেললে আপনি কি পাবেন?"

সারারাত ধরে গরুর গাড়ী চললো। বলা হয় যে, মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন ফাঁসিকাষ্ঠে অপেক্ষা করে তখন তার চোখেও ঘুম নেমে আসতে পারে। আমার বেলায়ও তাই হয়েছিল। যদিও মৃত্যু আমার চোখের সামনে দুলছিল, একটু পরই ঘুমে চোখ বুজে গেল। পীর বখশ আমার প্রতি দয়াশীল এবং তার বলদের জন্যে রাখা কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে দিল। কয়েকবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল আমার, কিন্তু একটি শব্দ উচ্চারণ না করে আমি শুয়ে ছিলাম। এক পর্যায়ে মুখের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে দিলাম। গরুর গাড়ীতে আমি একা। গাড়ীর ছই এর পর্দার প্রান্ত তুলে এক সারি কুঁড়ে ঘর এবং একটি মুদি দোকান দেখতে পেলাম। দিলাওয়ার খান ও পীর বখশ কিছু কিনতে গেছে। বলদ দু'টিকে গাড়ী থেকে খুলে দেয়া হয়েছে এবং ওরা একটি বটগাছের নিচে খড় চিবুচ্ছে। কিছু গ্রামবাসী একটি আগুন ঘিরে বসে হাত গরম করছে এবং হুক্কা টানছে। পীর বখশ ফিরে এলো এবং আমাকে কিছু ভাজা ছোলা খেতে দিল। সারারাত আমি কিছুই

www.pathagar.com

খাইনি এবং ক্ষুধায় মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। গোগ্রাসে ছোলাগুলো খেলাম। এরপর এক জগ পানি আনলো। সামান্য পান করে আমি চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। দীর্ঘক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর পীর বখশ গাড়ীতে গরু জুতলো। দিলাওয়ার খান হুক্কা ধরিয়ে আমার পাশে এসে বসলো। আবার চলতে শুরু করলাম আমরা। সেদিন আমার সাথে সে রূঢ় আচরণ করেনি। আমার দিকে ছোরা বাগিয়ে ধরেনি, চড় মারেনি বা চিৎকার করে গালিও দেয়নি। তারা কয়েক জায়গায় থেমেছে হুক্কায় আগুন ধরাতে এবং সারাটা পথ কথা বলে বা গান গেয়ে কাটিয়েছে। তাদের কথাবার্তা প্রায়ই গালিগালাজের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। কখনো তারা জামার হাতা গুটিয়ে, কোমরে গামছা বেঁধে লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে পড়েছে। এরপর কোন কিছুর প্রভাবে তারা শান্ত হয়েছে এবং বিবাদ মিটে গেছে। নিশ্চয়ই কোন সমঝোতা হয়েছে তাদের। এমন বন্ধুত্ব পূর্ণ ভাবে তারা কথা শুরু করে যে বিশ্বাস করাই কঠিন যে তাদের মধ্যে কখনো কোন ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল। "আমাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না।" একজন বলে।

"কখ্খনো না," আরেকজন উত্তর দেয়।

"ঠিক আছে, যা হবার হয়ে গেছে।"

"ঠিক বলেছো, যা হবার হয়ে গেছে।"

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

শিকারির পাখি বলে, "খাঁচায় আজ আমার
প্রথম রাত। আমাকে খাঁচার বেস্টনির সাথে
ডানা ঝাপটাতে দাও।"

আমার বন্দীদশার প্রথম রাতের কাহিনী ইতোমধ্যে আপনি জেনে গেছেন। এখনো আমার অবাক লাগে যে কি করে আমি সেই পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে ছিলাম। আমার সেই অসহায়ত্বের কথা আমি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ভুলবো না। আমি যে ঘটনাগুলো ভুলতে পারিনি তা আমার আত্মার ওপর কঠিন চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে।

দিল্াওয়ার খান তার প্রাপ্য শাস্তি পেয়ে গেছে। কিন্তু এতে আমার হৃদয়ে ঘৃণার যে আগুন তা নিভেনি। ওই লোকটিকে যদি আমি টুকরা টুকরা করে কাটতে পারতাম এবং তার মাংস কাক ও চিলকে খাওয়ানোর দৃশ্যও দেখতাম তবুও আমার মনে বিন্দু মাত্র অনুকম্পা জাগতো না। আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ যদি ন্যায়পরায়ণ হয়ে থাকেন তাহলে দোজখেও তাকে দিন রাত জ্বলন্ত চাবুক দিয়ে পিটানো হবে এবং শেষ বিচারের দিনে ভয়াবহ পরিণতি তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

দিলাওয়ার খান আমাকে হত্যা করলেই বরং ভালো হতো। এক মুঠো ধূলি আমার গুণাবলীকে আচ্ছাদিত করতো এবং আমার মন্দ কাজ দ্বারা আমার আব্বা আম্মার সুনাম ক্ষুণ্ন হতো না। মানুষ ও আল্লাহর সামনে আমার মুখ কালিমালিপ্ত করার পরিস্থিতি থেকেও রক্ষা পেতাম আমি।

আমি আর একবার মাত্র আম্মার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাও দীর্ঘদিন আগে। শুধু আল্লাহ জানেন, এখনো তিনি বেঁচে আছেন কিনা। আমি শুনেছি যে আল্লাহর রহমতে আমার ছোট ভাই এর একটি ছেলে হয়েছে এবং এখন সে চৌদ্দ পনের বছর বয়সের। ভাইটির দু'টি মেয়েও আছে। ওদের সবাইকে দেখতে কি যে ইচ্ছা হয় আমার। তারা ফৈজাবাদে থাকে এবং জায়গাটি খুব দূরে নয়। সামান্য একটি টাকা খরচ করলেই আমি সেখানে যেতে পারি। কিন্তু আমার হাত পা বাঁধা।

সেই দিনগুলোতে কোন ট্রেন ছিল না এবং ফৈজাবাদ থেকে লক্ষ্মৌ আসতে চারদিন লাগতো। আব্বাজান পিছু নিতে পারে ভয় করে দিলাওয়ার খান ঘোরা পথে বিরান প্রান্তর দিয়ে গেল, যার ফলে লক্ষ্মৌ পৌঁছাতে আমাদের আট দিন লেগে গিয়েছিল। আমার মতো

www.pathagar.com

অপ্রয়োজনীয় এক সৃষ্টির পক্ষে কি করে জানা সম্ভব যে লক্ষ্ণৌ কোথায়? দিলাওয়ার খান ও পীর বখশের কথায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে তারা সেখানেই নিয়ে যাচ্ছে। আমি বাড়িতে লোকজনের মুখে লক্ষ্ণৌর কথা শুনেছি। কারণ আমার নানাজি সেখানে কোন নওয়াবের প্রাসাদে প্রহরীর কাজ করতেন। একবার তিনি ফৈজাবাদে এসেছিলেন আমাদের জন্যে অনেক মিষ্টি ও খেলনা নিয়ে। আমি কখনো তাকে ভুলবো না।

দিলাওয়ার খান ও পীর বখশ আমাকে গোমতী নদীর ওপারে করিমের শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে গেল। মাটির তৈরি ঘিঞ্জি বাড়ি। করিমের শাশুড়ি এক বৃদ্ধা মহিলা, দেখতে মুর্দার গোসল দেয়া মহিলাদের মতো। মহিলা আমাকে বাড়ির ভিতরে দিয়ে ছোট্ট একটি কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দিল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তালাবদ্ধ করে রাখতো আমাকে। এরপর কম বয়সী এক মহিলার আবির্ভাব হলো (পরে শুনেছি, মহিলাটি করিমের বিবি) এবং একটি মাটির বাটিতে করে আমার জন্যে তিনটি চাপাতি ও এক চামচ ডাল নিয়ে এলো। মাটির লোটায় করে পানিও এনেছিল সে। এই সামান্য খাবারও আমার জন্যে তখন বিরাট ভোজের মতো ছিল। কারণ পুরো একটি সপ্তাহের জন্যে আমার ভাগ্যে ঘরে রান্না করা খাবার জোটেনি। পথে আমাকে ছোলা ভাজা ও ছাতু ছাড়া আর কিছুই খেতে দেয়া হয়নি। অতএব আমাকে যা দেয়া হয়েছিল আমি সব খেয়ে আধা জগ পানি পান করে মেঝেতে শুয়ে পড়লাম। এবং দ্রুত ঘুম এসে গেল। আল্লাহই জানেন যে, আমি কতো সময় ঘুমিয়েছিলাম। কারণ অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে কারো পক্ষে দিন অথবা রাত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ঘোর অন্ধকারে আমি কয়েকবার জেগে উঠেছিলাম এবং যেহেতু আমার আশেপাশে কেউ ছিল না, আমি ওড়নায় মুখ ঢেকে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। অতঃপর করিমের শাশুড়ি, সেই বৃদ্ধা আপন মনে গজরাতে গজরাতে এলো।

"মহারাণী ঘুমাতে পছন্দ করেন, তাই না? যতোই চিৎকার করে ডাকো না কেন তার একটি চুলও নড়বে না। তাকে গায়ের জোরে ঝাঁকুনি দাও, তবুও তার ঘুম ভাঙ্গবে না। আমার মনে হয় সাপ ওকে শুঁকে গেছে। এই যে, তাহলে মহারাণীর ঘুম শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গেছে।"

আমি চুপচাপ পড়ে ছিলাম, আর কথা না ফুরোনো পর্যন্ত বৃদ্ধা বকে যাচ্ছিল। "বাটিটা কোথায়?" বৃদ্ধা প্রশ্ন করলো। আমি বাটি দিলে সে চলে গেল। আবার দরজায় তালা পড়লো। একটু পর করিমের বিবি এলো। সে একটি জানালা খুলে আমাকে সেই জানালা দিয়ে ছোট্ট এক আঙ্গিনায় নামিয়ে আনলো। খোলা আকাশ দেখতে পেয়ে আমার ভালো লাগলো, যদিও তা অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে। আমাকে আবার কুঠুরিতে ঢুকিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়া হলো। আগের দিনের মতোই ডাল ও চাপাতি খেতে দেয়া হলো আমাকে।

আরো দু'দিন কেটে গেল এভাবে। তৃতীয় দিনে আমার চেয়ে বয়সে দু'এক বছরের বড় একটি মেয়েকে আমার কুঠুরিতে আনা হলো। আল্লাহ জানেন যে, করিম কোত্থেকে

www.pathagar.com

এটিকে জোগাড় করেছে! বেচারি চিৎকার করে কাঁদছিল। কিন্তু ওর আগমন আমার জন্যে আশির্বাদের মতো ছিল। কান্না থামালে আমরা দু'জন ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করলাম।

সে বললো যে ওর নাম রাম দাই। সীতাপুরের কাছে এক গ্রামের হিন্দু ব্যবসায়ীর কন্যা। অন্ধকারে আমি ওর মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু পরদিন জানালা খোলার পর আমরা একে অন্যকে দেখলাম। সে ফর্সা, সুন্দরী ও চমৎকার গড়নের। রাম দাইকে চতুর্থ দিবসে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাকে আরো দু'টি দিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সেই অন্ধকার ঘরে থাকতে হলো। তৃতীয় রাতে দিলাওয়ার খান ও পীর বখশ এসে আমাকে তাদের সাথে নিয়ে গেল। চন্দ্রালোকিত রাত। আমরা খোলা মাঠ দিয়ে গেলাম এবং এরপর রাস্তায় উঠে একটি সেতুর কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত হাঁটলাম। নদী স্ফীত এবং জোরে বাতাস বইছিল। ঠান্ডায় কাঁপছিলাম আমি। একটু পর আমরা আরেকটি রাস্তায় পড়লাম। এরপর দীর্ঘ এক সরু গলি দিয়ে হাঁটলাম। আমার পা জ্বলছিল। একটি বাজারে এলাম আমরা এবং ভিড়ের মধ্যে পথ করে নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। অবশেষে একটি বাড়ির দরজায় পৌঁছলাম।

মির্জা রুসওয়া, আপনি কি অনুমান করতে পারেন যে জায়গাটা কোথায় ছিল? এটা সেই স্থান যেখানে অর্থের জন্যে আমার ইজ্জতের সওদা করতে হয়েছিল। এটা ছিল চক, পতিতা পল্লী। আমি সেই বাড়িতে অবস্থান করে পৃথিবীতে আমার প্রাপ্য সবকিছু—ইজ্জত ও অমর্যাদা, খ্যাতি ও কুখ্যাতি, ব্যর্থতা ও সাফল্য সবই পেয়েছি। এটি খানুম জানের আস্তানা এবং এর দরজা ছিল উন্মুক্ত। ভিতরে প্রবেশ করে আঙ্গিনা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরের বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, সেখানে খানুম জান বসা ছিলেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু কি ঠাঁট সম্পন্ন মহিলা! এমন মর্যাদা সচেতন আর কোন মহিলাকে আমি কখনো দেখিনি। এমন চমৎকার ভাবে সজ্জিতা কাউকে নয়। তার সিঁথির কাছে চুলগুলো তুষার ধবল। পরনে সোনালী সুতায় তৈরি ঢিলেঢালা সেলোয়ার এবং মাথার ওপরে সুন্দর ভাঁজ করা ওড়না। দু'হাতে সোনার ভারী ব্রেসলেট, সাদামাটা কানের দুল সুন্দর মুখে বেশ মানিয়েছে। তার কন্যা বিস্‌মিল্লাহ জানের চেহারা ও বৈশিষ্ট তার মায়ের মতোই, কিন্তু মায়ের চাইতে কোথাও কিছু ঘাটতি আছে, যার কারণে মা-ই অধিক আকর্ষণীয় ছিল। প্রথম দিনেই আমার ওপর তার যে প্রভাব পড়েছিল আমি কখনো তা ভুলবো না। গালিচায় ঢাকা নিচু একটি আসনে বসেছিলেন তিনি। পদ্ম ফুলের মতো দেখতে গোলাকৃতির কাঁচের প্রদীপ জ্বলছিল। তার সামনে সুন্দর কারুকার্য খচিত পানের খোলা বাটা। একটি নল দিয়ে হুক্কা টান ছিলেন তিনি। তার কন্যা নাদুসনুদুস বিসমিল্লাহ জান নাচছিল। আমরা সেখানে প্রবেশ করা মাত্র নাচ থেমে গিয়েছিল এবং উপস্থিত সকলে উঠে গেল। আগেই সব কথাবার্তা হয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয়। খানুম জান চোখ তুলে প্রশ্ন করলেন, "এটাই কি সেই মেয়ে?"

www.pathagar.com

"জি হ্যা, মাজি," দিলাওয়ার খান উত্তর দিল।

তিনি আমাকে তার পাশে ডাকলেন। এক হাতে আমার ঘাড় পেচিয়ে ধরে আমাকে পাশে বসতে বললেন। আমার মুখ তুলে ধরে ভালোভাবে দেখলেন। "খুব ভালো,' তিনি বললো।

"আমি যা দিতে চেয়েছিলাম তাই দেব। অন্য যে মেয়ের কথা বলেছিলে সে কোথায়?

"ইতোমধ্যে ওটি বিক্রি হয়ে গেছে," পীর বখশ উত্তর দিল।

"ওর জন্যে কতো পেয়েছো তুমি?"

"দু'শ টাকা।"

"ভালোই হয়েছে, ওটা চুকে গেছে," তিনি মন্তব্য করে বললেন, "কার কাছে ওকে বেচলে?"

"এক বেগম তার ছেলের জন্যে ওকে কিনেছেন।"

"সে দেখতে খুব খারাপ ছিল না। আমিও ওরকমই দিতাম। কিন্তু তোমাদের তাড়া ছিল।"

"আমার কি করার ছিল? আমি সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার বিবির ভাই কোন কথাই শুনলো না।"

"এই মেয়েটির মুখটা সুন্দর," দিলাওয়ার খান মাঝে বলে উঠলো। "কিন্তু আপনিই বিচার করার মালিক।"

"ওকে দিয়ে চলবে," খানুম বললেন। "সে তো অন্ততঃ মানুষ।"

"আপনি নেবেন বলেই ওকে এনেছি," দিলাওয়ার উত্তরে বললো।

"তোমরা খুব কঠিন মানুষ," খানুম বললেন। তিনি হোসাইনীকে ডাকলেন। মাঝ বয়সী কালো রং এর মোটাসোটা একটি মহিলা এলো। "ক্যাশ বাক্স আনো," খানুম হুকুম দিলেন। হোসাইনী ভিতরে গিয়ে ক্যাশ বাক্স আনলো। খানুম বাক্স খুলে দিলাওয়ারের সামনে অনেকগুলো টাকা রাখলো।

পরে জেনেছিলাম যে, তিনি আমার জন্যে একশ' পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে পীর বখশকে কিছু দেয়া হলে সে সেগুলো তার রুমালে বাঁধলো। আমাকে বলা হয়েছিল যে সে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছে। বাকী টাকা অভিশপ্ত দিলাওয়ার খান তার থলেতে ভরে। দু'জনই খানুমকে সালাম দিয়ে চলে যায়। আমি খানুম ও তার চাকরাণী হোসাইনীর সাথে রয়ে গেলাম। খানুম তাকে বললেন, "হোসাইনী, আমি যে দাম দিলাম, এই মেয়ের জন্যে তা নিশ্চয়ই খুব বেশি হয়ে যায়নি।"

"বেশি? কি বলেন। আমি তো বলবো খুব সস্তায় পেয়েছেন ওকে।"

"আরে না, না। খুব সস্তাতেও নয়।" খানুম বিস্ময় প্রকাশ করলেন। "যাহোক, ওর মুখটা নিরীহ দর্শন। অবাক হচ্ছি যে, মেয়েটা কার হতে পারে। ওর বাবা মা না জানি কিভাবে কাটাচ্ছে। মেয়েগুলোকে যখন এই বদমাশগুলো অপহরণ করে তখন কি ওদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় জাগে না? তোমার কি মনে হয় না আমরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ? এ

www.pathagar.com

ধরণের অপকর্মের জন্যে ওদেরকেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমি যদি ওকে না কিনতাম, তাহলে অন্য কেউ তাকে কিনতো।"

"এখানে বরং সে ভালো থাকবে," হোসাইনী তাকে আশ্বস্ত করলো। "আপনি কি শোনেননি যে নামী পরিবারের মহিলারা এই মেয়েগুলোর সাথে কি আচরণ করে?

"অবশ্যই আমি শুনেছি! এই তো সেদিন শুনলাম যে সুলতান জাহান বেগম তার দাসীকে তার স্বামীর সাথে কথা বলতে দেখে এবং মেয়েটি মরে না যাওয়া পর্যন্ত লোহার শিক গরম করে ছ্যাকা দিতে থাকে।"

"এই মহিলাগুলোর খুনের নেশা আছে," হোসাইনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে। "কিন্তু হাশরের দিনে যারা তাদের দাসদাসীর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে আল্লাহ্ তাদের মুখ কালিমা লিপ্ত করবেন।"

"শুধু কি মুখই কালো করবেন?" খানুম জান বিস্ময় প্রকাশ করেন। "দোজখের জ্বলন্ত চাবুক দিয়ে তাদের পিটানো হবে।"

"তাহলেই ওদের উপযুক্ত সাজা হবে," হোসাইনী তার মত ব্যক্ত করে। "আসলেই তারা এমন শাস্তি লাভের যোগ্য।" একটু পর হোসাইনী খানুমকে বলেন, "মালকিন, এই মেয়েটিকে আমার হেফাজতে দিন। আমি ওকে আপনার হয়ে লালন করবো। সে আপনার সম্পত্তি। কিন্তু ওর দেখাশুনার দায়িত্বটা আমাকেই দিন।"

"ঠিক আছে, তুমি ওকে নাও," আমার দিকে হাত উঁচু করে তিনি বললেন।

হোসাইনী সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, এই কথার পর আমার পাশে বসলো। আমার কাছে জানতে চাইলো, "বেটি তুমি কোথা থেকে এসেছো?"

"বাংলা থেকে," কাঁদতে কাঁদতে আমি বললাম।

"বাংলা কোথায়?" হোসাইনী খানুমের কাছে জানতে চায়।

"তুমিই বা কেমন! ফৈজাবাদের আরেক নাম বাংলা।"

"তোমার আব্বার নাম কি? হোসাইনী আমাকে জিজ্ঞাসা করে।

"জমাদার।"

"তোমার বুঝা উচিত," খানুম বাধা দেয়। "কি করে সে তার আব্বার নাম জানবে? সে তো একটি শিশু।"

"তোমার নাম কি?" হোসাইনী আবার প্রশ্ন করে।

"আমিরন।"

"এই নাম আমার পছন্দ নয়," খানুম আবার বলে উঠেন। "আমরা তোমাকে উমরাও বলে ডাকবো।"

"বেটি, তুমি শুনেছো?" হোসাইনী বললো। "এখন থেকে উমরাও বলে ডাকা হলে তুমি উত্তর দেবে? মালকিন যখন ডাকবেন 'উমরাও', তুমি উত্তর দেবে 'জি মাজি।"

সেদিন থেকে আমার নাম হয়ে গেল উমরাও। আমি বড় হয়ে যখন লক্ষ্ণৌর বাঈজিদের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হলাম তখন লোকজন আমাকে উমরাও জান বলে ডাকতে লাগলো। আর আমি যখন কবিতা লিখতে শুরু করি তখন ছদ্ম নাম যোগ

www.pathagar.com

করি 'আদা'। অতএব, আমার পুরো নাম দাঁড়ায় উমরাও জান আদা। খানুম আমাকে সবসময় উমরাও বলে ডাকতেন। হোসাইনী ডাকতো উমরাও সাহিব।

হোসাইনী আমাকে তার কামরায় নিয়ে ভালো ভালো খাবার খেতে দিল। আমাকে গোসল করিয়ে, জামা পড়িয়ে তার বিছানায় শুইয়ে দিল।

সেই রাতে স্বপ্নে, আমি ফৈজাবাদে আমার বাড়ি দেখলাম। আমার ছোট ভাই খেলা করছে। আব্বা পাতার ঠোঙায় করে মিষ্টি এনেছেন। আমার ভাইকে কিছু মিষ্টি দিয়ে আমি কোথায় জানতে চাইলেন। তার কণ্ঠ শুনতে পেয়েই আমি তার কাছে ছুটে গিয়ে দু'হাতে তার হাঁটু জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাহিনী বললাম। ঘুমের মধ্যে আমি কেঁদে-ছিলাম যে আমার হিক্কা উঠে গিয়েছিল। হোসাইনী আমাকে জাগালো। প্রশস্ত বারান্দাসহ বাড়ি, আমার আব্বা, আম্মা, ভাই সব মিলিয়ে গেল। আমি শুধু হোসাইনীর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদছি, আর সে আমার চোখ মুছে দিচ্ছে। তেলের বাতির মৃদু আলোতে আমি দেখতে পেলাম হোসাইনীর চোখও ভিজে গেছে।

হোসাইনী অথবা হোসাইনী খালা বলে ডাকতে শুরু করেছি তাকে। মহিলা আসলেই দয়াদ্র চিত্তের। সে আমাকে এতো আদর যত্নে রেখেছিল যে কয়েকদিনের মধ্যে আমি আমার বাড়ি ও আব্বা আম্মাকে ভুলে গেলাম। এটা সম্ভবত অনিবার্যই ছিল। কারণ আমার নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার আর কোন মূল্য ছিল না। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এক জীবন ছিল। আমি যে খাবার খেতাম আগে সেরকম খাবার খাইনি। আমি যেসব জামা কাপড় পরতাম, সেসবের কথা স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি। খেলাধূলা করার জন্যে তিনটি মেয়েও ছিল ঃ বিসমিল্লাহ জান, খুরশিদ জান ও আমির জান। দিনরাত চলতো নাচগান, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, মেলা এবং প্রমোদ উদ্যানে বনভোজন। আমাদের জন্যে সকল ধরণের বিলাসিতা করার সুযোগ ছিল।

মির্জা রুসওয়া! আপনি হয়তো ভাববেন যে, আমি কেমন নিষ্ঠুর ছিলাম এতো শিগগির আব্বা আম্মাকে ভুলে গিয়ে খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদে ব্যস্ত হয়ে যেতে পারলাম। খানুমের বাড়িতে প্রবেশের সময় যদিও আমার বয়স অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু আমি জানতাম যে, জীবনের বাকি বছরগুলো আমাকে এখানেই কাটাতে হবে। আমি নববধূর মতো ছিলাম, যে জানে যে, যখন সে তার স্বামীর ঘরে যায় তখনই সে জানে এই আসাটা এক বা দু'দিনের জন্যে নয়, ভালো হোক আর খারাপ হোক তাকে জীবনের শেষ পর্যন্ত সেখানেই কাটাতে হবে। ওই দস্যুদের হাতে আমাকে এতো যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল যে খানুমের বাড়ি আমার কাছে স্বর্গতুল্য মনে হয়েছে। আব্বা আম্মাকে আবার দেখতে পাবো এটা যে অসম্ভব তা উপলব্ধি করেছিলাম আমি। কেউ যখন কোন কিছুকে তার সাধ্যের বাইরে বলে জেনে যায় তখন সেটির আশা এক পর্যায়ে ছেড়ে দেয়। যদিও লক্ষ্মৌ থেকে ফৈজাবাদের দূরত্ব মাত্র চল্লিশ ক্রোশ, কিন্তু ওই দিনগুলোতে অনেক অনেক দূরের পথ মনে হতো।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মনের এক অবস্থা নিয়ে কেউ সারাদিন
কাটাতে পারে না। তার চেয়ে উত্তম
দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে ফেলা, যেহেতু তাকে
পথই বদলে ফেলতে হয়।

খানুম জানের মহল বিশাল। প্রতিটি মেয়ের জন্যে পৃথক পৃথক কামরা। তার কন্যা বিসমিল্লাহ্ জান, আরেকটি মেয়ে খুরশিদ জান আমার বয়সী ছিল এবং সবার প্রশিক্ষণকাল চলছিল। পুরোদস্তর বাঈজি ছিল ডজনখানেক এবং প্রত্যেকে তাদের নির্ধারিত সীমার মধ্যে তাদের নিজস্ব যন্ত্রশিল্পী ও ভৃত্যদের নিয়ে বাস করে। তারা সুন্দরী এবং সবাই জমকালো ভাবে সাজতো এবং অনেক গহনা পরতো। প্রত্যেকেরই ছোটখাট ভক্তের দল ছিল। খানুমের মহল অনেকটা পরীস্থানের মতো, সারাক্ষণ হাসিখুশী, সঙ্গীত ও সুর ভেসে আসতো। যদিও আমার বয়স কম ছিল, নারী হিসেবে সহজাত জ্ঞানেই আমি জানতাম যে আমার জন্যে ভালো কি। বিসমিল্লাহ্ ও খুরশিদকে নাচতে ও গাইতে দেখে তাদের এই কলা আয়ত্ব করার প্রবল ইচ্ছা জাগে আমার মধ্যে। আমি নিজেই গুনগুন করে গাইতাম এবং নাচার চেষ্টাও করতাম। অতঃপর আমারও রেয়াজ শুরু হলো। গানের প্রতি আমার দুর্বলতা ছিল, আমার কণ্ঠ ছিল সুরেলা এবং ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের জন্যে উপযুক্ত। নাচের মুদ্রাগুলো শেখা শেষ হলে ওস্তাদ আমাকে লিখার কৌশল শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। তার প্রশিক্ষণ দেয়ার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত শৃংখলাপূর্ণ। তিনি বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীতের তাল, লয় এবং গানের কথা মুখস্থ এবং আমাকে অনুশীলন করাতেন। আমি উঁচু লয়ের সাথে নীচু লয়কে মিলিয়ে না ফেলার ব্যাপারে সতর্ক ছিলাম, যদিও ব্যাপারটা ছিল খুবই সুক্ষ্ম। আমার অভ্যাস ছিল ওস্তাদকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা। প্রথম দিকে তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন। এরপর ব্যাপারটি নিজ দায়িত্বে নিলেন।

একদিন আমি 'রামকলি'র' সুর গাইছিলাম খানুম জানের উপস্থিতিতে। গানের ষষ্ঠ লাইনে এসে কণ্ঠ নিচু করার পরিবর্তে উঁচু লয়ে গাইলাম, কিন্তু ওস্তাদ আমার ভুলটি ধরলেন না। খানুম লাইনটি আবার গাইতে বললেন আমাকে। আমি আগের মতোই গাইলাম এবং ওস্তাদ আমার ভুলটি ধরতে ব্যর্থ হলেন। খানুম আমার দিকে ভ্রুকুটি করলেন। ওস্তাদের দিকে তাকালাম আমি। তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। খানুম তাকে ধরলেন, "কি হচ্ছে এখানে?"

www.pathagar.com

কঠোরভাবে বললেন তিনি। "'রামকলির' আসল জায়গাটাই হলো ষষ্ঠ লাইন, আর সেখানেই এমন ভুল। আমাকে বলুন ষষ্ঠ লাইনটি কি উঁচু লয়ের হবে না নিচু লয়ের?"

"নিচু লয়ের', ওস্তাদ বিড়বিড় করে উত্তর দিলেন।

"আর তুমি কিভাবে গাইছিলে, বলো তো মেয়ে?"

"উঁচু লয়ে," আমি উত্তর দিলাম।

"আপনি খেয়াল করলেন না কেন," ওস্তাদের দিকে ফিরলেন খানুম।

"আমি খেয়াল করতে পারিনি।"

"খেয়াল করতে পারেননি?" খানুম ক্রুদ্ধভাবে বললেন। "আমি ওকে আবার গাইতে বললাম এবং দ্বিতীয়বারও আপনি মুখ বন্ধ রাখলেন যেন আপনার মুখ ভাজা ছোলা দিয়ে ভর্তি। এভাবেই কি আপনি মেয়েগুলোকে শেখাচ্ছেন? কোন পন্ডিতের সামনে যদি সে এভাবে গায় তাহলে তিনি আমার পূর্ব পুরুষদের ওপর থুথু ছিটাবেন।"

ওস্তাদ যেন মাটির সাথে মিশে গেলেন। তখন তিনি চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু কখনো খানুমকে ক্ষমা করেননি। তিনি নিজেকে উঁচুমানের সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বিবেচনা করতেন—এবং আসলেও তিনি তা ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাকে এভাবে ভর্ৎসনা করায় তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একই ঘটনা আবার ঘটলো। একদিন আমি 'সুহা' অনুশীলন করছিলাম। তখনো খানুম উপস্থিত ছিলেন। ওস্তাদের কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম যে তৃতীয় লাইনটি সাধারণ নরম সুরে গাইলেই হবে না বেশী মোলায়েম করে গাইতে হবে।

"বেশী কোমল ভাবে।"

"হায় আল্লাহ, কি শুনছি আমি," খানুম চিৎকার করে উঠলেন। "আমার সামনে এটা বলার সাহস হলো আপনার?"

"কেন? কোথায় ভুল হয়েছে?" ওস্তাদ প্রশ্ন করলেন।

"আমাকে কেন আপনি প্রশ্ন করছেন?" খানুম বললেন। "সুহার তৃতীয় ছন্দ যদি অতিরিক্ত মোলায়েম হয় তাহলে আপনি আমাকে গেয়ে শোনান।"

ওস্তাদ সুহা গুনগুন করে গাওয়ার সময় তৃতীয় ছন্দটি নরম করে গাইলেন। "আশা করি আপনি এখন নিশ্চিত হয়েছেন।" খানুম বললেন। "আপনি নিজে গাইলেন মোলায়েম ছন্দে আর বেচারি মেয়েটিকে এভাবে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছেন। নাকি আমার জ্ঞান পরীক্ষা করতে চাইছেন আপনি? আমি এই মাটির কসম কেটে বলছি যে যদিও আমি নিজে গান গাইতে পারি না, কিন্তু আমার কানকে আপনি কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমি শিক্ষানবীশ নই এবং কোন যেমন তেমন সঙ্গীত পরিবার থেকে আমার সঙ্গীত জ্ঞান আহরণ করিনি। আমি বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ মিয়া গোলাম রসুলের পরিবারের মেয়ে, যে নামের সাথে আপনার পরিচয় থাকা উচিত। যাহোক, এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। আপনি যদি আসলেই শেখাতে চান তাহলে এতে আপনার মনোযোগ থাকা

www.pathagar.com

প্রয়োজন। তা না হলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আমার মেয়েগুলোর শিক্ষা উচ্ছন্নে যাক তা আমি চাইনা।"

"আপনার যেমন মর্জি," বলে ওস্তাদ চলে গেলেন।

এরপর তিনি আর দীর্ঘদিন আসেননি এবং খানুম নিজেই আমাদের তালিম দিচ্ছিলেন। তবলচি দু'জনের মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন এবং বহু বাদ প্রতিবাদ, বন্ধুত্বের কথাবার্তার আদানপ্রদানের পর দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হলো। সেদিন থেকে ওস্তাদ অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। কিন্তু ওস্তাদের পক্ষ থেকে তালিম দেয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ শৈথিল্য না দেখানোর ঘোষণা সত্ত্বেও সঙ্গীতের সকল খ্যাতিমান ওস্তাদের মতোই তিনিও তার গোপন জ্ঞান কাউকে পুরোপুরি দিতে চাননি। কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি আমার এতোটাই অনুরাগ ছিল যে যখনই আমার সন্দেহ হতো অথবা মনে হতো যে ওস্তাদ আমাকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছেন তখন আমি খানুমের কাছে গিয়ে জানতে চাইতাম। আমার আগ্রহ দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন এবং আমার প্রতিও তার মনোযোগ প্রবল হতো। নিজের কন্যার না শেখার প্রবণতায় তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ তার জন্যে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও জনপ্রিয় চটুল গানগুলোর বাইরে সে আর কিছুই শিখেনি এবং এগুলো গাইতেও প্রায়ই তাল হারিয়ে ফেলতো এবং ছন্দপতন হতো। খুরশীদ দেখতে পরীর মতো সুন্দরী, কিন্তু কণ্ঠ ভালো ছিল না। তার কণ্ঠ ছিল বলা যায়, ফাটা বাঁশের মতো। নর্তকি হিসেবে সে চমৎকার ছিল। অতএব, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নাচতো। একটি বা দু'টি সাধারণ গান গাইতে পারতো সে এবং নিজের খেতাব দিয়েছিল 'গায়িকা'। আমাদের মধ্যে ভালো গায়িকা ছিল বেগা জান। কিন্তু বেচারি এতোটাই কালো ছিল যে, কেউ রাতে দেখলে ভয় পেয়ে যাওয়ার মতো। কড়াই এর তলার মতো কালো ছিল তার গায়ের রং, তার উপর মুখের ওপর বসন্তের দাগগুলো এতো গভীর ছিল গর্তগুলো পূরণ করতে এক পোয়া মাংসের প্রয়োজন হতে পারতো। তার চোখ সবসময় রক্তলাল থাকতো এবং চ্যাপ্টা নাকের ওপরটা একেবারে থ্যাবড়ানো ছিল। নিগ্রোদের মতো মোটা তার ঠোঁট এবং বড় বড় দাঁত বাইরে বেরিয়ে থাকতো। তার শরীর ছিল মোটাসোটা গড়নের এবং চারদিকে যেন মেদ ঝুলে আছে, এমন মনে হতো। লোকজন ওকে বলতো হাতির বাচ্চা। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে স্বর্গীয় যাদু ছিল এবং সঙ্গীতের জ্ঞানও ছিল গভীর। ছন্দ তাল ভুল হলে ধরিয়ে দেয়ার সাধ্য একমাত্র তারই ছিল। যখনই আমি তার কামরায় যেতাম তাকে পীড়াপীড়ি করতাম, "আমার জন্যে ভালটা একটু গাওনা বোন!"

সে গাইতো। আমি ভান করতাম যে ছন্দটা ভালো করে বুঝতে পারিনি এবং তাকে আবার গাইতে বলতাম। সে ধমক দিতো, "তুমি আসলেই পাজী একটা মেয়ে। তোমার ওস্তাদকে বলো না কেন?" আমি বলতাম, "এই ছন্দ তুমিই ভালো গাইতে পার।" কখনো কখনো আমি নিজেই তানপুরা তুলে নিয়ে তাকে পুরো গান গাইতে বাধ্য করতাম। তার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিলাম।

www.pathagar.com

খানুমের মহলের মেয়েগুলোকে শুধু যে গান ও নাচই শিক্ষা দেয়া হতো তা নয়। অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার জন্যেও স্কুল ছিল, যেখানে আমাকেও যেতে হয়েছে। এই স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এক মৌলভী সাহেব। আমি তার পরিপাটি করে ছাঁটা পাকা দাড়িশোভিত উজ্জ্বল মুখ, তার দাগহীন সাধারণ পিরহান, রক্তলাল পাথর ও নীলকান্ত মণি শোভিত তার আংটিগুলো এখনো পরিষ্কার মনে করতে পারি। তার তসবি'র কথাও আমার মনে আছে, যার দানাগুলো মক্কার মাটি দিয়ে তৈরি। তাছাড়া নামাজে সিজদা দেয়ার সময় তার কপাল যেখানে স্থাপিত হতো সেখানে তিনি একটি চাকতি রাখতেন, সেটিও মক্কা শরীফের মাটিতে তৈরি। হাতলে রূপালি বেস্টনীসহ তার ছড়ি, তার ছোট্ট নল লাগানো হুক্কা, অফিসের বাক্স সবই স্পষ্ট মনে আছে আমার। মৌলভী সাহেব অত্যন্ত পরিশীলিত রুচির মানুষ এবং পছন্দের ব্যাপারে অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিলেন। দীর্ঘদিন আগে হোসাইনী খালার সাথে খোলামেলা সাক্ষাতের সুযোগে তার ব্যাপারে মৌলভী সাহেবের অনুরাগ জন্মেছিল। তখন থেকে তিনি সেই সম্পর্কের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। হোসাইনী খালা তাকেই তার প্রকৃত স্বামী হিসেবে দেখতো। দুই বুড়োবুড়ি যেভাবে নিজেদের মধ্যে প্রেম বিনিময় করতো তা তরুণ প্রেমিক প্রেমিকাদের দু'টি বিষয় শিক্ষা দিতে পারতো।

মৌলভী সাহেবের বাড়ি ছিল জাইদপুরে, যেখানে আল্লাহর রহমতে তার জমি, ইজারাদার ও নিজস্ব বাড়ীঘর ছিল। তার বিবি, বড় বড় ছেলেমেয়েও ছিল। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি লক্ষ্মৌ আসেন এবং লক্ষ্মৌতেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। বাড়ি থেকে আসার পর চার-পাঁচবারের বেশী আর সেখানে যাননি। আত্মীয়স্বজন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাদেরকেই লক্ষ্মৌতে আসতে হতো। কখনো তারা তাকে সামান্য টাকা পয়সা বা অন্যকিছু পাঠাতো। খানুম তাকে দিতেন মাসিক দশ টাকা, যা সাথে সাথে তিনি হোসাইনী খালার হাতে তুলে দিতেন। হোসাইনী খালাই ছিল তার খাজাঞ্চি। হোসাইনী তাকে খাবার, পানীয়, আফিম ও তামাক সরবরাহ করতো। তার জামাকাপড় বানিয়ে দিতো। খানুম নিজেও মৌলভী সাহেবকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তার কারণেই হোসাইনী খালার প্রতিও বিশেষভাবে বিবেচক ছিলেন।

হোসাইনী খালা যেহেতু আমার দায়িত্ব নিয়েছেন, অতএব মৌলভী সাহেব ও আমার শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। তিনি আমাকে কন্যার মতো দেখেছেন, এ দাবি করা সম্ভবত ধৃষ্টতা হবে, কিন্তু এতে কোন সন্দেহ ছিল না যে, অন্যান্য মেয়ের চাইতে আমাকে বেশী আদর যত্নে শিক্ষা দিয়েছেন। কাঠের গুড়ি থেকে আমাকে তিনি খোদাই করে ভদ্রস্থ করেছেন। আমি তার পায়ের কাছে বসে শিখতাম যে কিভাবে আমাকে আমার সামান্য অবস্থা থেকে বিত্তবান অভিজাতদের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আদায় করতে হবে। তিনি আমাকে আপনার মতো সংস্কৃতিবান লোকদের সাথে কথা বলার জন্যে আস্থাবান করে গড়ে তুলেছেন। আমি যে অভিজাতদের দরবারে দাখিল হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং উচ্চ মর্যাদার মহিলাদের মহলে আমন্ত্রিত হয়েছি সেজন্যে আমি মৌলভী সাহেবের কাছে ঋণী।

www.pathagar.com

আমার অক্ষর জ্ঞান অর্জন শেষ হলে মৌলভী সাহেব আমাকে প্রাথমিক ফার্সি বই কারিমা, মামাকিমা ও মাহমুদ-নামা পড়ান। এই বইগুলো দ্রুত শেষ করার পর তিনি আমাকে 'আমাদ-নামার ব্যাকরণের সূত্রগুলো মুখস্থ করান। এরপর আমি শেখ সাদীর 'গুলিস্তান' পড়তে শুরু করি। তিনি একসাথে আমাকে মাত্র দু'টি লাইন শেখাতেন। আমি মনোযোগের সাথে পড়তাম, বিশেষ করে কবিতাগুলো। শিগগিরই আমি সব শব্দের জট ছাড়াতে সক্ষম হলাম এবং অনায়াসে প্রতিটি লাইনের গঠন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারতাম। আমার বানান ও চিঠি লিখা নিয়েও তাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। গুলিস্তানের পর অন্যান্য ফার্সি গ্রন্থ পাঠ আমার জন্যে সহজ হয়ে গেল এবং আমার তখন মনে হতো যে ইতোমধ্যে জানা বিষয়গুলোই আমি পুনরায় পাঠ করছি। আমি ফার্সি ছাড়া আরবি ব্যাকরণও শিখলাম এবং তর্ক শাস্ত্রের বেশ কিছু সূত্রও আমাকে পাঠ করতে হলো। মৌলভী সাহেব প্রায় আট বছর ধরে আমাকে শিক্ষা দেন। কবিতার প্রতি আমার আগ্রহকে আবেগে পরিণত না করা পর্যন্ত যে তিনি আমাকে শিখিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

আমি তোতার মতো কথা বলার মানুষ নই
প্রেম ও সততার পাঠশালায় কাউকে
নীতি ও অনুশীলনের মাধ্যমে শেখানো হয়।

পাঠশালায় আমরা চারজন ছিলাম : তিনটি মেয়ে ও একটি ছেলে–গওহর মির্জা। গওহর মির্জা ছিল অত্যন্ত বদমাশ ও দুষ্ট প্রকৃতির। ভেংচি কেটে, খোঁচা দিয়ে কিংবা কানের ওপর ঘুষি মেরে জ্বালাতো আমাদের। সে আমার চুল ধরে টানতো, বেণীতে কিছু আটকে দিতো। আমাদের নলের কলমের মাথা ভেঙ্গে ফেলতো। কখনো কালির দোয়াত উল্টে দিতো। ওর দুষ্টুমিতে আমরা অতীষ্ঠ হয়ে উঠতাম এবং প্রায়ই আচ্ছা মতো ধোলাই দিতাম। কিন্তু এসবের কোন আছড় পারতো না ওর ওপর। অন্য মেয়েদের চাইতে ওর হাতে আমাকে বেশী জ্বালাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারণ আমি নতুন ছিলাম। কিছুটা লাজুকও ছিলাম এবং ওস্তাদের কথা সবসময় পালন করতাম। গওহর মির্জার বিরুদ্ধে তার কাছে প্রায়ই অভিয়োগ করতাম। মৌলভী সাহেব ওকে যখন পিটাতেন তখন আবার ওর জন্যে খারাপ লাগতো। কিন্তু এতেও গওহর মির্জার দুষ্টুমি বাঁদবামিতে কোন ছেদ পড়তো না। আমিই শুধু ওর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হতাম এবং শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

গওহর মির্জা ছিল বিত্তবান অভিজাত নওয়াব সুলতান আলী ও বানো নামে এক বাঈজির পুত্র। বানোর সাথে নওয়াবের সম্পর্ক ছিল। যদিও সেই সম্পর্ক দীর্ঘদিন আগেই চুকে গিয়েছিল, কিন্তু নওয়াব ছেলেটির লালন পালনের জন্যে প্রতি মাসে দশ টাকা করে দিতেন এবং তার বেগমের অজ্ঞাতে মাঝে মাঝে ছেলেকে ডেকে পাঠাতেন। বানো বাস করতো হোসাইনী খালার ভাই এর কাজী কা বাগ এর বাড়ির পাশেই। তাদের বাড়ির মাঝখানে একটি দেয়াল ছিল দরজা দ্বারা যুক্ত। পুরো মহল্লা গওহর মির্জার অত্যাচারে অতীষ্ঠ ছিল। কারণ সে সবসময় লোকজনকে জ্বালাতন করতে নতুন নতুন ফন্দিফিকির করতো। সে তাদের বাড়িতে ঢিল ছুঁড়তো। একদিন সে মুনিয়ার খাঁচা খুলে দেয়ায় সবগুলো পাখি উড়ে যায়। তার মা হাল ছেড়ে দিয়ে গওহর মির্জাকে নিকটস্থ মসজিদের মক্তবে ভর্তি করে দেয়। মক্তবে সে তার সহপাঠীদের ওপরও তার কৌশল খাটাতে শুরু করে। সে একজনের ফতুয়ার ভিতরে একটি ব্যাং ঢুকিয়ে দেয়, আরেকজনের টুপি ছিঁড়ে

www.pathagar.com

ফেলে, একটি মেয়ের চপ্পল কূয়ায় ফেলে দেয়। একদিন ওস্তাদ নামাজ পড়ছিলেন। মির্জা তার নতুন সুন্দর জুতা জোড়া নিয়ে পাশের পুকুরে নৌকার মতো ভেসে থাকার জন্যে নিক্ষেপ করে। ওস্তাদ তাকে প্রচন্ড মার দেন এবং মুখের ওপর এতো জোরে চপেটাঘাত করেন যে, তার মুখ লাল হয়ে উঠে। এরপর কান ধরে টানতে টানতে গওহরকে ওর মায়ের কাছে দিয়ে আসেন। গহওর মির্জা কাঁদতে কাঁদতে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। হোসাইনী খালা সে সময়ে বানোর কাছে গিয়েছিলো। ছেলেটির অবস্থা দেখে সে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে। তার কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুই জানতো না হোসাইনী। অতএব ওস্তাদকে অভিশাপ দিতে শুরু করে, লোকটি কি ওস্তাদ না কসাই। দেখ, কেমন করে ছেলেটিকে মেরেছে! মুখটা ফুলে গেছে, কান ছিলে গেছে। আল্লাহ যাতে এমন কাউকে ওস্তাদ হিসেবে না পাঠান। আমাদেরও একজন মৌলভী সাহেব আছেন। তিনি কি যত্ন করেই না তালেব এলেমদের পড়ান।"

বানো সাথে সাথে সুযোগটা নেয়, "হোসাইনী, আল্লাহর ওয়াস্তে একেও তোমার মৌলভী সাহেবের কাছে নিয়ে যাও। তোমার ভাই এর সাথে প্রতিদিন সকালে পাঠিয়ে দেব। সন্ধ্যায় আবার তার সাথেই ফিরে আসবে।"

পরদিন হোসাইনীর ভাই রীতিমাফিক মাথায় মিষ্টির ঝুড়ি ও এক হাতে গওহর মির্জাকে ধরে নিয়ে এলো। হোসাইনী খালা খুব খুশী। সে মেয়েদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে গওহর মির্জাকে মৌলভী সাহেবের হাতে তুলে দিল।

এরপর থেকেই প্রতিদিন সাহায্যের জন্যে মেয়েদের চিৎকারে মহল পূর্ণ থাকতো। ওর বাঁদরামির বেশীর ভাগই সহ্য করতে হতো আমাকে। মৌলভী সাহেব নিয়মিত ওকে ধোলাই দিতেন, কিন্তু তাতে সে আমাকে জ্বালাতন করা ছাড়েনি। এভাবে অনেকগুলো বছর কেটে গেল এবং আমাদের মধ্যে এক ধরণের সমঝোতা হলো অথবা বলা যায় যে, ওর দ্বারা সেভাবে জ্বালাতন ভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম আমি।

গওহর মির্জা ও আমি প্রায় সমবয়সী ছিলাম অথবা সে আমার চেয়ে দু'এক বছরের বড় হতে পারে। যখন আমার বয়স তের এবং ওর চৌদ্দ বা পনের তখন তার দুর্বিনীত ও অমার্জিত আচরণের মধ্যে অদ্ভুত এক পরিতৃপ্তি পেতে শুরু করলাম। তার কণ্ঠ যে সুন্দর ছিল—বাঈজির পুত্র হওয়ার কারণে এটা অবাক হওয়ার ব্যাপার নয়, সঙ্গীতকে যথার্থ ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করার কৌশল ও তার ভালোভাবে রপ্ত ছিল। তাছাড়া গান গাওয়ার সময় তার প্রতিটি অঙ্গে এক ধরণের আলোড়ন সৃষ্টি হতো, যেন কোন সুর শিল্পী বীণার তার স্পর্শ করছে। সুর ছিল তার আত্মায়। সুরের প্রতি আমাদের দু'জনের মাঝেই অভিন্ন আবেগ কাজ করতো এবং মৌলভী সাহেব যখনই বাইরে থাকতেন আমরা দু'জন অনেক মজা করতাম। কখনো আমি গাইতাম আর সে তার অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে সেই গানকে মূর্ত করতে তুলতো। আবার কখনো সে গাইতো এবং আমি আমার হাত নেড়েচেড়ে সময় কাটাতাম। সকল বাঈজি গওহর মির্জার কণ্ঠ পছন্দ করতো এবং তাকে তাদের

www.pathagar.com

কামরায় আমন্ত্রণ জানাতো। আমি সবসময় তার সাথে যেতাম। কারণ আমাকে ছাড়া তার গানের পরিবেশনা খাপছাড়া হয়ে যেতো। একটি মেয়ে গওহর মির্জার গানের অধিক অনুরাগী ছিল, তার নাম আমির জান। সে নওয়াব মুফতাকারুদ্দৌলাহ'র অধীনস্থ ছিল। আল্লাহ তাকে এতো রূপ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, যৌবনে পুরোপুরি তা বিকশিত হয়েছিল। আমির জান একহারা গড়নের, অতি মসৃণ তার হাত পা;

চাপা ফুলের চেয়েও ফর্সা তার গায়ের রং
প্রতিটি রেখায় পুরিস্ফুট মধুর সরলতা
তার আকর্ণণ ক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে
দৃষ্টিতে তার ঐশ্বরিক ক্রোধ

"আমির জানকে কি আপনার মনে আছে, মির্জা রুসওয়া?"

"শেষবার যখন তাকে দেখি তখন সে এতো কুৎসিৎ হয়ে গিয়েছিল যে তার পানে তাকিয়ে থাকা সহ্য করতে পারিনি আমি। একটি কাপড় দিয়ে কোনমতে পেচানো ছিল তার শরীর।"

"আর ওই দিনগুলোতে আমির জান ছিল সবার চোখের ধ্রুবতারা। সে এতো অহংকারী ছিল যে, খুব কমসংখ্যক লোককে গ্রহণের দাক্ষিণ্যই শুধু দেখাতো এবং তারাও উচ্চ সামাজিক মর্যাদার হলে। অত্যন্ত জাঁকজমকের মধ্যে বাস করতো সে। যখন বাইরে বের হতো তখন চারজন দাসীকে সাথে নিতো। একজন বহন করতো তার হুক্কা, আরেকজন নিতো পাখা। তৃতীয়জন বয়ে নিতো পানির জগ আর চতুর্থজনের হাতে থাকতো তার পানের বাটা। তকমা আঁটা প্রহরী থাকতো তার পালকির দু'পাশে।

এরই মাঝে বলেছি যে, আমির জান গওহর মির্জার কণ্ঠ খুব পছন্দ করতো, যদিও নিজে কোন কিছু গাইতে পারতো না, কিন্তু ভালো গান শোনার ঝোঁক ছিল তার।

গওহর মির্জা শৈশব থেকে বেশ্যাদের দ্বারা পালিত এবং তারা সবাই তাকে ভালোবাসতো। তার গায়ের রং একটু কালো হলেও দৈহিক গড়ন নিখুঁত। এমনিতেই সে চটপটে এবং পরিপাটি পোশাক পরতো। তাছাড়া সে ছিল সুরসিক। তার চোখ দুষ্টুমিতে জ্বলজ্বল করতো। বাস্তবে তার মাঝে সবকিছু ছিল, যা.....

"যা খুব অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার নয়," মির্জা রুসওয়া ব্যাখা করলেন। "বিশেষ করে কেউ যদি জানে যে কে তাকে গর্ভে ধারণ করেছিল।"

"ওহ্, তাহলে আপনি বানোকে জানেন?"

"তুমি ধরে নিতে পারো যে, আমি তাকে জানতাম।"

"আপনার স্বীকারোক্তিকে কিভাবে আড়াল করে রেখেছিলেন।"

"সে পর্দা এখন ছিঁড়ে গেছে।"

"চমৎকার! তার চেয়ে আপনার সাথে মজার কোন বিষয়ে আলাপ করি। আমার জীবনের কাহিনী কিছুক্ষণের জন্যে তুলে রাখুন।"

www.pathagar.com

"মেহেরবানী করে তোমার বর্ণনা অব্যাহত রাখো। মজা করার জন্যে পুরো রাত পড়ে আছে।"

"চমৎকার! আপনি দ্বিতীয়বার বিজয়ী হলেন। ঠিক আছে, আমি আমার কাহিনীই বলে যাচ্ছি।

"ভোর থেকে শুরু করে সকাল দশটা বা এগারটা পর্যন্ত মৌলভী সাহেবের তালিম ছেড়ে উঠে যাওয়ার সাহস করতো না কেউ। এক মুহূর্তের জন্যেও নয়। উনি দুপুরের খাবার খেতে গেলেই শুধু আমরা অবসর পেতাম। এরপর বাঈজিদের কামরায় যেতাম। একদিন আমরা আমির জানের কামরায় গেছি তো জাফরির কামরায় যেতে হয়েছে পরদিন। তৃতীয় দিন হয়তো বক্কন জানের কামরায়। যেখানেই আমরা গেছি, আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে শুকনো ফল, মিষ্টি, হুক্কা ও পান দেয়া হয়েছে।"

"তুমি কি শৈশবেই ধূমপান শুরু করে দিয়েছিলে?"

"এটা শিখেছিলাম গওহর মির্জার কাজ থেকে। এক সময় আমি কৌতূহল বশত পান করেছি। এখন তো বাজে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।"

"গওহর মির্জা 'চান্দু'ও (পানিতে আফিম জ্বাল দিয়ে হুক্কায় ভরে টানা) সেবন করতো। তুমি যদি ওর কাছ থেকে সে অভ্যাসও রপ্ত করে থাকো তাহলে আমি খুব অবাক হবো না।"

"আল্লাহ আমাকে চান্দু সেবন থেকে রক্ষা করেছেন। আফিম সম্পর্কে আমি অবশ্য তা বলতে পারি না। পবিত্র কারবালা জিয়ারত করে আসার পর থেকে আমার ঠান্ডা লেগে থাকতো এবং ভিতরে কফ জমে গিয়েছিল। ডাক্তার আমাকে আফিম সেবনের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন।"

"ঠান্ডার অন্য নিরাময় সম্পর্কে কিছু বলো।"

"সে সম্পর্কে এখন কিছু না বলাই ভালো। দীর্ঘদিন আগে আমি কসম কেটেছি তা সেবন না করার জন্যে।"

"ওটা চরম এক বদভ্যাস। আমাকে বলতেই হবে যে, আমার অবস্থা সেদিক থেকে ভালো।

মদ সেবন করবো না বলে শপথ করেছি,
কিন্তু আমি তো ইচ্ছার ব্যাপারে তো
কসম কাটতে পারিনি।
কেউ যাতে আমাকে শপথ ভাঙ্গতে
প্ররোচিত না করে।"

"চিরন্তন একটি সত্য বলেছেন, মির্জা রুসওয়া। আপনি পান করতে রাজী থাকলে আমাকে শপথ নেয়াতে পারি।"

www.pathagar.com

"তুমি কি আমাকে সঙ্গ দেবে?"

"আল্লাহ না করুন।"

"কেন তুমি অস্বীকার করছো, যখন–

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর শীতল বাতাস বইছে,
আর সুস্বাদু মদের স্রোতে যখন দৃষ্টি হয়েছে ধন্য।

"নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন মির্জা রুসওয়া! আমাকে আপনি মদিরার জন্যে তৃষ্ণার্ত করে তুলছেন। আল্লাহর দোহাই, প্রসঙ্গ পাল্টান ।

আমার যদি আবার মদ্য পানের ইচ্ছা হয়
তখন কি হবে, পানপাত্র আমার
ঠোঁটকে আর ভিজাতে পারবে না।"

"কবিতাটি চমৎকার, উমরাও জান।"

"শুকরিয়া :

যেখানে প্রেমিকের রক্ত ঝরেছিল সেই মাঠের
পানে তাকায় প্রেমিকা। রক্তের রং তাকে
উদ্যান ও গোলাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর। তুমি অত্যন্ত ভাবের মধ্যে আছো। তোমার যৌবনের দিনগুলোর উদ্বেল স্মৃতি থেকেই এই কবিতার সৃষ্টি।"

"জি না জনাব। এটা আমার যৌবনের দিনের স্মৃতি নয়, বরং আমাকে অনুপ্রাণিত করা মদিরার প্রভাত;

ধর্মের বাণী প্রচারক, আজ আমার বিরুদ্ধে
অভিযোগ তোলার অনেক কারণ আছে।
তুমি মদিরা ছেড়েছো, আর আমি আবার
মদিরায় ফিরে গেছি।"

"অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজানো কবিতা এবং ছন্দ মিলও অদ্ভুত। এখন আমি এর সাথে একটু মিলাতে চেষ্টা করি।

আমি হজ্ব করতে কা'বায় গিয়েছিলাম
কিন্তু আমার হজ্ব ব্যর্থ হয়েছে।
আমার পাপপূর্ণ পা আবার মানুষের
ভালোবাসার পথ খুঁজে পেয়েছে।"

"কথাগুলো সুন্দরভাবে বলেছেন, মির্জা রুসওয়া! এগুলোকে এরকম একটি কবিতায় সাজান না কেন :

আমি কা'বার দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিয়েছি
এবং অতি হতাশায় হারিয়েছি আমার বিশ্বাস,
অতঃপর মানুষের ভালোবাসার পথ নিয়েছি।

www.pathagar.com

"বেশ ভালো।"

"আরো একটি কবিতা আছে :

যে শহর ছেড়ে আমি পালিয়েছি সেখানে
প্রেম পাগল এতো লোকের বসবাস যে
পাখি, পশু ও জঙ্গলের পানে ধাবিত হয়েছি।"

"কোন কবিতার সূচনার জন্যে খারাপ নয়।"

"এটি শুনুন :

মদিরার সুন্দরী কন্যার জন্যে এই পাত্র ধরেছি
কিন্তু আমার ব্যগ্রতার মাঝে শুধু তার স্মৃতিই আসে।"

"কবিতা রচনার আদর্শ এক অবস্থায় আছো তুমি উমরাও। আরেকটি কবিতা শুনে তুমি তোমার কাহিনী শুরু করো!

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মৃদুমন্দ বায়ু, একটি উদ্যান
এবং কিছু সুরা দাও আমাকে।
এছাড়া আমাকে আরেকবার যৌবনও দিও।"

"মির্জা রুসওয়া, যৌবনের হারানো দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার সব উৎসাহ ফিকে করে দিয়েছেন আপনি। চলুন এখন আমরা আমাদের কাহিনীতে ফিরে যাই।"

"এভাবে খানুম জানের বাড়িতে বহু বছর কেটে যায় আমার। এখানে বলার মতো তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ঘটেনি। হ্যাঁ, একটি ঘটনা মনে পড়েছে। বিসমিল্লাহ জানের কুমারীত্ব মোচন। ঘটনাটি অত্যন্ত উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে ঘটেছিল। সেই দিনগুলোতে আর কোন অনুষ্ঠান এতো জাঁকজমকের সাথে পালিত হতো না। শুধু রাজা বাদশাহ বা নওয়াবদের অভিষেক উৎসবই তেমনভাবে পালিত হতো। এই অনুষ্ঠানের জন্যে দিলারামের বরাদরী নেয়া হয়েছিল। চমৎকারভাবে সাজানো ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল বরাদরী। বেশ্যারা ছাড়াও লক্ষ্ণৌর গায়ক গায়িকা, সুরশিল্পী, কাশ্মিরী মুকাভিনেতারা, দিল্লির মতো দূর এলাকা বিখ্যাত বাঈজি ও গায়ক গায়িকাদের সমাবেশ ঘটেছিল এ উপলক্ষে। সাত দিন সাত রাত ধরে চলে নাচ গানের আসর। শহরে আলোচনার বিষয়ে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত খানুম সবাইকে মিষ্টি ও উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। বিসমিল্লাহ জান তার একমাত্র কন্যা এবং তিনি তার জন্যে যথেষ্ট কিছু করতে পারেননি।

বিসমিল্লাহ জানের কুমারীত্ব মোচনের জন্যে নির্বাচিত তরুণটি ছিল নওয়াব চব্বন। নানীর তরফ থেকে ছেলেটি বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিল উত্তরাধিকার সূত্রে। আমি জানি না যে, খানুম কি করে এতো তরুণ ও বিত্তবান একজনকে তার জালে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ অনুষ্ঠান উপলক্ষে নওয়াব চব্বনের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়

www.pathagar.com

হয়েছিল। এর মাধ্যমে বিসমিল্লাহ জান তার রক্ষিতায় পরিণত হয় এবং লোকটি তাকে তার জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে ভালোবাসতো।

"আপনার মনে যে বিষয়টি ঘুরপাক খাচ্ছে তা আমার পক্ষে আলোচনা করা কঠিন। আমার অবস্থানের মহিলারা সাধারণতঃ অশালীন, কিন্তু তা এই পেশায় যখন তাদের নিয়োগ করা হয় সেই সময়ের। তাছাড়া শরীরের তো নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে এবং যৌবনের প্রথম দিকের বেপরোয়া তাড়নাকে কিছুটা ছাড় দিতেই হবে। কিন্তু বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একজন শিখে যায় যে পরিমিতি বোধের মধ্যে থাকার জন্যে কিভাবে সহজাত চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু যাই বলা বা করা হোক এটা তো সত্য যে, বেশ্যারাও রমণী এবং অন্য মহিলাদের মতোই তাদেরও একই ধরণের আবেগ অনুভূতি আছে। আমাকে এ বিষয়ের ওপর কথা বলিয়ে আপনি কি হাসিল করবেন মির্জা রুসওয়া?"

"তুমি যদি সংস্কৃতিবান মহিলা না হতে তাহলে তোমার ক্ষেত্রে এই অজুহাতগুলো গ্রহণযোগ্য হতো এবং আমিও পীড়াপীড়ি করতাম না। শিক্ষিত লোকদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে রাখঢাক করাটা সঙ্গত নয়।"

"আপনি কি বলতে চান যে, শিক্ষা একজনের শালীনতা বোধকে ধ্বংস করে দেয়? এটা খুব ভালো যুক্তি নয়।"

"বিতন্ডা করে সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। কাহিনীকে তুমি এগিয়ে নাও।"

"আশা করি আপনি এটি কাগজে ছাপাবেন না।"

"কেন?"

"কি কেলেংকারীর কথা। আপনি কি আমার নামটাও আপনার মতো কুখ্যাত করে তুলবেন?"

"আমার সাথে থাকলে ব্যাপারটা এতো মারাত্মক হবে না।"

'সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিন তুমি
কুখ্যাত রুসওয়ার ভালোবাসা স্বীকার করেছো
তার মতো খারাপ নাম অর্জিত না হলে
সে তোমাকে যেতে দেবে না।
(রুসওয়া অর্থাৎ লেখকের নামের অর্থ খ্যাতিহীন একজন।)

"মির্জা রুসওয়া, কেউ আপনার প্রেমে পড়লে অবশ্যই সেই দিনের কথাও স্মরণে রাখবে :

মতের প্রশ্নে কি আমরা কোন আলোচনা করেছি
অথবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কি কারো পরামর্শ নিয়েছি
আমার মাথায় তো কিছু ঢুকছে না
যতোক্ষণ না তোমার কথা বলা হয় এবং
আমরা তোমাকে নিয়ে আলোচনা না করি।

www.pathagar.com

"এটি কার কবিতা?"

"সবসময় আমাকে এই প্রশ্ন করেন কেন আপনি?"

"বুঝতে পারছি। তাহলে তো তুমি পুরো কবিতাই জানো।"

"আমি আর দু'টি লাইন বলছি :

ভালোবাসা নিয়ে আমি বাণিজ্যে যাই
সুন্দরীর সাথে সমঝোতার আগে
আমি পিছনে ফিরে তাকাই না।"

"তোমার স্মৃতির ওপর খুব চাপ সৃষ্টি না করে কি তুমি বাকী লাইনগুলো স্মরণ করতে পারো?

কোন প্রতিশ্রুতিকে সে আড়াল করে না
নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা আবার ভেঙ্গেও ফেলে
কাতর হয়ে অনুনয় করার আগে
সে আর তার অনুরাগ দেখায় না।"

"তোমার কি আরো মনে আছে?"

"আমি আরেকটি কবিতা মনে রেখেছি :

কথাবার্তায় সে সবসময় আমার প্রসঙ্গ তোলে
যদিও এতে তার সুনাম হানির ভয় আছে।

এই লাইনগুলো শুনুন :

আমাকে জ্বালাতে প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাকে আমন্ত্রণ করে
দোষ দিতে হলে তাদেরকেই দিতে হয়।
আমার বদনাম করার চেষ্টায়
প্রেমের সুন্দর নামে তারা কালিমা লেপন করে"

"আমার নিজেরও এই ছন্দের একটি কবিতা আছে। আল্লাহ জানেন সেটা কোথায় হারিয়ে গেছে। শেষ লাইনগুলো শুধু মনে আছে আমার!

সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিন তুমি
কুখ্যাত রুসওয়ার ভালোবাসা স্বীকার করেছো,
তার মতো খারাপ নাম অর্জিত না হলে
সে তোমাকে যেতে দেবে না।"

"সত্যিই সুন্দরভাবে সাজানো। আপনার ছদ্মনামের কেরামতিই এটাকে বিশেষ স্বাদ দিয়েছে।"

"আমার ছদ্মনামের কথা বলো না। এ শহরে এখন বেশ ক'জন 'রুসওয়া' আছে। বহু লোক তাদের নিজস্ব ছদ্মনাম বর্জন করে আমারটা গ্রহণ করেছে। আমি খুশী যে তারা

www.pathagar.com

আমার আসল নাম জানে না, তাহলে তারা সে নামটিও গ্রহণ করতো। ইংরেজদের প্রথা অনুসারে পুত্রেরা তাদের পিতাদের ডাক নামই গ্রহণ করে থাকে। এতে আমার মনে এক ধরণের পরিতৃপ্তি বোধ জাগে যে এরা সবাই আমার আধ্যাত্মিক উত্তরসুরী। এই সংখ্যা যতো বৃদ্ধি পাবে আমার নামও ততো উজ্জ্বল হবে। কিন্তু তুমি পাশ কাটিয়ে যেও না। আমি যা জানতে চেয়েছি তা তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে।"

"আপনি কি সাংঘাতিক লোক!"

"তোমরা মেয়েরা বিয়ের জলসায় যে অশ্লীল গানগুলো গেয়ে থাকো আমি তার চাইতে সাংঘাতিক নই।"

"আমাদের লক্ষ্ণৌ শহরে নয়। আমরা কখনো গাইনা। নিচু মানের বেশ্যারাই তা করতে পারে এবং তাও শুধু মহিলাদের নির্ধারিত আসরেই। আমার বিশ্বাস এখনো গ্রামে অশ্লীল গান গাওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট মেয়েদের সংগ্রহ করা অনেকটা প্রথায় পরিণত হয়েছে। এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত।"

"আমার নিজ চোখে নামীদামী পরিবারের পুরুষদের দেখেছি তাদের মহিলাদের যে অশ্লীল ভাষায় ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে তা দেখতে অন্দরমহলের দরজায় ভিড় করতে। তাদেরকে দেখেছি এসব শুনে পরিতৃপ্তিতে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসতে এবং এ রকম একটা সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহতা'য়ালাকে ধন্যবাদ জানাতে। আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা যে ওই দিনগুলো যেন আর ফিরে না আসে। তাছাড়া বিয়ের রাতে অশ্লীল রসিকতায় এমনকি সম্মানিত মহিলারা পর্যন্ত অংশ নিয়ে থাকে। আমি তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে চাইনা। যা হোক, আমরা এসব প্রথা দূর করার সংস্কারক নই। ওসব থাক, তোমার কাহিনী বলে যাও।"

বিসমিল্লাহ'র কুমারীত্ব মোচনের পর খুরশীদ ও আমিরের ক্ষেত্রেও একই ধরণের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করলাম। এ ঘটনাটি আসলে কি তা জানার অদ্ভুত কৌতূহল ছিল আমার মধ্যে এবং আমি বলতে গেলে অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম তা জানতে। আমি শুধু জানতাম যে, কুমারীত্ব মোচনের অনুষ্ঠানের পর বিসমিল্লাহ হলো বিসমিল্লাহ জান এবং খুরশীদ হলো খুরশীদ জান। এরপর থেকে এরা একটু উঁচু দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ শুরু করলো এবং আমার সাথে মেলামেশাও বন্ধ করে দিল। মনে হলো যে তাদেরকে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী বসবাস ও চলাফেরা বা কাজ করার লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। তাদেরকে আসবাবপত্রে সাজানো কামরা দেয়া হলো, যেখানে মেঝের ওপর সাদা চাদর বিছানো এবং শোয়ার বিছানাও পরিপাটি। রূপ সজ্জার সামগ্রীতে পূর্ণ বাক্স, রূপার পানের বাটাও দেয়া হলো তাদেরকে। এছাড়া কামরায় এক কোণায় পিকদানিও দেয়া হয়েছিল। তাদের কামরার দেয়াল সিরীয় আয়না ও সুন্দর চিত্রে সাজানো। ঘরের ছাদে শামিয়ানা, যার কেন্দ্রস্থলে ঝাড়বাতি ও কোণার দিকে গোলক। প্রতিটি মেয়ের জন্যে সারাক্ষণ অপেক্ষা করতো

www.pathagar.com

কয়েকজন পরিচায়িকা ও পুরুষ ভৃত্য। তারা পুরুষদের গ্রহণ করতো এবং তাদের সাথে হাসি তামাশা ও মজা করতো। তারা দরবার অনুষ্ঠানে ব্যস্ত রানীর মতো, যাদেরকে আনন্দে রাখতে নিয়োজিত থাকে তরুণ সুদর্শন অভিজাত। তারা তাদের আসনে হেলান দিয়ে মুখে লাগিয়ে রাখতো হুক্কার রূপার নল। সামনে খোলা থাকতো পানের বাটা। তারা পানের খিলি বানিয়ে হাসিঠাট্টা করতে করতে তাদের ভক্তদের হাতে তুলে দিত।

আসন ছেড়ে যখন তারা উঠতো তখন লোকজন তাদের সৌন্দর্যে আল্লাহর প্রশংসা করতো। তারা হাঁটলে তাদের পায়ের সামনে ভক্তরা বিছিয়ে দিতো প্রশংসার গালিচা। কিন্তু এইসব বাঈজিরা তাদের মাথা তুলতো মেঘের মধ্যে এবং তাদের ভক্তদের সাথে ক্রীতদাসের মতো আচরণ করতো। বেহেশতের পতন হতে পারে, কিন্তু তাদের কথাবার্তাকে হীন বিবেচনা করা চলে না। তারা কোন কিছুর চাহিদা কখনো উল্লেখ করতো না, কারণ তাদের পুরুষরা তাদেরকে সব কিছুই সরবরাহ করতো কোন কিছু না চাইতেই এবং তাদের জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে পিছপা হতো না। এইসব বাঈজিরা ছিল দেবীর মতো, যাদের বেদীতে পূজারীরা উৎসর্গের নৈবেদ্য নিয়ে আসতো। এবং দেবীদের মতোই তারা সবকিছুকে হেলাফেলায় বিবেচনায় করতো। মানুষের জীবনের কোন গুরুত্বই ছিল না তাদের কাছে। এতোই অহংকারী ছিল তারা যে, সাত মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্য উপহার দিলেও তারা অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করতো। অসম্ভব সব খেয়ালখুশী মাথায় চাপতো তাদের। তবুও কিছু কিছু লোক ছিল যারা তাদের সন্তুষ্ট করতে তৈরি থাকতো। তারা এক পাশে একজনকে কাঁদাতো, আরেক পাশে অন্য একজন হাসতো। তারা একজনের হৃদয় ধরে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিতো, আরেকজনের হৃদয়কে পদদলিত করতো। সামান্য অজুহাতে তারা বিবাদ বাঁধতো। তাদের ভক্তরা চেষ্টা করতো তাকে শান্ত করতে। অনেকে দু'হাত যুক্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করতো, কেউ আবেগে বিগলিত বক্তব্য দিয়ে তাদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করতো। তারা সব কিছু মানিয়ে চলতে রাজী হতো, কিন্তু তা নিজেদের শর্ত অনুসারে। তারা আনুকূল্য লাভের জন্যে শপথ উচ্চারণ করতো, কিন্তু পরে শপথের সবই ভুলে যেত। সকলের চোখ নিবদ্ধ থাকতো তাদের ওপর, কিন্তু তারা কারো দিকে তাকিয়েও দেখতো না। যেদিকে তারা তাকাতো সেদিকে সবার চোখ পড়তো। কোন নির্দিষ্ট লোকের ওপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে হাজারটা চোখ সেই লোকের ওপর পড়তো। তাদের নিয়ে পুরুষরা হয়ে উঠতো ঈর্ষাপরায়ণ, আর তারা একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতো। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস হলো কোনকিছুতেই তাদের অনুভূতির স্পর্শ থাকতো না, কারণ সকল পুরুষকে তারা মূল্যহীন, অর্থব বিবেচনা করতো। তাদের ভালোবাসা ছিল লোক দেখানোর জন্যে। কোন হতভাগ্য যদি তাদের ছলনায় জালে ধরা পড়তো তাহলে তারা প্রেমে পড়ার ভান দেখাতো :

আমার ধারণা তার এ দিনগুলো আমারই জন্যে
এর শেষ হবে আমার মৃত্যুতে অথবা
আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরিসমাপ্তিতে।

www.pathagar.com

একজন বাঈজি এবং ভালোবাসা? এক্ষেত্রে প্রেমিক সবসময় অসহায় এবং তার অসহায়ত্বের মধ্যেই বাঈজি তার মনের শান্তি খুঁজে পেত। ভাগ্য বিড়ম্বিত সেই লোকগুলোর বাড়িতে বিলাপ ও পরিতাপের সুর উঠতো, আর বাঈজির কামরায় হাসির ফুলঝুড়ি ছড়াতো যখন সে তার প্রেমিকদের বিনোদনে লিপ্ত থাকতো।

মির্জা রুসওয়া, আপনি এ বিষয়গুলোকে আমার চাইতে চমৎকারভাবে তুলে ধরতে পারবেন। আমি যখন এই নির্বাক অভিনয় প্রত্যক্ষ করেছি, তখন আমার মনের ওপর দিয়ে কি বয়ে গেছে আমি শুধু সেটুকুই বলতে পারি। একজন মহিলার ঈর্ষার কোন সীমা পরিসীমা থাকে না। এটা স্বীকার করতে যদিও আমার লজ্জা হচ্ছে, কিন্তু সত্য হচ্ছে, আমি চাইতাম যে, এই মেয়েগুলোর প্রেমিকরা আমাকে ভালোবাসুক ও আমার প্রশংসা করুক এবং শুধু আমার জন্যে তারা তাদের জীবন বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করুক। ওরা অন্য কোন মহিলার দিকে ফিরে দেখুক তা চাইতাম না আমি। কিন্তু হায়! কেউ আমার কোন পরোয়া করেনি।

হোসাইনী খালার সাথে যে কামরায় থাকতাম আমি সেখানে নির্বাসিত ছিলাম। কামরার দরজা, দেয়াল ও ছাদ ঝুলকালিতে মাখামাখি ছিল। এক কোণায় নড়বড়ে একটি চারপায়ার ওপর হোসাইনী খালা ও আমি রাতে ঘুমাতাম। আরেক কোণায় একটি চুলা, পাশে পানির দু'টি কলসী, রান্না করার সামান্য হাঁড়িপাতিল। থালাবাসন সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতো। তৃতীয় কোন আটা রাখার বড় একটি পাত্র, যার ওপর সার করে রাখা বিভিন্ন ডাল, লবণ ও মসল্লার ছোট ছোট মাটির বয়েম। তার পাশে রাখা লাকড়ি, মশলা পেষার শিলপাটা। সংক্ষেপে বলা যায়, বাড়ির যাবতীয় বর্জ্য এই ছোট্ট কামরায় জড়ো করা হয়েছিল। চুলার ঠিক ওপরেই দেয়ালে দু'টি পেরেক গাঁথা ছিল প্রদীপ রাখার জন্যে। রান্না শেষ হলে প্রদীপটি আমার বিছানার পাশে তৈলাক্ত আধারে রেখে দেয়া হতো। এর পাতলা সূতার সলতে মৃদু আলো ও প্রচুর ধোঁয়া ছড়াতো। সলতেটা আমি শতবার উসকে দিলেও সেটি উজ্জ্বল আলো ছড়াতে অস্বীকার করতো। এই কৃষ্ণ গহবরের আসবাব বলতে ছিল দু'টি পুরনো ঝুড়ি, যা ছাদ থেকে ঝুলানো ছিল। এর একটিতে ছিল পিঁয়াজ এবং অন্যটিতে থাকতো ওস্তাদের জন্যে তরকারি, ডাল ও চাপাতি। এটি আমার মাথার ঠিক ওপরে ঝুলতো এং সারাক্ষণ আমার মনে হতো যে খাবার আমার বুকের ওপর রাখা হয়েছে। কখনো বেখেয়ালে বিছানার ওপর দাঁড়ালে তাহলে তরকারি শুদ্ধ ঝুড়িটি আমার মাথায় লাগতো।

ভোর থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ওস্তাদের ডান্ডা এবং সন্ধ্যা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত গানের ওস্তাদের বকুনি ও প্রহারের জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ রকম স্নেহ ও ভালোবাসাই পেয়েছি আমি। এসবের মাঝে আমি কৈশোরে উন্নীত হলাম এবং কিশোরী সুলভ আমোদ প্রমোদে জড়িয়ে পড়তে শুরু করলাম। আমার বয়স যখন চৌদ্দ বছর তখন আয়নায় নিজেকে দেখতে শিখলাম। হোসাইনী খালা কামরা থেকে বের হয়ে যাওয়া মাত্র আমি

www.pathagar.com

আয়না বের করে আমার মুখ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মনোযোগ দিয়ে দেখতাম এবং অন্য মেয়েদের চেহারার সাথে তুলনা করতাম। আমার মুখে কোন দাগ ছিল না, অতএব অন্য মেয়েদের চাইতে নিজেকে সুন্দরী ভাবতে লাগলাম। এটা তো আপনি জানেন, রুসওয়া। সত্যি বলছি না আমি?"

"তুমি অবশ্যই অন্যদের চাইতে ফর্সা ছিলে এবং এখনো তুমি অন্য মহিলাদের চেয়ে সুন্দরী। ওই দিনগুলোতে তোমার যৌবনের ফুটন্ত দিন ছিল।"

"আমি আপনাকে কুর্ণিশ করতে চাই, রুসওয়া। কিন্তু এখন প্রশংসা করার সময় বা স্থান কোনটাই নয়। আমি যা বলছিলাম, তা হলো, ওই সময়ে আমি ভাবতাম যে, আমি সুন্দরী এবং আমার চেহারা নিয়ে অতি প্রসন্ন ছিলাম আমি। সবসময় নিজেকে বলতাম, "আমার ত্রুটি কোথায় যে, কেউ আমার দিকে মনোযোগ পর্যন্ত দেয় না?"

"আমি বিশ্বাস করি না যে, কেউ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। মানুষ নিশ্চয়ই তোমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। কিন্তু যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে কুমারীত্ব ঘুচানোর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তুমি এ পেশায় আসোনি, সেজন্যে তারা তোমার সাথে কথা বলতে ভয় পেতো যে খানুম তাদেরকে কিছু বলতে বা করতে পারে।"

"আপনার কথা হয়তো ঠিক, কিন্তু ওই বয়সে আমি কি করে জানবো! আমি আমার সঙ্গীদের দেখে ঈর্ষান্বিত হতাম এবং তিরিক্ষি মেজাজে বিড়বিড় করে নিজেকেই গালি দিতাম। আমি কিছু খেতে, পান করতে বা ঘুমাতে পর্যন্ত পারতাম না। যখন নিজের চুল আঁচড়াতাম ও বেণী বাঁধতাম তখন মেজাজ খারাপ হতো বেশি। যখন দেখতাম নওয়াব চব্বন নিজ হাতে বিসমিল্লাহ জানের বেণী গেঁথে দিচ্ছে তখন ঈর্ষার সাপ আমার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতো। আর আমার চুল বেঁধে দিত হোসাইনী খালা। তাও সে যদি কোন কাজে ব্যস্ত না থাকতো। তা না হলে সারাদিন ধরে চুল এলোমেলো ছড়িয়ে থাকতো আমার মুখের ওপর। অন্য মেয়েরা দিনে তিনবার তাদের পোশাক পাল্টাতো। আমার অতিরিক্ত মাত্র এক সেট পোশাক ছিল, যা সপ্তাহে মাত্র একবার পাল্টাতাম। অন্য মেয়েদের জামায় সোনালি সূচিকর্ম ছিল, আর আমারটা সাদামাটা সূচিকর্ম বিহীন। ডোরাকাটা রেশমী পাজামা, সাধারণ সূতির ওড়না-কখনো হালকা রূপালি পাড় লাগানো হতো সুন্দর দেখাতে। যখনই কাপড় পাল্টে অন্য মেয়েদের কামরায় যেতাম, সেখানে তাদের পুরুষ বন্ধুরা উপস্থিত থাকতো এবং মেয়েগুলো আমাকে অজুহাতে কামরা থেকে বের করে দিত। নিজেদের পরিতৃপ্তিতে আপ্লুত ছিল তারা। তাদের সাথে আমার অবস্থান পছন্দ না করার আরেকটি কারণ ছিল। আমি পুরুষদের সাথে প্রেমের অভিনয় শুরু করেছিলাম এবং মাঝে মাঝে তাদের ওপর আমার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতাম। এছাড়া আমি একটু ধৃষ্টও ছিলাম। আমি তাদেরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতাম, ভেংচি কাটতাম এবং চিমটিও দিতাম।"

www.pathagar.com

"মির্জা রুসওয়া, আমার হতাশার এই পরিস্থিতিতে গওহর মির্জা আমার জন্যে যে আল্লাহ প্রেরিত আশির্বাদের মতো ছিল, তা আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন। সে আমাকে প্রেমের কথা বলতো। আমি তাকে উত্যক্ত করতাম, সেও আমাকে পাল্টা জ্বালাতন করতো। আমি বিশ্বাস করতাম যে, সে আমার প্রেমে পড়েছে এবং সে তখন আমার সাথে তেমন কোন ভাবভঙ্গিই প্রকাশ করেনি। সে পাঠশালায় যখন আসতো তখন আমার জন্যে ছোটখাট উপহার আনতো। কখনো পকেট থেকে কয়েকটি কমলা বের করে আমার হাতে দিতো। কখনো আমার জন্যে হালুয়া আনতো। একদিন সে আমাকে একটি চকচকে রূপার টাকা দেয়। কিন্তু আমি হাজার হাজার টাকা আয় ও ব্যয় করেছি এ জীবনে, কিন্তু ওই একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়ার আনন্দ কখনো ভুলতে পারিনি। দীর্ঘদিন আমি সেটি গচ্ছিত রেখেছিলাম। আমি সেটি তখন ব্যয় করতে পারিনি, কারণ তাহলে আমাকে জবাবদিহি করতে হতো যে, আমি কোথায় পেয়েছি। চৌদ্দ বছর বয়সেও আমাকে নিজের কাছেই জিনিস রাখতে হয়েছে। বড় হওয়ার সাথে সাথে একজনের মধ্যে এ চেতনা জাগে। আমি জানতাম যে আমি বড় হচ্ছি।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

এক কুশলী চোর আমার হৃদয় চুরি করলো
নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিল হতভাগা প্রহরীরা।

তখন ছিল বর্ষাকাল। কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকানোর পর বজ্রপাত হচ্ছিল প্রচন্ড শব্দে। অঝোর ধারায় ঝরছিল বৃষ্টি। হোসাইনী খালা ছোট্ট কামরায় আমি একা শুয়ে ছিলাম। বাতির সলতে কয়েকবার কেঁপে উঠে নিভে গেল। এতো অন্ধকার যে এক হাত আরেক হাতকে দেখতে পাচ্ছিল না।

অন্য কামরাগুলোতে আনন্দ উচ্ছাস। আমি গান ও হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত মনে হচ্ছিল। যাতনাক্লিষ্ট হৃদয়ই শুধু সেই যাতনার মাত্রা সম্পর্কে জানে। বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে আমি চাদরের নিচে গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকতাম। বজ্রধ্বনি শুনলে দু'কানে আঙ্গুল দিতাম। এক সময় ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

হঠাৎ অনুভব করলাম কেউ আমার হাত ধরেছে, আর আমি ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো হয়ে গেছি। একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারছিলাম না। একটু পরই জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম আমি।

পরদিন সকালে সবাই সব জায়গায় চোরকে খুঁজলো। অনায়াসে সে সটকে পড়েছে। খানুমের মুখ ভারী। হোসাইনী খালা আপন মনে গজরাচ্ছে। তারা পালা করে আমাকে জেরা করলো। আমার কোন কিছুই বলার ছিল না।

"ব্যাপারটা যদি তোমার জানাও থাকতো তবুও কাউকে বলা উচিত ছিল না।"

"কটাক্ষ করবেন না। যখন খানুমের হতাশা ও হোসাইনী খালার ম্লান মুখ মনে পড়ে তখন অত্যন্ত অসহায় বোধ করি। হাসিও আসে।"

"তুমি হাসতো পারো, কারণ এটা তোমার জন্যে ছোট্ট একটা মজার ঘটনা ছিল। কিন্তু তাদের আশা ভরসা মাটিতে মিশে গিয়েছিল।"

"খানুমকে আপনি জানেন না। উনি তার নিজস্ব জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঘটনাটি সম্পর্কে সকল গুজবকে বাতিল করে দিয়ে তিনি বিত্তবান কোন বাঁদুরের মতো অন্ধ লোককে খুঁজতে লাগলেন এবং অবশেষে একজনকে তার ফাঁদে আটকাতে সফল হলেন।

www.pathagar.com

লোকটির নাম রশীদ আলী। তার মরহুম পিতা অযোধ্যা থেকে দূরবর্তী কোন শহরে থাকতো এবং নিজের দায়িত্ব পালনকালে ঘুষ ও উপঢৌকন হিসেবে প্রচুর সম্পদ রেখে গিয়েছিল। এই সম্পদ থেকে লোকটি একটি জমিদারী কিনে তার পুত্রের নামে দিয়ে যায়। রশীদ আলী লক্ষ্মৌতে আসে শিক্ষা লাভের জন্যে। কিছুদিন লক্ষ্মৌর দীর্ঘ সরু গলির কোথাও অবস্থান করে সে পড়াশুনা করে। এরপর শহরের পরিবেশের একটা প্রভাব পড়ে তার ওপর। এই পথগুলোতে পা দেয় সে এবং শিগগিরই অতি পরিচিত বেশ্যা গমণকারী ও লম্পটে পরিণত হয়।

রশীদ আলী বেশ ক'টি নামে পরিচিত ছিল। কাব্যিক নাম হিসেবে সে যোগ করেছিল 'রশীদ' অর্থাৎ যে পথের সন্ধান জানে, যা লক্ষ্মৌর এক সুপরিচিত কবি বদল করে তার নামের সাথে যুক্ত করে 'মুরশিদ' অর্থাৎ যে পথের দিশা দেয়। নতুন পদবী নিয়ে তরুণ রশীদ খুব অহংকার বোধ করতো। কিন্তু তার গ্রাম থেকে যেসব ভৃত্য তার সাথে এসেছিল তারা তাকে বরাবরের মতো রাখখান মিয়া বলেই ডাকতো। লক্ষ্মৌর সাধারণ লোকজন তার খেতাব দিয়েছিল রাজা। যেহেতু রশীদ আলী 'রশীদ' ওরফে রশীদ আলী 'মুরশিদ' ওরফে রাজা রাখখান মিয়ার জন্যে লক্ষ্মৌর লোকজন এতো কিছু করেছে। অতএব তারও কিছু করার ছিল। সে নিজে খেতাব গ্রহণ করলো 'নওয়াব' এবং নিজের পরিচয় দিতো নওয়াব রশীদ আলী। সে যখন প্রথম তার গ্রাম থেকে আসে তখন তার থুতনিতে বেশ দাঁড়ি ছিল। লক্ষ্মৌর বাতাসে দম নেয়ার সাথে তার দাঁড়ি কমতে শুরু করলো। প্রথমে সে দাঁড়ির প্রান্তভাগ ছাঁটতো। এরপর বেশ পরিপাটি করে দাঁড়ি ছাটা শুরু করলো এবং শেষ পর্যন্ত দাঁড়ি কামিয়ে ফেললো। দাঁড়ি বিদায় নেয়ার সাথে সাথে তার ছোট্ট মুখ মন্ডলের সবই বিকশিত হলো। লোকটি কালো, মুখভর্তি বসন্তের দাগ। নাক চ্যাপ্টা, চোখ ছোট, গলা খাটো এবং গাল ভাঙ্গা। আকৃতিতেও সে ছোট। তবুও সে নিজেকে ভাবতো ইউসুফের মতো সুদর্শন। আয়নার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বসে গোঁফে তা দিতো যতোক্ষণ পর্যন্ত না দুই প্রান্ত ইঁদুরের লেজের মতো হয়ে না উঠতো। দীর্ঘ চুল রাখতো সে এবং প্রান্তভাগ ছিল কোঁকড়ানো। ছোট সুচোলো টুপি পরতো মাথায়। বোতামহীন কোট এবং ঢোলা পাজামা পরতো। এভাবেই সে হাজির মতো শহরের বারবনিতাদের কোঠায়।

রশীদ আলী ওরফে রাখখান মিয়া দূরদর্শী তরুণ ছিল। খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সাথে যোগসূত্রের কারণে সে লক্ষ্মৌর সবচেয়ে কাংখিত বাঈজিদের কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতাও অর্জন করেছিল। তার পরিচিতি ও ভালোবাসা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে সে অশ্লীল বিশেষণ বিনিময় করতো এবং কৌতুকপূর্ণ অভিনয়ে লিপ্ত হতো।

বাঈজিদের সাথে পরিচিতি সত্ত্বেও সে তাদের মনিবাণীদের সাথে বিশেষভাবে সৌজন্যে পরায়ণ ছিল। কোন মেয়ের সাথে যদি কোন সন্ধ্যা অতিবাহিত করতো তাহলে সে প্রকাশ্যে তার মনিবাণীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। এভাবে শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

প্রদর্শনের আরেকটি কারণ ছিল তার বন্ধুদের কাছে অহংকারের সাথে ব্যক্ত করা যে সে ওই মহিলার মেয়েদের সাথে মিলিত হয়েছে। অর্থাৎ তার টুপিতে আরেকটি পালক যোগ করেছে।

খানুমের সাথে সে ছিল ধৈর্যশীল। সন্ধ্যার সূচনা থেকে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সে খানুমের মহলে অবস্থান করতো। সেখানে প্রতিটি মেয়েই তার পরিচিত ছিল। তার সঙ্গীতের জ্ঞান আছে বলে অহংকার করতো। সে গান শিখতো, গানে সুর দিতো এবং বেসুরো গলায় গাইতো। তবলার বোলের সাথে মুখ দিয়ে অনুরূপ শব্দ তুলতো। বন্ধুরা তাকে নিয়ে হাসি মশকরা করতো। তার কবিতার আকাশ স্পর্শী প্রশংসা করতো এবং মুশায়রায় উপস্থিত হয়ে তার কবিতা আবৃতি করার পরামর্শ দিতো। তারা এমনভাবে মুশায়রায় তার পালা স্থির করতো যে ব্যঙ্গ কবিতা রচয়িতাদের ঠিক আগে থাকতো তার স্থান। শ্রোতারা তার কবিতা শুনে হাসিতে গড়িয়ে পড়তো। সে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত বোধ করে মাথা অবনত করে তাদের শুভেচ্ছা স্বীকার করতো।

রশীদ আলীর বেচারি মা'র বিশ্বাস ছিল যে তার পুত্র একজন মৌলভী হওয়ার জন্যে পড়াশুনা করছে এবং কোন প্রশ্ন না করে তার চাহিদা অনুসারে অর্থ প্রেরণ করতো। তার তোষামুদকারী প্রমোদপ্রিয় লক্ষ্ণৌবাসী, যাদের দুনিয়ার ব্যাপারে কোন পরোয়া ছিল না, তারাই পরিণত হলো তার ঘনিষ্ঠ সহচরে। তারাই আমার দিকে তার মনোযোগ ঘুরিয়েছিল। বীজ বপন করা হলো। তা পরিণত হলো আকাংখায়। আকাংখা রূপ নিলো ভালোবাসায়, আর ভালোবাসা প্রচন্ড আবেগ হয়ে দেখা দিলো। খানুম তা অনিচ্ছার ভান করলেন, "না জনাব, তা হয় না। সে এখনো ছোট্ট বালিকা।" আমি রশীদ আলীর কাতর মিনতি, অশ্রুপূর্ণ নিবেদন এবং চরম ক্ষোভের কথা এখনো স্মরণ করতে পারি। এরপর এক পীরের কাছ থেকে সে একটি তাবিজ নিয়ে আসে। তাছাড়া তার সঙ্গীদের কঠোর অধ্যাবসায়পূর্ণ প্রচেষ্টায় ফল হয়। পাঁচ হাজার টাকায় একটি রফা হয়। সে বাড়ি যায় এবং তার মাকে না জানিয়ে তার জোতদারীর দু'টি গ্রাম বন্ধক রেখে প্রায় বিশ হাজার টাকা নিয়ে লক্ষ্ণৌ ফিরে আসে। পাঁচ হাজার টাকা সে খানুমকে দেয়। হোসাইনী খালা তার ভাগ দাবি করে এবং দান হিসেবে পাঁচশ' টাকা গ্রহণ করে। এরপর আমাকে তুলে দেয়া হয় রশীদ আলী ওরফে রাখখান মিয়ার কাছে। সে ছ'মাস লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করে এবং আমার সেবার জন্যে প্রতি মাসে খানুমকে একশ' টাকা করে দেয়। আমাকেও সে একান্তে কিছু কিছু অর্থ দিয়েছে, যা আমি খানুমকে না বলে হোসাইনী খালার কাছে জমা রেখেছি।

শেষ পর্যন্ত আমি নিজের একটি অবস্থান পেলাম। প্রবেশ পথের পাশের কামরাটি আমার জন্যে সাজানো হলো। আমাকেও দু'জন পরিচারিকা ও দু'জন ভৃত্য দেয়া হলো আমার নির্দেশে কাজ করার জন্যে। শহরের ভদ্রলোকেরা আমার কাছে আসতে লাগলো।

গওহর মির্জা, যে প্রথমে আমার ফুল আহরণ করেছিল, সে আমার কাছে আসা অব্যাহত রেখেছিল। হোসাইনী খালা ও খানুম তাকে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করতো। কিন্তু

www.pathagar.com

আমি তাকে ভালোবাসতাম। অতএব, আমার কাছে তার আগমণে কেউ বাঁধা দিতে পারেনি। এরপর তার বাবার মৃত্যু হলে তার ভাতা বন্ধ হয়ে গেল। তার মা'র বয়স হয়ে যাওয়ায় খদ্দেরদের আর আকৃষ্ট করতে পারছিল না। ফলে গওহর মির্জা আমার দায়িত্বে ও তত্ত্বাবধানে ছিল।

বাঈজিদের মধ্যে একটা রীতি চালু ছিল একজন পুরুষ মানুষ রাখার। এ ধরণের একজন লোক খুবই উপকারী। তাদের কাছে কেউ না এলে সময় কাটানোর জন্যে এরা থাকে। কেনাকাটার জন্যে তাদের ওপর নির্ভর করা যায়। কারণ ভৃত্যেরা কিছু কিনতে গেলেই তা থেকে টাকা মেরে দেয়। আর এই লোকগুলো বাজারের সবচেয়ে ভালো জিনিস খুঁজে আনে দর কষাকষি করে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তারা সেবা যত্ন করে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে কারো অবস্থা বর্ণনা করে তার পরামর্শ নেয়, ওষুধ আনে এবং সারারাত পা ডলে দেয়। এসব সেবা ছাড়াও তারা তাদের বন্ধু ও পরিচিতজনের কাছে তাদের পৃষ্ঠপোষক বাঈজির প্রশংসা করে খদ্দের আনে এবং দর স্থির করে। কোন বিয়ের অনুষ্ঠানে নাচ গান করার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং দর্শক শ্রোতারা অবসন্ন হয়ে পড়লে তাদেরকে চাঙ্গা করে তুলতে মনোযোগী হয়। গানের তালে তালে হাততালি বা হাত নাড়ায় এবং প্রতিটি পর্বের শেষে প্রশংসাসূচক 'আহ্' এবং 'ওয়াহ! ওয়াহ!' ধ্বনি তোলে। কেউ যখন গান গায় তখন তারা সেই বাঈজির প্রতিটি ভঙ্গিমার ব্যাখ্যা করে। খাবার অনুষ্ঠানে তারা নিশ্চিত করে যে তার বাঈজি যাতে সর্বোত্তম খাবার পায়। কোন বাঈজি যখন ধনবান কোন পৃষ্ঠপোষককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়, তখন এই লোকগুলো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি করার উপাদান ছড়ায়। পৃষ্ঠপোষক চায় বাঈজি তার প্রেমে পড়ুক, আর বাঈজি প্রণয়ের ভান করে আনুগত্যের কসম কাটে তার লোকের কাছে। সে বলে, "জনাব, আমি তো তার কাছে বাঁধা পড়েছি। আমি আর তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি, কারণ এখন তার আসার সময় হয়েছে। তাকে তো রাখতে হবে। তুমি তো এতোটা একগুঁয়ে হতে পারো না।"

যারা নিয়মিত বেশ্যালয়ে আসে তারা বেশ্যাদের রাখা লোকগুলোকে কোনভাবেই বিরক্ত করে না। কারণ, তারা জানে যে, শহরের সকল বাজে লোক ও খুনী এদের পরিচিত এবং প্রয়োজনে তারা মুহূর্তের মধ্যে লোক জড়ো করে ফেলতে পারে। এমনকি বাঈজিদের যারা মনিবাণী, তারাও এদেরকে ভয় করে চলে। কারণ তারা জানে যে মেয়েগুলো এদের ভালোবাসে এবং এদের সাথে পালিয়েও যেতে পারে। জনৈক কাজিম আলীর সাথে আমির জানের সম্পর্ক ছিল এবং বহু বছর পর্যন্ত তাকে অর্থ দিয়ে এসেছে। একবার সে তাকে তার পাঁচশ টাকা দামের সোনার বালা দিয়ে দেয় এবং ভাব দেখায় যে এগুলো চুরি হয়েছে। আরেকবার এগারশত টাকা মূল্যের মুক্তার কানফুল দিয়ে দেয় এবং প্রচার করে যে আইশ বাগের মেলায় কান থেকে খুলে পড়ে গেছে। এভাবে সে তাকে প্রচুর অর্থকড়ি দেয়। কাজিম আলীর পুরো পরিবার চলতো আমির জানের অর্থে।

www.pathagar.com

খুরশিদ জানের প্রেম ছিল পিয়ারে সাহেবের সাথে। বিসমিল্লাহ জান কাউকে ভালোবাসেনি। সে এতোটাই নিচ প্রকৃতির ছিল যে কাউকে ভালোবাসাটুকু পর্যন্ত দিতে চায়নি। এমনকি খানুম, যার বয়স মাঝ পঞ্চাশ, তারও এক প্রেমিক ছিল মীর আওলাদ আলী। তার বয়স বড় জোর উনিশ বছর। সুদর্শন ও সুগঠিত দেহের এই তরুণের প্রতি সুন্দরী মহিলারা কামনার দৃষ্টি ফেলতো। কিন্তু খানুমের ভয়ে কেউ তার সাথে কথা বলার সাহসও করতো না। সে ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, রাতের খাবার কোত্থেকে জুটবে তাও জানতো না। তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব ছিল খানুমের। খানুম মীর আওলাদের বিয়ের আয়োজন করে এবং বিয়েতে পনেরশ' টাকা খরচও করে। কিন্তু শুধুমাত্র বিয়ের রাতটুকু ছাড়া খানুম তাকে তার স্ত্রীর সাথে আর একটি রাতও কাটাতে দেয়নি। সবসময় সে খানুমের বাড়িতে থাকতো এবং দিনে ঘন্টাখানিকের জন্যে বাড়ি যেতো।

আরেকজন প্রেমিক ছিল খানুমের। বৃদ্ধ মির্জা সাহেব, যিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিলেন। খাদ্য চিবোনোর মতো দাঁত এবং সেই খাদ্য হজম করার মতো পেটের অবস্থাও ছিল না তার। যদিও তার সাথে খানুমের করার মতো কিছুই ছিল না, কিন্তু তিনি তাকে তার ছাদের নিচে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন বাড়ির একজন সদস্যের মতোই। খানুম তার সাথে বসে খেতেন, তার জামা তৈরি করে দিতেন এবং তার প্রতিদিনের আফিম ও মিছরির জন্যেও টাকা দিতেন।

একদিন আমরা খানুমের সাথে বসে ছিলাম। খুরশিদ জান মন খারাপ করে আছে, কারণ তার প্রেমিক পিয়ারে সাহেব বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এ ধরণের ঘটনায় খানুমের কোন সহানুভূতি ছিল না, তিনি চড়া গলায় বললেন, "তোমরা অত্যন্ত অনুপযুক্ত মেয়ে। আমি বুঝতে পারিনা যে, তোমাদের প্রেম কেমন। তোমাদের নাগররা তোমাদের যা করছে তারই উপযুক্ত তোমরা।" বৃদ্ধ মির্জা সাহেবকে দেখিয়ে তিনি বলেন, "এই যে লোকটিকে দেখছো, উনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন, যখন উনি নিতান্তই বালক। তার বাবা মা তার বিয়ের আয়োজন করে এবং উনি আমাকে তার জামাকাপড় দেখাতে আনেন যে কোন্‌টি পরে বিয়ে করবেন। জামাগুলো ছিড়ে আমি টুকরা টুকরা করে ফেলি। তার হাত জড়িয়ে ধরে তাকে যেতে দিতে অস্বীকার করি। এটি চল্লিশ বছর আগের ঘটনা। আজ পর্যন্ত তিনি আর বাড়ি ফিরে যাননি।" তিনি থামলেন তার কথাগুলোর প্রভাব পড়তে দেয়ার জন্যে। এরপর প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মতো একজনকে খুঁজে পেয়েছো?"

আমরা আমাদের মাথা নত করলাম।

আমার প্রথম পেশাদারী আমন্ত্রণ ছিল নওয়াব শুজা'ত আলী খানের পুত্রের বিয়ের অনুষ্ঠানে। অত্যন্ত স্মরণীয় একটি উৎসব ছিল সেটি। নওয়াবের গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল। অলংকৃত কাঁচের বাতি ও ঝাড়বাতি দিয়ে এতো সুন্দরভাবে প্রাসাদটি আলোকিত করা হয়েছিল যে, রাত পরিণত হয়েছিল দিনের

www.pathagar.com

উজ্জ্বলতায়। ঢোলের আকৃতি বিশিষ্ট কাঁচের রঙিন আবরণী সারিবদ্ধভাবে রাখা ছিল যার মাঝখানে ছিল একটি করে মোমবাতি। পারস্যের গালিচা এবং যার ওপর ধবধবে সাদা চাদর বিছানো হয়েছিল মেহমানদের বসার জন্যে এবং সাথে ছিল ঝালরওয়ালা তাকিয়া, যাতে মেহমানরা ঠেস দিয়ে বসতে পারে। ফুল ও সুগন্ধির মিষ্টি পরিবেশে ছড়িয়ে ছিল। হুক্কা থেকে বাতাসে মিশে যাচ্ছিল সুবাসিত ধোঁয়া এবং সুগন্ধি পানের মাদকতা মেহমানদের মাথায় প্রবেশ করছিল।

বরোদা থেকে একজন বিখ্যাত গায়িকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল গান গাওয়ার জন্যে। তিনি জানতেন যে উপস্থিত সকলেই সঙ্গীতের তত্ত্ব জানে এবং তার খ্যাতির কথাও বিখ্যাত শিল্পীরা অবহিত। তার কণ্ঠও যথেষ্ট দরাজ, যা বেশ দূর থেকেও শোনা সম্ভব ছিল। কিন্তু খানুমের সুক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির জন্যে অবশ্যই তাকে পূর্ণ নম্বর দিতে হবে। তিনি আমাকে বললেন গুণী শিল্পীর গানের পরপরই গান গাইতে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না, কিন্তু তার ধৃষ্টতা দেখে উপস্থিত সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হলেন। কি করে আমার মতো মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সের একটি মেয়ে এতো খ্যাতিমান একজন গায়িকার গানের পর তার গান পরিবেশন করতে পারে?

আমি দ্রুত তালের একটি নাচ দিয়ে শুরু করলাম। কৈশোরের উদ্দাম সজীবতা আমার মধ্যে। অতএব, উপস্থিত দর্শকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলাম। আমার চেহারা হয়তো তেমন ভালো ছিল না, কিন্তু প্রাণবন্ত, উচ্ছল ও দুর্বিনীত।

"আমার যৌবনের দিনগুলো নিয়ে কথা বলো না
ওই দিনগুলো ছিল অপূর্ব-এ ছাড়া আর কি বলতে পারি।"

আমি অল্পক্ষণ নেচে ছিলাম, এর মধ্যেই খানুম আমাকে বললেন একটি গজল গাইতে।

"একটি দোলনায় কিভাবে সবাই দোলে
ভালোবাসার জন আজ আমাদের মাঝে।"

দর্শকদের মুগ্ধ করার জন্যে এ লাইন দু'টি যথেষ্ট ছিল। এরপর আমি পরের অংশ গাইলাম দেহ ভঙ্গিমার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে। দর্শক শ্রোতারা উল্লসিত হয়ে উঠলো :

"আমি অভিযোগ বন্ধ করলে সে তার জ্বালাতন শুরু করে
আমি যন্ত্রণামুক্ত হলে সে ক্ষুব্ধ হয়।"

এই লাইনগুলো উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে তারা আমার প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়ালো, যেন এটি বিচারের দিন :

"সে তার চোখ তুলে তাকায়, কিন্তু তার চোখ
আমার চোখের সাথে মিলিত হয় না
ওই দেখো, তার তীর আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।"

www.pathagar.com

এর পরের লাইনগুলো গাওয়ার সময় যার ওপরই আমি আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি এবং সে লোকটি আমার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি।

"নশ্বরের ভালোবাসায় আমি খ্যাতি অর্জন করেছি
তারা যখন আল্লাহর কথা বলে আমি তখন
লজ্জায় মাথা নত করেছি।"

রোমান্সের আবেশে থাকা লোকগুলোর ওপর এই কথাগুলোর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা আপনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন।

পরিপূর্ণতায় তোমার হৃদয়ের আকাংখা কেন হারিয়ে যায়?
সত্যিকার প্রেমে মৃত্যুর আশংকাও অসন্তুষ্ট করে না।

নিচের লাইনগুলো গেয়ে আমি আমার গান শেষ করলাম;

আমার হৃদয়ের গোপনীয়তা প্রকাশের কোন ইচ্ছা নেই আমার,
সে জানে আমি কি ভান করতে পারি, আর কি বলতে পারি?

দর্শক-শ্রোতা উচ্ছসিত। গানের প্রতিটি কথা প্রশংসিত হয়েছে এবং প্রতিটি তালের সাথে হাততালি পড়েছে। প্রতিটি লাইন বারবার উচ্চারণের জন্যে তারা বারবার অনুরোধ করছিল। এই গানের সাথে আমার পরিবেশনা শেষ হলেও পরবর্তী অনুষ্ঠানেও তারা আমাকে এটিই গাওয়ার জন্যে বলছিল।

"শ্রোতাদের কথা থাক, তোমার মনে থাকলে কবিতার অন্য লাইনগুলোও বলো। কে শিখেছিল এই কবিতা?

"আন্দাজ করার চেষ্টা করুন।"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"এই লাইনগুলো শুনুন :

"যারা খাঁটি প্রেমের জন্যে ব্যগ্র থাকে
তারা কবর পর্যন্ত প্রেমদ্বারাই পরিচালিত হয়।"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর।"

"সত্যিই কলম এক চমৎকার জিনিস সৃষ্টি করেছে।"

"আমি স্বয়ং আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস
যার তুলনা করা যায় আগুনের শিখার সাথে
নিঃশ্বাসের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো একটি শিখা।"

"এ ধরণের দর্শনের অর্থ শুধুমাত্র একজন কবির কাছেই অর্থবোধক হতে পারে।"

"আমার বিশ্বাস, দুঃখের পরই আসে আনন্দ,
আবার আনন্দের পর দুঃখ,
দুঃখ যখন বেড়ে যায় তখন আমি
আনন্দের সাথে আগামীকালের কথা ভাবি।"

www.pathagar.com

"এটিও শুধুমাত্র কবির ধারণার ব্যাপকতা।"

"তোমার সৌন্দর্য সম্পর্কে যদি তুমি জানো
তাহলে আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিও না,
তোমার মুখ আয়নার মতো, এর উজ্জ্বলতাই
শুধু বৃদ্ধি পায়।"

এটি রহস্যময় মনে হয়। আমরা এই পৃথিবীর, কিন্তু পৃথিবীকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই।

"বিচ্ছেদে আমরা বিলাপ বা অভিযোগ করি না,
হৃদয়হীন কেউ তোমার সাথে শুধু
হতাশার আচরণই করবে।"

"কবি তার কবিতার দ্বিতীয় অংশ লিখার সময় নিশ্চয়ই ব্যস্ততার মধ্যে ছিলেন।"

"কবিতা লিখার ক্ষেত্রে তিনি সবসময় তাড়াহুড়ার মধ্যেই থাকেন।"

পরদিন হোসাইনী খালা আমার কামরায় এক লোককে আনলেন। লোকটি সালাম দিয়ে বললো, "নওয়াব সুলতান আমাকে পাঠিয়েছেন। গত সন্ধ্যায় তিনি বরের ডান পাশে বসেছিলেন এবং সোনালী কাজ করা প্রান্তবিশিষ্ট পাগড়ি ছিল তার মাথায়। নওয়াব সুলতান আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী, যদি আপনি বিষয়টি গোপন রাখার নিশ্চয়তা দিতে পারেন। তাছাড়া আপনি যে গজলটি গেয়েছেন সেটির একটি কপিও চেয়েছেন তিনি।"

"নওয়াব সাহেবকে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন এবং তার সুবিধা অনুসারে যে কোন সন্ধ্যায় তাকে আসতে বলবেন," আমি তাকে বললাম। "তাকে গোপনীয়তার সাথে গ্রহণ করা হবে। গজলের জন্যে কাল যেকোন সময় আসতে পারেন। আমি আপনার জন্যে তা লিখে রাখবো।"

পরদিন সকালে যখন লোকটি এলো আমি কামরায় একা ছিলাম। আমি তাকে কবিতাটি দিলাম। লোকটি পাঁচটি সোনার মোহর বের করে দিল তার কোমর থেকে এবং বললো যে নওয়াব সুলতান বলেছেন যে, এই অংকটি আমার জন্যে তেমন কিছু না হলেও আমার পান খাওয়ার জন্যে গ্রহণ করলে তিনি সম্মানিত বোধ করবেন। সন্ধ্যায় বাতি জ্বালানোর পরই নওয়াব সাহেব আসবেন বলে লোকটি জানালো।

লোকটি চলে গেল। প্রথমে আমি হোসাইনী খালার কাছে সোনার মোহরগুলো দেয়ার কথা ভাবলাম, যাতে সে খানুমের কাছে জমা দেয়। এরপর চকচকে সোনার মোহরগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মন পরিবর্তন করে ফেললাম। টাকা পয়সা রাখার জন্যে আমার কোন বাক্স ছিল না। অতএব আমার বিছানার পায়ার নিচে রেখে দিলাম সেগুলো।

www.pathagar.com

প্রতিটি মহিলার জীবনেই এমন একটি সময় আসে যখন সে চায় কেউ তাকে ভালোবাসুক। এ অনুভূতি কখনো দূর হয় না। কৈশোরের সাথেই জন্ম নেয় এ অনুভূতি এবং সময় পেরুনোর সাথে সাথে তা আরো প্রবল হয়ে উঠে। একটি মহিলার বয়স যতো বৃদ্ধি পায় তার আকাংখাও ততো তীব্র হয়।

গওহর মির্জা অবশ্যই আমার প্রেমিক ছিল, কিন্তু তার প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের এবং আমার হৃদয় যা কামনা করতো তা সে দিতে পারেনি। তার মধ্যে পুরুষোচিত সাহস ও উচ্চ মানসিকতার ঘাটতি ছিল। মায়ের কাছ থেকে সে একজন গানেওয়ালীর বৈশিষ্ট অর্জন করেছিল। সে পেতে চাইতো এবং যা কিছু তার হাতে পড়তো, তাই সে আঁকড়ে ধরতো। যে একটি টাকার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, সেটি ছাড়া সে আমাকে কখনো কিছু দেয়নি। আমার হৃদয় এমন একজন লোককে চাইতো যে আমার সামান্য মর্জি ও পূরণ করার মতো ভালোবাসতে পারতো। আমার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে পারতো এবং আমার কাংখিত বিনোদন দিতে পারতো।

নওয়াব সুলতান অত্যন্ত সুদর্শন। তিনি এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিলেন যে কোন মহিলার যদি হাজারটা হৃদয় থাকতো তাহলে সবগুলো হৃদয় তাকে অর্পন করতো। কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, নারীরা শুধু প্রেমের শোভন আচরণ ও শুভেচ্ছার জন্যে প্রেমে পড়ে। কোন সন্দেহ নেই যে, তারা তোষামুদ পছন্দ করে এবং তাদেরকে যে ভালোবাসা হচ্ছে, একথা শুনতে তারা ভালোবাসে। যারা বলবে তাদেরকে হতে হবে উদার প্রকৃতির। যারা বাঈজির অলংকারের ওপর চোখ ফেলতে আসে এবং তাদের প্রতিটি আচার আচরণ ও প্রকাশভঙ্গিতে কপটতা মূর্ত হয়ে উঠে তারা ভালোবাসার প্রকৃত পাত্র নয়। একজন মহিলার যা কিছু আছে তারা তা পেতে চায় এবং তারা যখন সংশ্লিষ্ট বাঈজিকে তাদের সাথে বসবাস করতে বলে আসলে তখন তারা চায় একজন চাকরাণী ও বাবুর্চি যে তাদের পরিবারের রুটি তৈরি করবে, জুতা পালিশ করবে। সকল পুরুষ ইউসুফের মতো সুদর্শন নয় যে, মহিলারা দেখা মাত্র তাদের প্রেমে পড়বে এবং বিনিময়ে কিছুই আকাংখা করবে না। প্রেমের মাঝে সব সময় এক ধরনের স্বার্থপরতা কাজ করে, তা একজন পুরুষের প্রেম হোক অথবা কোন পুরুষের জন্যে কোন রমণীর প্রেম হোক। গল্প ও কাহিনীতেই কেবল লায়লা-মজনু অথবা শিরি-ফরহাদের মতো নিঃস্বার্থ প্রেমের সাক্ষাৎ মেলে। আমি অনেক প্রেমের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি, যেসবের কাংখিত বিনিময় পাইনি। অবশ্য আমি সেগুলোকে এক ধরণের মানসিক বৈকল্য হিসেবেই দেখতে পছন্দ করি।

পরদিন সন্ধ্যায় নওয়াব সুলতান আমাকে দর্শন দিয়ে ধন্য করলেন। হোসাইনী খালার সাথে লেনদেন স্থির করার পর আমাদেরকে নিজেদের মতো ছেড়ে যাওয়া হলো। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে তিনি আমাকে শুধু সেই সন্ধ্যার জন্য বা শুধু নিজের জন্যে চুক্তিবদ্ধ করেননি, বরং প্রতি সন্ধ্যায় এক বা দুই ঘন্টার জন্যে আমার সাথে অবস্থানের জন্যে ব্যবস্থা করে ছিলেন। নওয়াব সুলতান স্বল্পভাষী সহজ সরল মানুষ। হয়তো আঠার

www.pathagar.com

বছরের সামান্য বেশী বয়স হবে তার এবং নিশ্চয়ই কৃত্রিম আবহাওয়ায় রাখা গাছের মতো তাকে প্রতিপালন করা হয়েছে তার অভিভাবকের কঠোর দৃষ্টির সামনে যাতে তিনি পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন। তিনি তার প্রেমের ঘোষণা ব্যক্ত করে ফেলেছিলেন তার ভৃত্য বা সঙ্গীর মাধ্যমে, এ প্রেম অস্বীকৃত হলে কিছুটা সমস্যা হতে পারে। তাকে স্বাভাবিক সংযত করতে আমার দীর্ঘ সময় লাগেনি।

তার সাথে আমার প্রেমের অভিনয় শুরু হলো এবং তাকে বললাম যে আমি গভীরভাবে তাকে ভালোবাসি। কথাটা পুরোপুরি অসত্য ছিল না। তিনি যে কোন মহিলার জন্যে এতোই সুদর্শন ছিলেন যে, তা সে যতো কঠিন হৃদয়েরই হোক না কেন, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না। আল্লাহ তাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত অপূর্ব শৈলীতে গঠন করেছেন। তিনি দীর্ঘদেহী, মোটা কব্জি, পেশীবহুল বাহু সমৃদ্ধ শক্তিশালী গড়নের। তার কপাল প্রশস্ত, চুল কোঁকড়ানো। দামেশকের গোলাপের মতো উজ্জ্বল তার গায়ের রং, চোখ হরিণের চোখের মতো এবং নাক ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা, দাঁত যেন একসারি মুক্তা। তিনি সংস্কৃতিবান, মার্জিত, কিন্তু এসবের চর্চাহীন। তার প্রতিটি বাক্যে থাকে কবিতা, যথার্থ প্রেমের কবিতা এবং সেগুলো তার নিজেরই লিখা। কবিতার প্রসঙ্গ এলে কথা বলতে তিনি কখনোই কুণ্ঠিত বোধ করতেন না, কারণ তিনি একটি কবি পরিবারের সদস্য এবং মুশায়রায় তার পিতার সাথে কবিতা আবৃতি করতেন। কবিতা মানুষের সকল অবদমিত বিষয় প্রকাশ করে এবং মানুষ কোন ধরণের বিব্রত বোধ না করেই কামনাপূর্ণ প্রেমের কবিতা আবৃতি করে যায়। বয়স্ক লোকদের উপস্থিতিতে তরুণরা এবং তরুণদের সাহচর্যে বৃদ্ধরাও প্রেমের কবিতা আবৃত্তিতে কোন ধরণের কুণ্ঠাবোধ করে না। এবং কবিতার মাধ্যমে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয় তারা তা গদ্যে লিপিবদ্ধ করতে সাহস করে না।

আমরা মনোরম এক সন্ধ্যা কাটাচ্ছিলাম। নওয়াব সুলতান বলছিলেন যে, আমার যাদু তাকে এতোটাই মোহগ্রস্ত করেছে যে তার মনে আর কোন শান্তি নেই। আমি বললাম, "আপনি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। আমি মূল্যহীন এক সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নই। ফার্সি একটি প্রবাদ আছে ঃ ক্রীতদাস তার নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন। আমি জানি যে আমি কি।"

"আমার মনে হয় তুমি সুশিক্ষিত, বেশ পড়াশুনা করেছো।"

"নানা বিষয়ে ভাসাভাসা ধারণা আছে আমার।"

"তুমি কি লিখো?"

"সামান্য।"

আমাকে যে কবিতাটি পাঠিয়েছিলে সেটি কি তোমার নিজ হাতে লিখা?"

আমি হেসে উত্তর দিলাম।

www.pathagar.com

"আল্লাহর কসম, কি সুন্দর তোমার হাত! আমি উৎফুল্ল। কোন বার্তাবাহককে দিয়ে কারো হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করা যায় না। এখন থেকে আমাদের কলমই আমাদের জিহ্বা হিসেবে কাজ করবে। এ ধরণের বিষয়ে অন্যের ওপর নির্ভর করা আমাদের উচিত নয়;

অন্যের মাধ্যমে কোন খবর পাঠিও না
বন্ধুত্বের মাঝে কোন ঝুঁকি থাকা সঙ্গত নয়,
আমাদের গোপনীয়তার যে বিনিময়
তা তোমার আমার বাইরে যাওয়া উচিত নয়।"

"এটি কি আপনি লিখেছেন?"

"না, এই লাইনগুলো বলে গেছেন আমার মরহুম আব্বাজান।"

"কি সুন্দর কথাই না তিনি বলেছেন।"

"আল্লাহর কি মহিমা, যে তিনি তোমার মাঝে কবিতার স্বাদ সৃষ্টি করেছেন।"

আল্লাহ যখন কোন নারীকে একটি সুন্দর
মুখ উপহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন
তার উচিত তাতে কথা বলার সৌন্দর্য ও
লিখার ক্ষমতা যোগ করা।"

"এই লাইনগুলো কার?"

"এগুলোও আমার আব্বাজানের।"

"আবার বলতে হয়, কি চমৎকার বলেছেন তিনি।"

"এটা তার নিজস্ব ধাঁচ ছিল। কিন্তু মনে হয় এই কবিতাটি তিনি তোমার জন্যেই লিখে গেছেন।"

এতো উদার তোমার অনুরাগ
আমার মূল্যহীন সত্ত্বার প্রতিও তুমি দয়ালু

"আমার ধারণা কি সঠিক যে তুমি নিজেও কবিতা রচনা করেন?"

"না জনাব, মোটেও না। আপনার মতো ভদ্রলোকদের আমি বলি আমার জন্যে কবিতা লিখতে।"

নওয়াব সাহেবের ভ্রুর ওপর মুহূর্তের জন্যে যেন একটি ছায়া অতিক্রম করলো। এরপর আমাকে হাসতে দেখে তিনিও জোরে হেসে ফেললো। "তুমি ভালো কথা বলেছো," তিনি বললেন। "আমার বিশ্বাস বাঈজিদের মধ্যে এটি প্রচলিত আছে যে, তাদের পৃষ্ঠপোষকের কবিতাকে নিজের বলে চালিয়ে দেয়।"

"বেচারি বাঈজিদের দোষ দিচ্ছেন কেন? অন্যেরাও তাই করে।"

"আল্লাহর কসম, কথাটা সত্য। আমার মরহুম আব্বাজানের অনেক বন্ধু ছিলেন যারা একটি লাইনও কখনো লিখেননি, কিন্তু যখনই কোন মুশায়রা হয়েছে তারা সেখানে

www.pathagar.com

তাদের কবিতা আবৃত্তি করার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়তেন। আব্বাজান প্রায় তাদেরকে তার নিজের কবিতা, এমনকি কখনো আমার কবিতা দিতেন, তাদেরকে আবৃত্তি করার জন্যে। আব্বার কোন কবিতায় তার ওস্তাদের স্পর্শ পড়লে তিনি সেটিও তার সংগ্রহ থেকে বাদ দিতেন। মিথ্যা প্রশংসা অর্জন করে মানুষ কি সুখ পায়?"

"একমাত্র আল্লাহই জানেন! এটা এক ধরণের লালসা এবং জঘন্য লালসা।"

"মেহেরবাণী করে ওই কবিতাটির আরো কিছু লাইন আবৃত্তি করো, যদি তোমার মনে থাকে।"

"আমার প্রেমিক যদি অসন্তুষ্ট হয়
তাহলে আমি বিলাপ করবো না,
আমার হৃদয়ের যাতনা ব্যক্তও করবো না।"

"আল্লাহর কসম করে বলছি, কথাগুলোকে প্রয়োগ করার কি সুন্দর উপায়। এই লাইনগুলো আবার বলো।"

আমি তা পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তার প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ জানালাম। "দয়া করে আপনার কিছু কবিতা আবৃত্তি করুন," আমি অনুরোধ করলাম। "ছোট কবি হলেও আমি আমার কবিতা আগে পেশ করেছি। এবার আপনার পালা।"

"আমি তা করবো," নওয়াব সাহেব বললেন। "আমি শেষ করলে তুমি যদি আরো কিছু কবিতা আবৃতির প্রতিশ্রুতি দাও।"

আমি উত্তর দেয়ার আগেই হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল এবং একটি লোক কামরায় প্রবেশ করলো। দীর্ঘ কালো দাঁড়িওয়ালা কালো রং এর একটি লোক। মাথায় কোনাকুনি করে বাধা তার পাগড়ি এবং কোমরে গোঁজা একটি ছোরা। পরিচিত লোকের মতো সে আমার পাশে বসে পড়লো আমার হাঁটুর ওপর চাপ দিয়ে। নওয়াব সুলতান ব্যাখ্যা চাওয়ার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। লজ্জায় মুখ নিচু করলাম আমি। কারণ তার ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর আমি আমার কাংখিত ধরণের একজন লোককে পেয়েছিলাম এবং আমরা আমাদের আলাপ আলোচনায় এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম এবং আস্থা বিনিময় করছিলাম ঠিক তখনই নীল আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতো একটি বিপর্যয় উপস্থিত হলো। একটি প্রবাদ আছে : "একটি পাথর দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়েছে এবং সেটি খুবই শক্ত পাথর।" আমি প্রার্থনা করছিলাম, আল্লাহ আমাদের মাঝখান থেকে এই জঘন্য আপদটিকে দূর করুক। লোকটির রক্তপিপাসু মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। আমার অপহরণকারী দিলাওয়ার খানের কারণে যে রকম আতংকিত হয়েছিলাম, ঠিক একই রকম আতংকের সৃষ্টি হয়েছিল আমার মধ্যে। বিচলিতভাবে শুধু তার কোমরের ছুরির দিকে দেখছিলাম, যেটি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করতে পারে। অথবা নওয়াব সাহেবের কোন ক্ষতি করতে পারে।

www.pathagar.com

আমি হোসাইনী খালাকে ডাকলাম। সে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। তার আচরণ থেকেই আমার ধারণা হলো যে, লোকটিকে সে কিছুটা জানে। তাকে বললো, "খান সাহেব, আপনার সাথে আমি একা কথা বলতে চাই। আপনি কি দয়া করে আমার সাথে আসবেন?"

"আমি যেখানে আছি, সেখান থেকেই শুনতে পারি," লোকটি রুক্ষভাবে উত্তর দিল। "আমার মতো লোক একবার বসে পড়লে আর উঠে না।"

"আপনি জোর করে কারো কাছে বসতে পারেন না, তাকি কি পারেন, খান সাহেব," কণ্ঠ নরম করে হোসাইনী খালা বললো।

"জোর করার কোন প্রশ্ন নেই," লোকটি উত্তর দিল। "বেশ্যাপাড়া কোন কুত্তার বাচ্চার একার জায়গা নয়। আর তুমি যদি মনে করে থাকো যে, আমি জোর করে ঢুকেছি, আমি কিছুতেই উঠে যাওয়ার লোক নই। আমি দেখতে চাই কে আমাকে বের করে দিতে পারে।"

হোসাইনী খালা দৃঢ়তার সাথে বললো যে, "একজন বাঈজি তারই কর্তৃত্বে থাকে যে তার জন্যে অর্থ দেয়। অতএব, সে সময়ে তার কাছে অন্য কারো আসার অধিকার নেই।"

"অন্যে যা দেয় আমিও তা দিতে রাজী।"

"কিন্তু এখন নয়।" হোসাইনী খালা বললো। "অন্য যে কোন সময়ে আপনাকে স্বাগত জানানো হবে।"

"নির্বোধের মতো কথা বলো না," লোকটি রেগে বললো। "আমার কথা কি তোমার কানে ঢুকছে না যে আমি বলেছি যাবো না।"

আমি লক্ষ্য করলাম যে নওয়াব সাহেবের মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখলেন তিনি এবং একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। হোসাইনী খালা আমার দিকে ফিরে বললেন, "বাছা, তুমি আমার সাথে এসো। এখন নওয়াব সাহেবের বিশ্রাম নেয়ার সময়। নওয়াব সাহেব, আপনি বারান্দায় যেতে পারেন।"

আমি যখন উঠতে যাচ্ছি, তখন ষন্ডা লোকটি খপ করে আমার হাত ধরলো। আমার পৃষ্ঠপোষক তরুণ নওয়াব আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন, "খান সাহেব, ওর হাত ছেড়ে দিন। এরই মধ্যে আপনি সকল শোভনীয়তার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছেন। এতোক্ষণ আমি চুপ ছিলাম, কারণ আমি মনে করি না যে বেশ্যালয়ে হাঙ্গামা করাটা সঠিক। কিন্তু এখন.....।"

"এখন আপনি কি করবেন বলে ভাবছেন?" লোকটি কথার মাঝে বললো? "আমি দেখতে চাই যে কোন্ বাপের বেটা আমার হাত থেকে ওকে ছাড়ায়।"

"আমার হাত ছেড়ে দিন। আমি যাচ্ছি না," আমি দৃঢ়তা নিয়ে বললাম। নওয়াব সাহেবকে এমন একটি অবস্থার মধ্যে ফেলে যাওয়ার কোন উদ্দেশ্য ছিল না আমার।

www.pathagar.com

লোকটি আমার হাত ছেড়ে দিল। কিন্তু নওয়াব সাহেব সত্যিসত্যিই রেগে গেছেন। "মুখ সামলে কথা বলুন। আপনি যে কখনো কোন ভদ্রলোকের সাথে মিশেননি তা অত্যন্ত স্পষ্ট।"

"তা হতে পারে," লোকটি বললো। "কিন্তু আপনি যখন ভদ্রলোকদের সাথে চলাফেরা করেছেন বলে দাবি করছেন, সেজন্যে আমি দেখতে চাই যে, আমার অভদ্র কথাবার্তার কারণে আপনি কি করতে পারেন।"

"আমি দেখতে পাচ্ছি যে লড়তে চাচ্ছেন," নওয়াব শান্তভাব বজায় রেখে বললেন। "একটি বেশ্যালয় কুস্তি লড়ার জায়গা অথবা কোন আখড়া নয়। আরেকবার সাক্ষাতের জন্যে এটা স্থগিত থাকুক। এখন এটাই ভালো হয়, যদি আপনি এখান থেকে চলে যান। তা না হলে....।"

"তা না হলে আপনি আমাকে পানিতে চুবিয়ে ছাড়বেন, এই তো," বিদ্রুপের সাথে বললো লোকটি। "লাল হয়ে যাওয়া ছোকরা আমাকে চলে যেতে বলছে! আপনি নিজেই কেন চলে যাচ্ছেন না?"

"ইমাম আলীর পবিত্র মস্তকের কসম, আমি তোমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছি," রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নওয়াব বললেন। "আমাকে নিজের নাম ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করতে হয়। আমার আব্বা আম্মা, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা কি ভাববেন তাও মাথায় রাখতে হচ্ছে। তা না হলে তোমার ধৃষ্টতার কারণে আচ্ছামতো শিক্ষা দিতে পারতাম আমি। আবার আপনাকে বলছি অহেতুক তর্ক করবেন না। দয়া করে চলে যান এখান থেকে।"

"আপনি বেশ্যাপাড়ায় এসেছেন, তবুও আপনার প্রিয় আম্মিজানকে ভয় করছেন," অবজ্ঞার সাথে বললো লোকটি। "আপনার কতো বড় সাহস যে আমাকে ধৃষ্ট বলছেন? আমি কি আপনার আব্বাজানের চাকর? আপনি বড় লোকের পুত্র হলে তাতে আমার কি আসে যায়? আপনিই তো অপ্রয়োজনে ঝগড়া করছেন। আমিও যেমন একজন বেশ্যার ঘরে এসেছি, আপনিও তাই এসেছেন। আমার যখন মর্জি তখন যাবো আমি। আমাকে কেউ হুকুম দিয়ে বের করে দিয়েছে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।"

"আপনার থেকে নিস্তার পাওয়া এমন কঠিন কোন কাজ নয়। আমাকে শুধু ভৃত্যদের ডাকতে হবে। ওরাই আপনাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে।"

"ভৃত্যদের নিয়ে বড়াই করবেন না। আমার কোমরে এই ছুরি দেখতে পাচ্ছেন?"

"ও রকম ছোরা বহু দেখেছি। আসল ছোরা হলো যেটি প্রয়োজনের সময় কাজে লাগে সেটি। ওটা খাপ থেকে বের করার আগেই আপনাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয়া হবে।

"এখনই আপনার বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়। আপনার আম্মিজান হয়তো উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করছেন।"

www.pathagar.com

নওয়াব সুলতান বিবর্ণ হয়ে গেলেন এবং রাগে কাঁপতে লাগলেন। তিনি তার দাম্ভিকতা তো প্রদর্শনই করেননি! নিচু জাতের লোকটির ধৃষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তার প্রেক্ষিতে একটি অশোভন কথাও বলেননি। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি হয়তো ভয় পেয়েছেন। আসলে তিনি লোকটিকে সুযোগ দিচ্ছিলেন যাতে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু ওই বদমাশটার জিহবা আর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। নওয়াব সুলতানের প্রতিটি কথার প্রেক্ষিতে লোকটি আরো আক্রমাণত্মক ভাব দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল পরিস্থিতি শান্ত করার কোন সুযোগ নেই। "ঠিক আছে, খান সাহেব," নওয়াব সুলতান বললেন, "চলুন আইশ বাগে যাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যাপারটা চুকে যাক।"

লোকটি ক্রুর হাসি হাসলো। "ছোট্ট বালক, চুমু খাওয়ার মতো মেয়েসুলভ মুখ নিয়ে তুমি আমাকে লড়ার জন্যে আহবান করছো। তোমার গায়ে আঁচড় লাগলে তোমার আম্মিজান কষ্ট পেয়ে কাঁদতে শুরু করবেন।"

"বদমাশ, তোর দুর্ব্যবহার সীমা ছাড়িয়ে গেছে," নওয়াব সুলতান গর্জে উঠলেন। "তোর বেয়াদবীর জন্যে তোকে শাস্তি দিতে হবে।" তিনি জামার নিচ থেকে পিস্তল বের করে গুলী করলেন। লোকটি রক্তের মধ্যে কাঁত হয়ে পড়লো। হোসাইনী খালা ঘটনায় হতভম্ব হয়ে গেছে। খানুম, অন্যান্য মেয়ে ভৃত্যরা দৌড়ে এলো আমার কামরায় এবং সবাই এক সাথে কথা বলতে শুরু করলো। নওয়াবের ব্যক্তিগত ভৃত্য, শামসির খান তার মনিবের হাত থেকে পিস্তলটি কেড়ে নিয়ে বললো, "হুজুরের বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। ব্যাপারটি আমি সামলাচ্ছি।"

"আমি যাবো না," নওয়াব বললেন। "যা ঘটার ছিল ঘটেছে। যা ঘটবে তা ঘটুক।" শামসির খান কোমর থেকে ছোরা বের করে তার মনিবকে বললো, "আলীর পবিত্র শিরের কসম কেটে বলছি, আপনি না গেলে আমি নিজের বুকে ছোরা বসিয়ে দেব।" আমরা লোকটিকে দেখলাম। তার হাতে গুলী লেগেছে এবং তার জীবনের কোন ভয় নেই। শামসির খান আবার তার মনিবকে বললো, "লোকটির কিছু হয়নি। আপনাকে অনুনয় করে বলছি চলে যাওয়ার জন্যে এবং এর মধ্যে আপনার নাম জড়িত না করতে।"

নওয়াব সুলতান উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে তার ভৃত্য কি ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি চলে যেতে সম্মত হলেন। খানুম কোতোয়ালকে তলব করে আনালেন, যিনি পাশের মহল্লাতেই ছিলেন। সাথে সাথে তিনি হাজির হলেন। খানুম তাকে এক পাশে নিয়ে কানে কানে কিছু বললেন। কোতোয়াল সামনে এসে হুংকার দিলেন, "এই লাওয়ারিশকে বের করে দাও। আমি দেখছি, কি ঘটেছে।"

খান সাহেবকে রাস্তায় বের করে দেয়া হলো না। আমরা তার হাতে পটি বেঁধে একটি পালকি আনতে বললাম। পালকি এলে লোকটিকে বললাম যে সে কোথায় থাকে। সে মুরগীর বাজারের কোথাও ঠিকানা বললো। তাকে পালকিতে উঠিয়ে বিদায় দিলাম।

www.pathagar.com

নওয়াব সুলতান পরদিন এলেন না, এরপর দিনও না এবং কোন খবরও পাঠালেন না। যে কান্ড ঘটেছিল, আমার ভয় হয়েছিল যে তিনি আর কখনোই আসবেন না। কয়েকদিন পর একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার জন্যে আমাকে ডাকা হয়েছিল। সেখানে নওয়াব সুলতান উপস্থিত ছিলেন। লোকজনের উপস্থিতিতে তার সাথে আমার কথা বলার সুযোগ পাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। পরিচয় থাকার সূত্র ধরে সামান্য মাথা হেলানোকেও অবাঞ্ছিত বিবেচনা করা হবে। আমার নওয়াবের পাশে প্রায় নয় বছর বয়সের সুন্দর জামা পরা ফর্সা একটি ছেলে বসে ছিল যে বাইরে যাওয়ার জন্যে উঠলো। আমার গানও সে সময়েই শেষ হয়েছিল। আমি সাজ ঘরে চলে এলাম। ছেলেটিকে ইশারায় ডেকে আমার পাশে বসালাম। তাকে একটি পান দিয়ে বললাম, "তুমি কি সুলতান সাহেবকে চেনো?"

"সুলতান সাহেব কে?"

"যে লোকটি তোমার ও বরের পাশে বসেছিল।"

"ওহ্, আপনি আমার বড় ভাইয়ার কথা বলছেন," ছেলেটি খুশী হয়ে বললো," কিন্তু আপনি তাকে সুলতান সাহেব বলছেন কেন?"

"আমি যদি তোমাকে কিছু দেই, তাহলে তুমি কি তা উনাকে দেবে?"

"আমার ওপর তিনি রাগ করবেন না তো?"

"না, উনি রাগ করবেন না।"

"আপনি কি জিনিস দিতে চান? একটি পান?"

"তার বাক্সে নিশ্চয়ই অনেক পান আছে। উনাকে এই কাগজটি দিও। আমি এক টুকরা কাগজ তুলে নিয়ে কাঠ কয়লা দিয়ে লিখলাম :

"দীর্ঘ দিন কেটে গেছে
আমার প্রেমকে অপেক্ষা
করেছে তার মেজাজ।"
আজ রাতে আমি তাকে
উত্যক্ত করবো, যখন সে
বন্ধুদের সাথে থাকবে।"

ছেলেটিকে বললাম নওয়াব সুলতান যখন অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকবেন কাগজের টকুরাটি তখন তার সামনে রাখতে। যেভাবে বলেছিলাম, ছেলেটি তাই করেছে। দরজার আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম, সুলতানকে কাগজটি তুলে পাঠ করতে। তাকে একটু বিচলিত মনে হলো এবং বেশ খানিকক্ষণ ধরে সেটি পড়ছিলেন। তার মুখে হাসি ফুটলো। কাগজের টুকরাটি পকেটে রেখে ইশারায় শামসির খানকে ডেকে তার কানে কানে কিছু বললেন। এক ঘন্টা পর শামসির খান আমরা কক্ষে এসে বললো, "নওয়াব সাহেব বলেছেন যে, উনি বাড়ি ফিরে আপনার চিরকূটের উত্তর পাঠাবেন।"

আমার পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল পরদিন সকালে। নওয়াব সুলতান সে অনুষ্ঠানে ছিলেন না এবং অনুষ্ঠান তেমন জমলো না তার অনুপস্থিতিতে। গান গাওয়ার মতো মনও ছিল না

www.pathagar.com

আমার। তড়িঘড়ি অনুষ্ঠান শেষ করে আমি বাড়ি ফিরে গেলাম। ধৈর্যহীনের মতো অপেক্ষা করছিলাম শামসির খানের জন্যে। সন্ধ্যা বাতি জ্বালানোর বেশ পরে সে এলো। নওয়াব সাহেবের চিঠি দিল আমাকে। এতে লিখা ছিল :

"তুমি যে কথাগুলো লিখেছো তা আমার হৃদয়ের নিভু নিভু আগুনকে আবার উস্কে দিয়েছে। আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু আমার কথার ওপর আমি অটল যে আর কখনো তোমার বাড়িতে পা রাখবো না। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ট এক বন্ধু নওয়াবগঞ্জে থাকে। নয়টার পর আমি তোমাকে আনতে লোক পাঠাবো। তোমার যদি ব্যস্ততা না থাকে তাহলে সেখানে চলে এসো। এভাবেই আমরা সাক্ষাৎ করতে পারি :

"প্রেমের রাত কতো ছোট্ট, তার দুর্লভ
দৃষ্টির জন্যে কিছু অভিযোগ
হতাশায় আমাকে কাঁদতে হয়।"

ওই ঘটনার পর নওয়াব সুলতান আর কোনদিনই খানুমের বাড়িতে আসেননি। তিনি আমাকে নিতে লোক পাঠাতেন এবং সপ্তাহে দু'তিন বার আমরা নওয়াবগঞ্জে তার বন্ধুর বাড়িতে সাক্ষাৎ করতাম। কি আনন্দেই না আমাদের সময়গুলো কেটেছে। আমরা কবিতা আবৃতি করতাম। কখনো আমি গান গাইতাম, সাথে তবলা বাজাতো নওয়াব সুলতানের বন্ধু। নওয়াব সুলতান যদিও গানের তালের সাথে পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তার নিজের রচিত গানগুলো বেশ ভালোই গাইতে পারতেন।

এভাবেই আমরা পরস্পরের চোখে তাকাতে শিখলাম
আমি তার দিকে তাকালে সেও তাকাতো
যেখানে আমার চোখ স্থির হতো।

ঘটনাগুলো মনে পড়লে সেই সন্ধ্যাগুলো আমার চোখের সামনে ভাসে। গ্রীষ্মের রাতগুলো চন্দ্রালোকিত। এক রাত্রে বাগানে মঞ্চ সাজানো হয়েছে এবং সাদা চাদর বিছিয়ে হেলান দিয়ে বসার জন্যে চারপাশে তাকিয়া রাখা হয়েছে। বাগানের গাছে গাছে প্রচুর ফুল ফুটেছে। জেসমিন ও নাইট কুইনের মৃদু সুবাসে চারদিক ভরে আছে। সুগন্ধি পান ও তামাকের ধোঁয়ার গন্ধেও বাতাস আচ্ছন্ন। এ ধরণের অনুষ্ঠান যেহেতু একেবারেই একান্ত সেজন্যে অনানুষ্ঠানিকতার একটা ভাব আছে। প্রত্যেকে যা বলতে আগ্রহী তা বিগলিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করছে। জীবন এতো উচ্ছল যে কারো পক্ষে সে যে পৃথিবীতে বসবাস করছে তা ভুলে যাওয়া, এমনকি তার সৃষ্টিকর্তাকে পর্যন্ত ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সম্ভবত সে কারণেই আল্লাহ এ ধরণের অনুষ্ঠান ভন্ডুল করে অথবা আমাদের মৃত্যুর দিনে, কিংবা মৃত্যুর পরে এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকবেন।

পাপে পূর্ণ প্রেমে কি পরিতৃপ্তি আমার কাছে
তা জানতে চেয়ো না। এর আনন্দ
আমি বেহেশতে স্মরণ করবো।

www.pathagar.com

আমি যে নওয়াব সুলতানকে ভালোবাসতাম এবং তিনিও যে আমাকে ভালো বাসতেন, তাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমাদের দু'জনের রুচি এতোটাই অভিন্ন ছিল যে, আমাদেরকে যদি জীবনের অবশিষ্ট সময় একসাথে কাটাতে হতো, তাহলে দু'জনের কারোই আফসোস করতে হতো না। নওয়াব সুলতান কবিতা পছন্দ করতেন, যার প্রতি শৈশব থেকে আমার আসক্তি ছিল। কবিতার প্রতি আবেগই আমাদের পরস্পরকে কাছে এনেছিল। সামান্যতম সুযোগ পেলেই তিনি কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন এবং আমিও তাকে অনুরূপ উত্তর দিতাম। কিন্তু হায়, বিচ্ছেদের ভারী হাত পতিত হলো আমাদের মিলনে।

আমি যখন চাঁদ ও তারকাকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখি
আমার হৃদয় সেসব রাতের জন্যে অনুতাপ করে
যখন বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যেই আমরা মিলিত হতাম।

"নিশ্চয়ই এ ধরণের অনেক মাহ্‌ফিল তোমাদের আশির্বাদ ধন্য পায়ের আবির্ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে," মির্জা রুসওয়া বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

"আপনি কি বলছেন মির্জা রুসওয়া! আমার উপস্থিতি কি এতোটাই অশুভ?"

"আমি তো তা বলতে পারি না। তবুও তোমার উপস্থিতিতে কোন মাহ্‌ফিল ধন্য হলে সেখানে অস্থিরতা থাকেই।"

"আমি যদি জানতাম যে আপনি এমন একটি কথা বলতে যাচ্ছেন, তাহলে আমার জীবনের কাহিনী আপনাকে বলতাম না। ভুলটা আমারই।"

"তোমার ক্ষেত্রে 'ভুল' শব্দটা ব্যবহার করো না। সেই কাজটিই তোমার নামকে আজীবন টিকিয়ে রাখবে, তা তোমার খ্যাতিই হোক আর বদনামই হোক। আমি বলতে পারি না। এই কবিতাটি আরো কিছু লাইন যদি তোমার মনে থাকে, তাহলে তা আবৃতি করো।"

"আপনি ভালোভাবেই জানেন যে কি করে একজন মানুষের অহমিকাকে তোয়াজ করতে হয়।"

"মেহেরবানী করে কবিতা আবৃতি করো।"

"আমার শুধু শুরুর দিকের লাইনগুলো মনে আছে এবং অন্য দু'টি কবিতার। শুনুন তাহলে :

নিঃসঙ্গ রাতে আমার হৃদয়ের আনন্দ ছিল
আমার হৃদয়ের বেদনা ছিল।
রাত দীর্ঘ ছিল, আমার বেদনা কেটে গেছে
আবার অস্থির হয়ে পড়েছি আমি।
শোকে তার দীর্ঘ চুল কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে
আমার আশাও নিভে গেছে, আমিও
মৃতের জন্যে বিলাপে যোগ দেব।

www.pathagar.com

নওয়াব জাফর আলীর খানের সেবায় আমাকে নিয়োগ করা হলো। সত্তর গ্রীষ্মের শ্রদ্ধাভাজন ভদ্রলোক। বয়সের ভারে তিনি ন্যুব্জ এবং মুখে একটি দাঁত বা মাথায় একটি কালো চুলের অস্তিত্বও ছিল না। তবুও তিনি নিজেকে প্রেম লাভের উপযুক্ত বলে মনে করতেন। আমি তার জাঁকালো আঙরাখা, ডোরাকাটা চমৎকার চুড়িদার পাজামা, লাল টকটকে কোমরবন্দ, ঝালরওয়ালা টুপির কথা আমি কখনো ভুলবো না।

আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, এমন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সেবায় একজন বাঈজিকে নিয়োগ করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? কিন্তু ওই সময়ের অভিজাতদের এবং বিত্তবান লোকদের মধ্যে এ ধরণের রীতি প্রচলিত ছিল। তারা নিজেদের নির্দিষ্ট বাঈজি রাখতে পছন্দ করতেন। নওয়াব জাফর আলীর দরবার জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। দরবারীদের মধ্যে যারা তার দীর্ঘ জীবন কামনা করতেন, তাদের মধ্যে একজন বাঈজির স্থানও ছিল। আমাকে প্রতি মাসে পঁচাত্তর টাকা করে দেয়া হতো এবং বিনিময়ে প্রতিদিন তাকে দু'ঘন্টা করে সঙ্গ দিতে হতো। বৃদ্ধ হলেও তিনি রাত ন'টার পর অন্দরমহলের বাইরে কাটাতে সাহস করতেন না। কোন কারণে বিলম্ব হলে তার পরিচারিকা আসতো তাকে নিয়ে যেতে। নওয়াবের মা তখনো জীবিত ছিলেন এবং বৃদ্ধ তার মাকে পাঁচ বছরের শিশুর মতো ভয় করতেন। স্ত্রীর প্রতিও তার আনুগত্য ছিল, যাকে তিনি শৈশবেই বিয়ে করেছিলেন। মহররম মাসের শোকের দশটি দিন এবং রমজান মাসের তিনটি দিন ছাড়া তারা কখনো আলাদা শয়ন করেননি।

নওয়াব জাফর আলী সকলের প্রিয়ভাজন একজন মানুষ ছিলেন। মহান ইমামদের জন্যে তিনি যখন কাসিদা গাইতেন আমার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তো। সঙ্গীতে তার গভীর জ্ঞান ছিল। গায়করা কোন গান ভুল সুরে গাইলে সাথে সাথে তিনি তা ধরিয়ে দিতেন। কাসিদার ক্ষেত্রে তার তুলনীয় গায়ক আর কেউ ছিল না। বিখ্যাত কাসিদা রচয়িতা মীর আলী রচিত কাসিদা তিনি সংকলন করেছিলেন। তার সেবায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় আমিই উপকৃত হয়েছিলাম। কারণ, শত শত কাসিদা তখন আমি শিখেছি এবং আমার খ্যাতি সে সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

লক্ষ্ণৌর অন্যান্য বাঈজির চাইতে খানুমের মহররমের অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো ব্যাপক ভিত্তিতে। শোক জ্ঞাপনের স্থানটি ব্যানার, পতাকা ও ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো হতো এবং যেখানে যা কিছু থাকতো তার সবই ছিল সেরা। মহররম মাসের প্রথম দশ দিনে পরহেজগাররা রোজা রাখতো এবং শত শত লোককে খাওয়াতো এবং প্রতিদিন সমাবেশ আয়োজিত হতো। পরে চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রতি বৃহস্পতিবার শোক সমাবেশ গুলোতে লোকজন ভিড় করতো।

কাসিদা গাওয়ার জন্যে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আমার চাইতে আর কেউ ভালোভাবে কাসিদা জানতো না। আমার উপস্থিতিতে এমনকি খ্যাতিমান পেশাদাররাও তাদের মুখ খুলতে সাহস করতো না। আমি রাণীর দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম।

www.pathagar.com

মহান রাজা আমার প্রশংসা করেন এবং প্রতিবছর মহররম উপলক্ষে আমাকে সম্মানজনক ভাবে পুরস্কৃত করা হতো। আমি তার দরবারী গায়িকা হিসেবেও নিয়োজিত হয়েছিলাম।

নওয়াব চব্বন যখন বিসমিল্লাহ জানের কুমারীত্ব মোচন করেন, তখন তার চাচা, যার কন্যার সাথে তার বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল, তিনি পবিত্র কারবালা জিয়ারতে ছিলেন। ছ'মাস পর তিনি লক্ষ্ণৌতে ফিরে যথাশীঘ্র বিয়ের জন্যে চাপ দেন। চব্বন তখন বিসমিল্লাহ জানের প্রেমে পাগল। কারণ সে তার রক্ষিতা হয়ে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চব্বনের ওপর তার কব্জা বৃদ্ধি করেছিল। তখন ছিল রাজরাজড়াদের দিন এবং কোন অভিজাতের কন্যার নাম কোন লোকের সাথে জড়িত হলে তার পক্ষে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনা সহ্য করা অসম্ভব ছিল। চব্বনের বৃদ্ধ চাচা 'না' গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

এক সন্ধ্যায় বিসমিল্লাহ জানের সাথে নওয়াব চব্বনের বাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হয়। যেখানে চব্বনের বন্ধু ও চামচারা জড়ো হয়েছিল। চব্বনের পাশেই বসে সে আমার গানে তানপুরার সুর তুলছিল এবং চব্বনের এক প্রিয় সঙ্গী তবলা বাজাচ্ছিল। একজন ভৃত্য দৌড়ে এসে আমাদেরকে বললো যে, চব্বনের বৃদ্ধ চাচা উপস্থিত হয়েছেন। চব্বন এবং আমাদের সবার বিশ্বাস ছিল যে তিনি চব্বনের মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে অন্দরমহলে চলে যাবেন। কিন্তু চাচা সোজা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে সমাবেশ লক্ষ্য করেই জ্বলে উঠলেন। চব্বন তাকে সালাম দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই তিনি বিদ্রুপের কণ্ঠে বললেন, "মুরব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর রীতিকে শেষ করে দেয়াই আমাদের জন্যে ভালো। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় তোলার বিবেচনার জন্য আমার বলার আছে। তা না হলে তোমার প্রমোদের মধ্যে আমি বিঘ্ন ঘটাতাম না।"

"আমি আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি।"

"সম্ভবতঃ তোমার জানার মতো বয়স হয়নি যে, তোমার আব্বা অর্থাৎ আমার ছোট ভাই আমাদের মায়ের ইন্তেকালের আগেই মারা গেছে। সে কারণে তিনি যে সম্পত্তি রেখে গেছেন তার কোন অংশ উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই এবং একই কারণে যে সম্পত্তি তুমি ভোগদখল করছো তা ভোগদখলের অধিকারও তোমার নেই। তোমার দাদীমা তোমাকে নিজের পুত্রের মতো দেখেছেন এবং তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তির অংশ তোমাকে উইল করে দিয়েছেন। কিন্তু সে সম্পত্তির পরিমাণ অতি সামান্য। আমি শুনেছি যে, সেই সম্পত্তিরও এক তৃতীয়াংশের বেশী তুমি ব্যয় করে ফেলেছো। যা হোক, এক তৃতীয়াংশ নিয়ে আমার কোন প্রশ্ন নেই, কিংবা এর অতিরিক্ত তুমি কি ব্যয় করেছো তা নিয়েও কিছু বলতে চাইনা। তুমি ও আমি একই রক্তের.....।" বৃদ্ধ চাচার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা নামলো। কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তিনি বলতে লাগলেন : "এ বাড়িতে তুমি তোমার জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত থাকতে পারতে। আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অংশ, যা আমার নিজ প্রয়োজনে মেটানোর জন্যে যথেষ্ট, তা আমার মৃত্যুর পর তোমার হতে পারতো। কিন্তু তোমার পাপ পথ

www.pathagar.com

আমাকে বাধ্য করছে তোমাকে বঞ্চিত করতে। আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের মাথার ঘাম ঝরিয়ে যে সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন তা ব্যভিচারে উড়িয়ে দেয়ার জন্যে নয়। দেওয়ানী আদালতের কর্মচারীরা আমার সাথে আছেন এবং তারা এ বাড়ির সবকিছুর তালিকা তৈরি করবেন। তুমি ভালোভাবে যেতে চাইলে এই মুহূর্তে তোমার এইসব সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে যাও।"

"এই সম্পত্তিতে কি আমার কোন অধিকার নেই?"

"কোনভাবেই না।"

"ঠিক আছে। আমি আমার আম্মিজানকে সাথে নিয়ে যাবো।"

"তিনি তোমার দিক থেকে তার হাত ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমার সাথে তিনি কারবালায় জিয়ারতে যাবেন।"

"আমি কোথায় যাবো," নওয়াব চব্বন চিৎকার করে বললো।

"আমি কি করে তা জানবো?" দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ চাচা। "তোমার সাঙ্গপাঙ্গ ও ভৃত্যদের কিংবা তোমার প্রেমিকাদের কাছে জানতে চাও।"

"ঠিক আছে আমাকে অন্ততঃ আমার কাপড়চোপড় ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্রগুলো নিতে দিন," অনুনয় করে বললো চব্বন।

"এ বাড়ির কোনকিছুই আর তোমার নয়। এমনকি নিজের জন্যে যে পোশাক বানিয়েছো তাও নয়," সিদ্ধান্ত ঘোষণার কণ্ঠে তার চাচা বললেন।

দেওয়ানী আদালতের অধিকারীরা ভিতরে এসে চব্বন ও বন্ধুবান্ধব এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী প্রমোদ কন্যাদের বহিস্কার করলো। বিসমিল্লাহ জান ও আমি পালকি ভাড়া করে বাড়ি ফিরলাম। আমি জানি না যে, চব্বন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কোথায় চলে গিয়েছিল। পরে শুনেছিলাম যে, এক এক করে তারা কেটে পড়ে এবং চব্বন তখন একা একা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো।

সেই সন্ধ্যায় বিসমিল্লাহ জানের ঘরে একটি মেহফিল ছিল। সেখানে প্রধান অতিথি মিয়া হাসনু, যে লোকটি সেদিন সকাল পর্যন্ত নওয়াব চব্বনের প্রধান চামচা, বন্ধু ও আস্থাভাজন ছিল। চব্বনের কাছে সে কসম কেটে বলেছিল, "মনিব, আপনার জন্যে আমি আমার জীবন বিলিয়ে দেব। আপনার যদি এক ফোটা ঘাম ঝরে তাহলে আপনার জন্যে আমি আমার রক্ত দেব।" বিসমিল্লাহ জানের কামরায় এটা তার প্রথম আগমণ ছিল না। আগেও সে তার কাছে এসেছে, কিন্তু চব্বনের সম্পূর্ণ অগোচরে। এখন কারো কাছে তার কোনকিছু লুকোনোর নেই এবং সে যে বিসমিল্লাহ জানের একক মালিক, এমন ভাব প্রকাশ করতো। আয়েশের সাথে বসে সে বিসমিল্লাহ জানের সাথে কথা বলতো, "এদিকে দেখো, বিসমিল্লাহ জান। এখন থেকে চব্বনের কাছে আর কোনকিছু আশা

www.pathagar.com

করো না। তুমি যা চাও আমি তোমাকে তাই দেব," এরপর প্রেমের ভান করে বলতো, "আমি সামান্য সঙ্গতির দরিদ্র একজন মানুষ। তোমাকে চব্বন যা দিতো, আমি তার অর্ধেকও তোমাকে দিতে পারবো না। তবুও তোমাকে সুখী রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করবো আমি।"

"আপনি! দরিদ্র মানুষ!" বিসমিল্লাহ জান মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলতো। "কেন আপনি স্বীকার করছেন না যে চব্বনের সবকিছু লুট করে আপনি আপনার সিন্দুক পূর্ণ করেছেন? আমার জন্যে আপনার দারিদ্র বন্টন করার মন আপনার আছে। আপনার মতো লোক, যদি আগুনে দগ্ধ হয়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আমার শরীরে অনেক চর্বি জমবে।"

"ওভাবে কথা বলো না," মিয়া হাসনু আপত্তি করে। "তুমি সবই জানো এবং দেখেছো। চব্বনের এমন কি ছিল যা দিয়ে আমার সিন্দুক পূর্ণ হতে পারে? আমার শ্রদ্ধেয়া আম্মারও তো এমন সম্পত্তি ছিল।"

"আপনার আম্মা, ফারখুন্দা খালা কি বেগম সরফরাজ মহলের টেবিলের পাশে অপেক্ষায় থাকতেন না?" বিসমিল্লাহ জান প্রশ্ন করে।

"হয়তো থাকতেন," একটু বিব্রত হয়ে হাসনু স্বীকার করলো। "কিন্তু যখন তিনি ইন্তেকাল করেন তখন চার হাজার টাকা মূল্যের গহনা রেখেছিলেন।"

"আমি তো শুনেছি যে, আপনার বিবি যখন তার আশিকের সাথে পালিয়ে যায় তখন গহনাগুলো নিয়ে পালিয়েছিল। অতএব, আপনার আর ছিল কি? আমার কাছে আপনি অতোটা জাহির করতে পারেন না। আপনার সম্পর্কে আমি অনেক কিছুই জানি।"

"অন্ততঃ এটা তুমি জানো না যে, আমার আব্বারও বেশ অর্থ সম্পত্তি ছিল," হাসনু আবার বলে।

"আপনার আব্বাজান কি নওয়াব হাসান আলী খানের পাখি শিকারী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন না?

"পাখি শিকারী? অসম্ভব ব্যাপার!"

"কিংবা নওয়াবের লড়াকু মোরগের প্রশিক্ষণ দানকারী?"

"মোরগের প্রশিক্ষক! কি বাজে বকছো!"

"এমনও হতে পারে যে লড়াকু কোয়েলের প্রশিক্ষণ দিতেন। পাখি শিকারী বা পাখি বিক্রেতা গোছের কোন চাকুরী।"

'আমার সাথে তুমি তামাশা করছো।"

"আমি সবসময় আমার মনের কথা বলি। সেজন্যে আমাকে কেউ পছন্দ করে না। এ কথাগুলো আমার বলা উচিত ছিল না, কিন্তু আপনার লুচ্চামি আমাকে বাধ্য করেছে আমাকে বুঝতে। আজ সকালেই আপনার বন্ধু ও মনিব নওয়াব চব্বনের ওপর বিপদ নেমে এলো, আর আজ সন্ধ্যায়ই তার স্থলে আপনি আমার পৃষ্ঠপোষক হতে চাইছেন!

www.pathagar.com

আপনি গিয়ে বরং মাথাটা দেখান। কদিন রাখতে পারবেন আমাকে? এক মাস, দু'মাস, বড় জোর তিন মাস?"

"তোমাকে ছ'মাসের অগ্রিম দিতে পারি আমি।"

"খুব সাহসের কথা!"

হাসনু মূল্যবান পাথর বসানো একজোড়া সোনার বালা বের করে বিসমিল্লাহ্ জানের দিকে এগিয়ে দিল। "এই দেখো, এগুলোর দাম কতো হবে বলে তোমার ধারণা?"

"আমাকে দেখতে দিন," বিসমিল্লাহ্ জান বালা দু'টি নিয়ে হাতে পরলো। "খুব সুন্দর বালা। আমি স্বর্ণাকারের ছেলে চান্না মলকে এগুলো দেখাবো। এখন আপনি যেতে পারেন। ছোটন আপার সাথে আমার সাক্ষাতের সময় হয়েছে। আমার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব নয়। আগামীকাল আপনি কোন এক সময়ে আসতে পারেন।"

"বালা দু'টি আমাকে ফেরত দাও।"

"আল্লাহর কসম! আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি চোরনীর সাথে কথা বলছেন?

আমাকে একটি মেহফিলে যেতে হবে, আর আমার হাতে সাদামাটা দু'টি চুড়ি আছে। আম্মিজানের কাছে আমার গহনাগুলো চাইলে তিনি জানতে চাইবেন যে আমি কোথায় যাচ্ছি। আপনার বালা দু'টি তো আর আমি খেয়ে ফেলবো না। কাল সকালে আপনি নিয়ে নিতে পারবেন।"

"মেহেরবাণী করে এখনই আমাকে দিয়ে দাও," হাসনু অনুনয় করলো, "এগুলো আমার হলে তোমাকে দান করে দিতে পারতাম।"

"নিশ্চয়ই এগুলো আপনার আম্মার। তিনি তো ইন্তেকাল করেছেন। অতএব এখন তো আপনারই।"

"না, এগুলো আমার নয়," হাসনু বললো। "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে এনেছিলাম।"

"আপনার কি মনে হয়, আমি বালা দু'টি চিনতে পারিনি?" বিসমিল্লাহ্ জান রেগে বললো। "বালা জোড়া চব্বন আপনাকে দিয়েছিল মহাজনের কাছে বন্ধক দেয়ার জন্যে।"

"তুমি কি বলছো?" হাসনু বিস্ময় প্রকাশ করলো, যেন সে কিছুই জানে না। "কখন সে দিয়েছিল?"

"যেদিন তিনি উমরাওকে তার ওখানে গান গাইতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং উমরাও যে সেজন্যে একশ' টাকা দাবি করেছিল, তা চব্বনের কাছে ছিল না। আমার মনে আছে এগুলো তিনি বাক্স থেকে বের করে আপনার সামনে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন বন্ধক দিয়ে টাকা আনার জন্যে।" বিসমিল্লাহ্ জান আমার দিকে ফিরে বললো, "বোন উমরাও, এগুলো কি সেই বালা জোড়া নয়?"

"আমার কাছে জানতে চাইছো কেন? তোমার তো মিথ্যা কথা বলার কোন কারণ নেই," আমি উত্তর দিলাম।

www.pathagar.com

"এখন আপনি পথ দেখুন," হাসনুর দিকে ফিরে বিসমিল্লাহ জান বললো। "আমি জানি যে, এই বালা জোড়া চব্বনের এবং আপনাকে এগুলো আর ফেরত দিতে যাচ্ছি না।"

"ঠিক আছে, ভালো কথা।" বেচারী হাসনু বিস্ময়ের সাথে বললো। "এর বদলে আমি যে টাকা দিয়েছি, তার কি হবে?"

"ওই টাকাই বা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন? চব্বনের পকেট থেকেই!"

"সত্যি বলছি! মহাজনের কাছ থেকে সুদের বদলে আমি এগুলো ধার এনেছি।"

"ঠিক আছে, মহাজনকে আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। তার পাওনা আমি পরিশোধ করবো। এখন আপনি গিয়ে খোলা বাতাসে হাঁটাহাটি করুন।"

"বালা জোড়া আমাকে অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে।"

"আপনাকে এগুলো আমি দেব না।"

"তুমি কি গায়ের জোরে ওগুলো রেখে দেবে?"

"প্রয়োজনে হ্যাঁ, আমি গায়ের জোরেই রাখবো। আপনি চুপচাপ কেটে পড়ুন, তা না হলে....।"

'ঠিক আছে, তোমার কাছে থাকুক, আগামীকাল তুমি ফেরত দেবে," কাতর হয়ে হাসনু বললো।

"কালের কথা কাল," বিসমিল্লাহ জান দৃঢ়তার সাথে বললো। হাসনু আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল।

আসল ঘটনা হলো, চব্বনের চাচা তার ভাতিজার ভৃত্যদের জেরার পর জেরা করে হিসাব বের করেছিলেন। যেসব সম্পত্তি ধারে ও সুদে মহাজনের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল সেগুলো পরিশোধের পর সম্পত্তি ছাড়ানো হয়। হাসনুকে যখন বালা দু'টির ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় তখন সে সেগুলো বন্ধক দেয়ার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। এখানেই ছিল হাসনুর দুর্বলতা।

হাসনু চলে যাওয়ার পর বিসমিল্লাহ জান আমাকে বললো, "বোন, দেখেছো, এই লোকটি কতো নীচ ও স্বার্থপর? এই বেঈমানটাই চব্বনের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। বহুদিন ধরেই আমি তাকে দেখে নেয়ার সুযোগ খুঁজছিলাম। যেখানে যেভাবে তাকে চেয়েছিলাম, আজ তাকে সেভাবে পেয়েছি। আমি আর লোকটিকে এই বালা দু'টি ফেরত দিতে যাচ্ছি না। যা কিছু বলা হোক না কেন, এগুলো আসলে চোরাই মাল।"

"ঠিক বলেছো, এগুলো হাসনুকে ফিরিয়ে দিও না," আমি সম্মতি দিলাম। "তুমি যদি এগুলো কাউকে দিতেই চাও, তাহলে বরং চব্বনকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে উনি অন্ততঃ কৃতজ্ঞ থাকবেন।"

www.pathagar.com

"আমি কেন চব্বনকে ফিরিয়ে দিতে যাবো।" এই বালা জোড়ার দাম কমপক্ষে এগারশ' টাকা। গর্দভটা মাত্র দু'শ পঁচিশ টাকার জন্যে এগুলো বন্ধক রেখেছিল। আমি তাকে দু'শ পঁচিশ টাকার সাথে সুদ হিসেবে আরে দশ বিশ টাকা দেব।"

"মহাজনের সাথে এগুলোর কি সম্পর্ক?" আমি জানতে চাই।

"হাসনু নিজেই চব্বনকে টাকাটা দিয়েছিল। সে যদি কোন গোলমাল পাকাতে চেষ্টা করে তাহলে আমি তাকে পুলিশে দেব।"

আমরা যখন বালা নিয়ে আলাপ করছিলাম, তখনই নওয়াব চব্বনের আবির্ভাব ঘটলো। তিনি হেঁটে এসেছেন এবং সম্পূর্ণ সঙ্গে কেউ নেই। তার মুখ জুড়ে দুঃখের ছাপ এবং চোখ ছলছল করছে। সব জাঁকজমক হারিয়ে গেছে। আভিজাত্য ও কর্তৃত্বের ভঙ্গি আর নেই। তার নিজের আস্থা ও সহজ ভাবও অনুপস্থিত। তার এমন দুর্দশার দৃশ্যে আমার চোখে পানি এলো। কিন্তু বিসমিল্লাহ জানের কাছে কাউকে বিনম্র থাকতেই হয়। একজন বাঈজির তার মতোই হওয়া প্রয়োজন। চব্বন বসতেই বিসমিল্লাহ জান বালা দু'টির প্রসঙ্গ উঠালো।

"নওয়াব সাহেব, দেখুন তো, এগুলো কি আপনার নয়, আপনি সেদিন হাসনুকে দিয়েছিলেন মহাজনের কাছে বন্ধক দিতে?"

"হ্যাঁ, ওগুলোই তো," চব্বন উত্তর দিল। "কিন্তু হাসনু সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে যে এগুলো তার মাধ্যমে বন্ধক দেয়া হয়েছে।"

"কতো টাকা দিয়েছে এই জোড়ার বিনিময়ে," বিসমিল্লাহ জানতে চাইলো।

"আমি সঠিক অংক মনে করতে পারছি না, সম্ভবত দু'শ পঁচিশ বা পঞ্চাশ টাকা।

"কত হারে সুদ?"

"সুদের হার নিয়ে কে মাথা ঘামায়? বন্ধক দিয়ে কোন কিছু পুনরায় ফিরিয়ে নেয়ার প্রশ্ন কখনো উঠে না। অতএব সুদের হার হিসাবের প্রয়োজনও হয় না।"

"আমি কি বালা জোড়া রাখতে পারি," কোন দ্বিধা না করেই বিসমিল্লাহ জান জানতে চাইলো।

"ওগুলো তোমারই।"

"আপনি হাসনুকে শাস্তি দিতে চাইলে, আমি কোতোয়ালকে তার পিছনে লাগাতে পারি।"

"আমার মাথা যদি তোমার প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে তা করো না," চব্বন উত্তর দিলো। "হাসনু সৈয়দ বংশোদ্ভুত। মহানবী (সঃ) এর উত্তরসুরী।"

"বাজে কথা! কে তার পিতা লোকটি তা পর্যন্ত জানে না।"

"সে তাই বলে, আমার জন্যে ওটাই যথেষ্ট।"

নওয়াব চব্বনের উদারতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল, বিশেষ করে তখন তার অবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল। কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরণের মানুষ তাদের মধ্যেই পাওয়া সম্ভব, সম্পদ ও বংশ মর্যাদায় যাদের কয়েক পুরুষের ঐতিহ্য রয়েছে। বিসমিল্লাহ জানের

www.pathagar.com

অকৃতজ্ঞতা ছিল তার পৃষ্ঠপোষকের প্রতি। হাসনুকে যে অজুহাত দিয়ে বিদায় করেছিল চব্বনকেও সে একই অজুহাত দেয় যে অন্য একজনের আসার কথা তার কাছে।

এ ঘটনার দুই বা তিনদিন পর আমি খানুমের কাছে বসা ছিলাম, তখন বাড়িতে এক বৃদ্ধা মহিলার আগমন ঘটে। মহিলা খানুমকে কুর্ণিশ করে অনেকখানি অবনত হয়ে এবং মেঝের ওপর বসে।

"আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" খানুম জানতে চান।

"আশা করি আর কেউ আমাদের কথা শুনছে না।"

"এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই," খানুম উত্তর দেন। "এই বাচ্চা মেয়েটি কিছু বুঝবে না। আপনি মন খুলে বলতে পারেন।"

"ফখরুন নিসা বেগম আমাকে পাঠিয়েছেন," বৃদ্ধা মহিলা বলেন।

"ফখরুন নিসা বেগম কে?"

"আপনি জানেন না! নওয়াব চব্বনের....।"

"ও বুঝেছি, আপনি বলুন।"

"আপনি বিসমিল্লাহ জানের আম্মা, তাই না?"

"জ্বি।"

বৃদ্ধা এক নিঃশ্বাসে তার কথা বললেন : "চব্বন বেগমের একমাত্র পুত্র.....তিনি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং তাকে বড় করতে কোনকিছু ব্যয়ে কার্পণ্য করেননি। কারণ পতঙ্গ যেমন আগুন ভালোবাসে, তেমনি তিনি তাকে ভালবাসেন। তার চাচাও তাকে ভালোবাসতেন এবং তার একমাত্র কন্যাকে চব্বনের সাথে বিয়ে দেয়াও স্থির করেছিলেন। কিন্তু চব্বন তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। যেহেতু মেয়েটির নাম চব্বনের সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল, অতএব সঙ্গত কারণেই তার চাচা চব্বনের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যদ্দুর জানি, বেগম এ নিয়ে কিছু বলেননি, কিন্তু বৃদ্ধ চাচা যা কিছু করেছেন তা শুধু তার ভাতিজাকে একটি শিক্ষা দেয়ার জন্যেই....। আপনার কন্যা তার বাকী জীবনের জন্যে আমাদের কাছে নিয়োজিত মনে করতে পারে। চব্বন বিসমিল্লাহ জানকে যা দিতো বেগম তাকে তার চাইতে অধিক দিতে রাজী, যদি আপনি চব্বনকে এই বিয়ের জন্যে সম্মত করিয়ে তার প্রতি আনুকূল্য দেখান। বিয়ের পর সকল সম্পত্তি চব্বনের হবে, কারণ সে ছাড়া এই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করার আর কেউ নেই। চব্বন তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এমনকি তাদের নিজেদের জীবনের চাইতেও। বেগম সাহেবা আপনার কাছে অনুনয় করেছেন, যাতে পরিবারটি ধ্বংস হয়ে না যায় তা আপনি দেখবেন। কারণ তা হলে তাদের মতো আপনার স্বার্থেরও ক্ষতি হবে।"

খানুম নিরবে শুনলেন। বিষয়টি নিয়ে একটু চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন, "বেগম সাহেবাকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলবেন যে, আল্লাহ ইচ্ছায় তিনি যেভাবে চাইছেন

www.pathagar.com

সবকিছু সেভাবেই হবে। আমি তার আজীবন দাসী এবং তার স্বার্থের জন্যে ক্ষতিকর কিছু করবো না। তার ভয় করার কোন কারণ নেই।"

"বেগম সাহেবা এটাও চান যে, চব্বন যাতে এ ব্যাপারে কোন কিছুই না জানে। সে অত্যন্ত একগুঁয়ে ছেলে এবং একথা শুনলে সে আর ফিরে আসবে না।"

"কেউ একটি শব্দও বলতে সাহসী হবে না," খানুম বলে আমার পানে ফিরলেন। "এই মেয়ে, এ নিয়ে কারো সাথে কিছু বলো না।"

"জি না, মোহতারিমা," আমি তাকে নিশ্চিত করলাম।

বৃদ্ধা মহিলা খানুমকে এক পাশে নিয়ে কানে কানে কথা বললো। আমি শুনতে না পেলেও মহিলার চলে যাওয়ার সময় খানুমকে বলতে শুনলাম, "আমার পক্ষ থেকে বেগম সাহেবাকে দয়া করে বলবেন যে এটা পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সারা জীবন ধরে তো তাদেরই নুন খাচ্ছি।"

বৃদ্ধা চলে যাওয়ার পর বিসমিল্লাহ জানকে তলব করলেন খানুম এবং তার কানে কানে কিছু কথা বললেন। এরপর নওয়াব চব্বন এলে তাকে আরো উষ্ণতার সাথে স্বাগত জানানো হতো, বরং সে যখন বিসমিল্লাহ জানের পৃষ্ঠপোষক ছিল তার চাইতেও বেশী। চব্বন ও বিসমিল্লাহ জান প্রেমের আলোচনায় লিপ্ত হতো। আমিও কখনো উপস্থিত থাকতাম। খানুম সহসা দৃশ্যপটে হাজির হতেন এবং দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লভাবে বলতেন, "বাছারা, আমি কি তোমাদের সাথে যোগ দিতে পারি?"

বিসমিল্লাহ জান তার প্রেমিককে বলতো, "একটু সরে বসুন। আম্মিজান আসছেন।" খানুম প্রবেশ করে নওয়াব চব্বনকে তিনবার সালাম দিতেন। আমি আর কাউকে এমন সশ্রদ্ধ সালাম দিতে দেখিনি তাকে। অত্যন্ত সম্মানের সাথে প্রশ্ন করতেন, "মহামান্য অতিথির সময় কেমন কাটছে?"

"সবই আল্লাহর ইচ্ছা," চব্বন মাথা ঝুলিয়ে উত্তর দিতো।

"আমি তো সবসময় আপনার কল্যাণের জন্যেই দোয়া করি," খানুম বলতেন। "আমাদের কি আছে তাতে কিছু যায় আসে না, আমরা সবসময় তামার পয়সার কন্যা, আগ্রহের সাথে আপনাদের সম্পদে ভরা হাতের পানে তাকিয়ে থাকি, কারণ আল্লাহ আপনারদেরকে ধনবান করে পাঠিয়েছেন।" এরপর আসল কথায় আসতেন, "আপনার কাছে আমার একটি অনুগ্রহ চাওয়ার আছে। আমার কন্যা বিসমিল্লাহ জান যদিও আপনার সেবায় এক বছর যাবত নিয়োজিত আছে, কিন্তু আমি আপনাকে সালাম জানানোর বা বিরক্ত করার খুব একটা সুযোগ পাইনি। কিন্তু কিছু বাধ্যবাধকতা আমাকে আপনার কাছে নিয়ে এসেছে।"

খানুমের এভাবে কথা বলার উদ্দেশ্য কি তা আমি জানতাম। কিন্তু তার কন্যা বিসমিল্লাহ জানকে রীতিমতো নির্বিকার দেখাচ্ছিল। বেচারী চব্বন শূন্য দৃষ্টিতে বিসমিল্লাহ জানের দিকে তাকালো এবং তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

www.pathagar.com

"আমি কি আমার কথাটি নিবেদন করতে পারি?" খানুম জানতে চান।

"দয়া করে বলুন," চব্বন ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল।

খানুম আমাকে ইশারায় ডেকে বললেন, "হোসাইনীকে আসতে বলো।" আমি গিয়ে হোসাইনী খালাকে সাথে নিয়ে এলাম।

"ওই শালটি আমাকে এনে দাও," খানুম নির্দেশ দিলেন। "তুমি জানো যে কাল ওটি ডিলার ফেলে গিয়েছিল।"

হোসাইনী খালা শাল নিয়ে এলো। পাড়ের দিকে সোনার কাজ করা অতি চমৎকার শালটি।

খানুম শালটি চব্বনের দিকে মেলে ধরে বললেন, "গতকাল এটি এখানে আনা হয়েছিল বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। লোকটি দাম চেয়েছিল দুই হাজার টাকা। সে বলেছে, পনের হাজার টাকা পর্যন্ত দাম উঠলেও সে শালটি বেচেনি। আমার মনে হয়, সতের বা আঠারশ' টাকা দাম হলেও খুব বেশী দাম হবে না। আপনার মতো মহান ব্যক্তি আমার ওপর পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টি ফেললে আমি আমার বুড়ো শরীরটা এই শাল দিয়ে ঢাকতে পারি।"

চব্বন চুপ করে রইলো। বিসমিল্লাহ জান কিছু বলতে চেষ্টা করার আগেই তার মা বলে উঠলেন, "ধৈর্য ধারণ করো বেটি, আমাদের দু'জনের কথার মাঝখানে এসো না। তুমি তো সবসময় তার অনুগ্রহ চাইতে পারবে, আমাকে অন্ততঃ একবার তার অনুগ্রহ পেতে দাও।"

চব্বন তখনো নিঃচুপ।

"নওয়াব চব্বন, যে কৃপণ মুহূর্তের মধ্যে কোন কিছু দিতে অস্বীকার করে সে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা উদার ব্যক্তির চাইতে উত্তম। আপনি কিছু বলছেন না কেন? আপনার সেবাদাসী আপনার উত্তরের পরিবর্তে নিরবতাকে মেনে নিতে পারে না। উত্তর যদি "হা' না হয় , তাহলে 'না' হোক। তবুও কিছু বলুন, যাতে আমার মনে শান্তি আসে।"

চব্বন তবুও কথা বলছে না।

"আল্লাহর দোহাই, এই দরিদ্র মহিলাকে একটি উত্তর দিন," খানুম অনুনয় করে বললেন, "আমি জানি যে আমি ভাগ্যহত এক পথচারিণী। আপনার মতো মানুষরাই আমার মতো মহিলাদেরকে সমাজে কিছু মর্যাদা দিয়েছেন। আপনার কাছে মিনতি করে বলছি, এই মেয়েগুলোর সামনে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে ছোট করবেন না।"

"মোহতারিমা খানুম," অশ্রুপূর্ণ চোখে চব্বন উত্তর দিলেন। "এই শাল অতি তুচ্ছ একটি জিনিস, যা আমি আনন্দ চিত্তে আপনাকে দিতে পারতাম। মনে হচ্ছে, আপনি আমার অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত নন। বিসমিল্লাহ কি আপনাকে কিছু বলেনি? সেদিন উমরাও জানও উপস্থিত ছিল।"

www.pathagar.com

"কেউ আমাকে কিছু বলেনি। আশা করি সবকিছু ঠিকঠাক আছে," খানুম সরাসরি বললেন। বিসমিল্লাহ জান আবারও কিছু বলতে উদ্যত, তখন তার মা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল। আমি পাথরের মতো বসে ছিলাম।

"আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করার মতো অবস্থায় নেই," নওয়াব চব্বন মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গিতেই বললেন।

"আপনার দুশমনদের ওপর দারিদ্রের অভিশাপ পতিত হোক," চব্বনের বক্তব্য না বুঝার ভান করে খানুম বললেন। "আমার মতো একজন বৃদ্ধার ব্যাপারে আপনার পরোয়া করার কি থাকতে পারে?" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন। "আমার অভিশপ্ত কপাল আমাকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছে যে আমি একটি ছিন্ন বস্ত্র চাইলেও অভিজাত লোকজন তাদের মুখ আড়াল করে।"

খানুমের প্রতিটি কথা নওয়াব চব্বনের হৃদয়ে বর্শার মতো বিদ্ধ হচ্ছিল। বিনয়ের সাথে সে বললো, "সর্বোত্তম জিনিসপত্রের যোগ্য আপনি, মোহতারিমা! আমি যখন বলছি যে আপনাকে কোনকিছু দেয়ার অবস্থা আমার আর নেই, আপনার তা বিশ্বাস করা উচিত।" অতঃপর চব্বন তার ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বর্ণনা করলো।

খানুম সাথে সাথে তার সুর পাল্টে ফেললেন। "ঠিক আছে জনাব। আপনি যদি আমার এই সামান্য অনুরোধটুকু এখন রাখতে না পারেন তাহলে আর নগন্য দাসীর বাড়িতে আপনি কেন আসবেন," ছলনাময়ীর ভঙ্গিতে তিনি বললেন। "আপনি কি জানেন না, একজন বাঈজির বন্ধুত্ব শুধুই অর্থের সাথে? আপনি কি কখনো এ কথাটি শোনেননি যে, একজন বেশ্যা কারো বিবি নয়? আমাদের মতো মহিলারা যদি প্রেমের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দেই তাহলে আমরা বাঁচবো কি করে?" বিদ্রুপ করেও কিছু কথা বললেন তিনি, "এ বাড়িকে নিজের মনে করে আপনি সবসময় আসতে পারেন। আপনাকে আসতে বাধা দেব না আমি। কিন্তু আপনার কিছু আত্মসম্মান থাকা উচিত," বলে খানুম কামরা থেকে বের হয়ে গেলেন।

"আসলেই আমি নিদারুণ ভুলের মধ্যে ছিলাম," চব্বন উঠে দাঁড়ালো। "আল্লাহ চাহে তো আর কখনো আমি এখানে আসবো না।"

বিসমিল্লাহ জান নওয়াব চব্বনের পিরহানের প্রান্ত টেনে ধরে আবার তাকে বসালো।

"এই বালা দু'টি নিয়ে আমি কি করবো?" জানতে চাইলো সে।

"আমি জানি না," চব্বন বললো।

"আমার কথায় আপনার আর কোন মনোযোগ নেই, তাই না? আপনি কোথায় যাবেন? আমার সাথেই থাকুন।"

"আমাকে যেতে দাও বিসমিল্লাহ জান। আমি আর আসবো না। আল্লাহ যদি কখনো সুদিন আনেন তখন দেখা যাবে। কিন্তু তার সুযোগও সামান্য।"

www.pathagar.com

"আপনাকে আমি যেতে দেব না।"

"তুমি কি চাও যে তোমার আম্মা আমাকে জুতাপেটা করুক?"

বিসমিল্লাহ জান আমার দিকে ফিরলো, "উমরাও, বৃদ্ধা মহিলাটির কি হয়েছে আজ? বহু বছর ধরে তিনি তো কখনো আমার কামরায় উঁকি দিয়েও দেখেননি। আর যখন এসেছেন তখন এমন আচরণ করেননি। আম্মিজান পছন্দ করুক আর না করুক আমি চব্বনকে ছাড়বো না। তার টাকা পয়সা নেই তো কি হয়েছে। কারো পক্ষে এমন স্বার্থপর বা অন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। নওয়াব চব্বনের কাছে আম্মিজান যে হাজার হাজার টাকা নিয়েছেন তা উনি কি করে ভুলে গেলেন? ভাগ্যের চাকা যদি চব্বনের বিরুদ্ধে গিয়ে থাকে, আমাদের তো টিয়াপাখীর মতো মনিবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দেয়া উচিত নয়। এ বাড়ি থেকে আপনাকে বের করে দেবে! কিছুতেই নয়।" সে চব্বনের হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো, "আম্মিজান যদি আমাকে আরো জ্বালাতন করে, তাহলে আমিও আপনার সাথে চলে যাব। আমি আপনাকে আমার মনের কথাটি বললাম।"

আমি জানতাম যে বিসমিল্লাহ জানের উদ্দেশ্য কি এবং তার কথায় সম্মতির মনোভাব দেখালাম। সে তার প্রেমিকের দিকে ফিরলো, আপনি কোথায় থাকেন?

"আমি জানি না।"

"আপনাকে নিশ্চয়ই কোথাও থাকছেন," সে আবার জানতে চাইলো।

"তাশিনগঞ্জে মাখদুম বখশের বাড়িতে। তার প্রতি হাজার বার শোকর, সে যে তার নুনের প্রতি এতোটা কৃতজ্ঞ থাকবে আমি তা উপলব্ধি করিনি। তার সাথে যে আচরণ করতাম সেজন্যে এখন আমি লজ্জিত।"

"এটি কি সেই মাখদুম বখশ, যাতে আপনার আব্বা নিয়োগ করেছিলেন, আর আপনি যাকে বের করে দিয়েছিলেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ, সেই লোকটি। তোমাদেরকে বলে বুঝাতে পারবো না যে আমার এই দুরবস্থার মধ্যে আমাকে সে কিভাবে সাহায্য করেছে। আল্লাহ চাহে তো.....' চব্বনের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। বিসমিল্লাহ জানের হাত সরিয়ে দেয়ার জন্যে পিরহানের প্রান্ত নাড়া দিল চব্বন এবং কামরা থেকে বের হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় বিসমিল্লাহ জান ও আমি পালকিতে উঠে তাশিনগঞ্জে গেলাম এবং মখদুম বখশের বাড়ি খুঁজে পেলাম বহু কষ্টে। বেহারারা তার দরজায় পালকি নামিয়ে তাকে খুঁজতে গেল। একটি ছোট্ট মেয়ে বের হয়ে আমাদেরকে জানালো যে মখদুম বখশ বাড়ি নেই এবং চব্বন সেই যে সকালে বের হয়েছে, আর ফিরে আসেনি। আমরা দু'ঘন্টা অপেক্ষা করলাম। কিন্তু দু'জনের কেউই ফিরে এলো না। হতাশ হয়ে আমরা চলে এলাম।

মখদুম বখশ পরদিন আমাদের বাড়িতে এলেন নওয়াব চব্বনের খোঁজে। তিনি বললেন চব্বন রাতে বাড়ি ফিরেনি। সন্ধ্যায় চব্বনের মায়ের বৃদ্ধা পরিচারিকা, যিনি

www.pathagar.com

খানুমের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি এলেন বিলাপ করতে করতে। তিনি বললেন যে, চব্বনের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না এবং বেগম দিশেহারা হয়ে কান্নাকাটি করছেন। বৃদ্ধ নওয়াব অর্থাৎ চব্বনের চাচাও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

বহুদিন গত হয়ে গেল, কিন্তু চব্বনের কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। অতঃপর একটি লোক বাজারে ধরা পড়লো চব্বনের আংটি বিক্রি করতে এসে। কোতোয়ালীতে লোকটি বললো যে, জনৈক হুকা বরদার ইমাম বখশের পুত্র তাকে আংটিটি দিয়েছে বিক্রি করতে। ছেলেটিকে পুলিশ খুঁজে না পেলেও হুকা বরদারকে ধরতে সক্ষম হলো। প্রথমে সে আংটি সম্পর্কে তার পুরো অজ্ঞতা প্রকাশ করলো। কিন্তু কোতোয়াল যখন তাকে ধোলাই করার হুমকি দিলেন তখন সে স্বীকার করলো। লোকটি এই কাহিনী বর্ণনা করেছিল ঃ

"লোহার পুলের পাশে আমি থাকি এবং পথচারীদের হুকায় ধূমপান করিয়ে এবং যারা গোসল করতে নদীতে নামে তাদের কাপড়চোপড়ের ওপর চোখ রেখে জীবিকা নির্বাহ করি। কয়েকদিন আগে সন্ধ্যার দিকে এক যুবক পুলের পাশে আসে গোসল করতে। সে ফর্সা, সুদর্শন এবং নিঃসন্দেহে উচ্চ বংশজাত। কাপড় খুলে সে আমার জিম্মায় রাখে। আমার কাছ থেকে একটি লুঙ্গি নিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেয়। আমি কিছুক্ষণ তাকে পানিতে দেখি, এরপর সে আমার দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। বিলম্ব হয়ে যাচ্ছিল। আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম যে কোন মুহূর্তে সে নদী থেকে উঠে আসবে। রাত নেমে এলো, চারদিক ছেয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে। আমার নিশ্চিত ধারণা হলো সে পানিতে ডুবে গেছে। নিজেকে বললাম, "আমি যদি কোতোয়ালীতে গিয়ে বিষয়টি জানাই, তাহলে ঝামেলার কোন শেষ থাকবে না এবং আমাকে এক আদালত থেকে আরেক আদালতে টানা হেঁচড়া করা হবে।' অতএব আমি ব্যাপারটি চেপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তার কাপড়গুলো তুলে বাড়ি গেলাম। আংটিটি তার জামার পকেটে পেয়েছিলাম। আরেকটি আংটি আছে, যার ওপর খোদাই করে কিছু লিখা। একমাত্র আল্লাহই জানেন লিখাগুলো কি। ভয়ে আমি কাউকে দেখাইনি পর্যন্ত। এটিও আমি কিছুতেই বিক্রি করতাম না। আমার ছেলেটি বখে গেছে, সে টাকার জন্যে এটি চুরি করেছে।"

কোতোয়াল ইমাম বখশের সাথে দু'জন সিপাহীকে পাঠালেন তার বাড়ি থেকে আংটি ও জামাকাপড় জব্দ করে আনতে। আংটির ওপর নওয়াব চব্বনের মোহর। এই দুঃখের খবর, জামা ও আংটি দু'টি চব্বনের বৃদ্ধ চাচার কাছে পাঠিয়ে দিলেন কোতোয়াল। ইমাম বখশকে কয়েদখানায় পাঠানো হলো।

"আমিই অভিশপ্ত," বিসমিল্লাহ জান হাত নেড়ে বললো। "তাহলে বেচারী নওয়াব চব্বন পানিতে ডুবে মারা গেছেন। তাঁর রক্ত লেগে আছে আমার মায়ের হাতে। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।"

www.pathagar.com

"এটা কি লজ্জার কথা নয়!" বিস্মিত হয়ে বললাম। "ওই দিন থেকেই আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে উনি ভালো অবস্থায় নেই।"

"উনি মৃত্যুর ছায়ার নিচে ছিলেন," দার্শনিকের মতো বললো বিসমিল্লাহ জান।

"আল্লাহ তার বৃদ্ধ চাচার ধ্বংস ডেকে আনুক। তিনি যদি উত্তরাধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত না করতেন, তাহলে চব্বনকে এভাবে জীবন হারাতে হতো না।"

"অবাক হয়ে ভাবছি যে তার মা কেমন বোধ করেছেন।"

"আমি কাউকে বলতে শুনেছি যে, এ ঘটনার পর থেকে তার মাথা ঠিক নেই।"

"এ ঘটনায় আমি অবাক হচ্ছি না," আমি বললাম। "বহু প্রার্থনার পর আল্লাহ তাকে এই একটি মাত্র সন্তান দিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি হারিয়েছেন স্বামীকে, এখন এই বিপদ পড়লো তার মাথার ওপর। বাড়িটি যে ধ্বংস হয়ে গেল তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

"তাহলে নওয়াব চব্বনকে তুমিই ডুবিয়েছো। অন্য বিষয়ে বলার আগে আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই," মির্জা রুসওয়া বললেন। "নওয়াব চব্বন কি সাঁতার জানতেন?"

"আমি জানি না। হঠাৎ এ প্রশ্নে করছেন কেন?"

"সামান্য কারণে। কারণ বিখ্যাত সাতারু, যাকে "মাছদের প্রভু' বলা হয়ে থাকে, তিনি আমাকে বলেছেন, যে সাতার জানে সে নিজের ইচ্ছায় ডুবে মরতে পারে না।"

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

"অসহায় প্রেমিকের নিষ্ঠাকে সে পরীক্ষার মধ্যে ফেলেনি
বরং যন্ত্রণা দেয়ার কোন্ উপায়টি উত্তম
তা বের করতেই এই পরীক্ষা।"

"মির্জা রুসওয়া, আপনি কি কখনো প্রেমে পড়েছেন?"

"আল্লাহ আমাকে মাফ করুন। তুমি নিশ্চয়ই বহু লোকের সাথে প্রেম করেছো। তোমার জীবনের এই অংশটুকুর কাহিনী জানতেই আমি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি তা বলতে চাও না।"

"আমি একজন বাঈজি ছাড়া তো আর কিছু নই, যার পেশার মধ্যে প্রেম চলতি মুদ্রার মতো। যখনই আমরা কাউকে ফাঁদে ফেলতে চাই, আমরা তার সাথে প্রেমে পড়ার ভান করি। কিভাবে প্রেম করতে হয় তা আমাদের চাইতে ভালো কেউ জানে না ঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা, সামান্য ছলেই চোখের পানিতে বুক ভাসানো, দিনের পরদিন না খেয়ে থাকা, কূয়ার কার্ণিশে পা ঝুলিয়ে যে কোন মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়ার হুমকি দেয়া, আর্সেনিক বিষ গিলে ফেলার কথা বলা। এই সবকিছুই আমাদের প্রেমের খেলার অংশ। একজন মানুষ যতো কঠিন হৃদয়েরই হোক না কেন, সে আমাদের ছলনায় ধরা দেয়। কিন্তু আপনাকে সত্যি বলছি, আমাকে কোন পুরুষ সত্যিকার অর্থে ভালোবাসেনি, কিংবা আমিও সেভাবে কাউকে ভালোবাসিনি। অন্যদিকে বিসমিল্লাহ জান প্রেমে পড়ার ব্যাপারে ছিল তুলনাহীন। তার জন্যে পুরুষ মানুষ ছিল অতি সাধারণ খেলা। সে যদি চেষ্টা করতো তাহলে ফেরেশতাদেরও তার জালে আটকাতে পারতো। হাজার হাজার পুরুষ তার প্রেমে পড়েছে এবং সেও হাজার জনকে ভালোবেসেছে। তার সত্যিকারের ভালোবাসার লোকদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেবও ছিলেন। তিনি সাধারণ ধর্মতাত্ত্বিক ছিলেন না, দূর থেকে আগত ছাত্রদের তিনি সবচেয়ে আধুনিক আরবি গ্রন্থ থেকে শিক্ষা দিতেন। যুক্তিশাস্ত্রে তার তুলনীয় পন্ডিত ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়জন ছিল না। আমি যে সময়ের কথা বলছি তিনি ততোদিনে তার জীবনের প্রায় সত্তরটি বছর অতিবাহিত করেছেন। তার নূরানি চেহারাকে আরো অপরূপ করেছে তার শ্বেত শুভ্র দাড়ি। কামানো মাথায় বসানো থাকতো ইমাম সাহেবদের মতো বড় পাগড়ি। দীর্ঘ আলখেল্লা পড়তেন তিনি এবং তার হাতে একটি

www.pathagar.com

সুন্দর ছড়ি থাকতো। তার চেহারা দেখে কেউ ধারণাও করতে পারতো না তিনি একজন ধৃষ্ট তরুণী বেশ্যার প্রেমে পড়তে পারেন।

"আপনাকে মজার একটি ঘটনা বলছি। আপনার বন্ধু মরহুম মীর সাহেবের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—যার সাথে দিলাওয়ার জানের সম্পর্ক ছিল। তিনি যে কিছুটা কবি ছিলেন তাও আপনার মনে থাকার কথা। তার প্রমোদের অংশ হিসেবে তিনি সৌন্দর্যের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন এবং শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বাঈজিদের তিনি জানতেন। অত্যন্ত রুচিবান মানুষ ছিলেন তিনি। শ্রদ্ধাভাজন ও বিদ্বান মৌলভী সাহেবের সঙ্গে ঘটনাটি যখন ঘটে তখন মীর সাহেব বিসমিল্লাহ জানের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। বিসমিল্লাহ জান মায়ের সাথে ঝগড়া করে কাপড় পট্টির পিছনে নিজেই একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল।"

"তার বাড়িতে আমার কখনো যাওয়া হয়নি।"

"আপনার কথা আমি বিশ্বাস করছি। আমি প্রায়ই সেখানে যেতাম বিসমিল্লাহ জানের সাথে দেখা করতে এবং মা ও মেয়েকে আবার একত্রিত করার চেষ্টা করতাম। এক সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটলো। বিসমিল্লাহ জান উঠানে একটি জলচৌকির ওপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসেছিল আপনার বন্ধু মীর সাহেবের সাথে। শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব হাঁটু মুড়ে তাদের সামনে নিচে বসে জলপাই রং এর পাথরের গুটি দিয়ে গাথা তসবি গুনছিলেন আঙ্গুলে আর বিড় বিড় করে উচ্চারণ করছিলেন, 'ইয়া হাফিজ, ইয়া হাফিজ।' তাকে বিধ্বস্ত চেহারার মনে হচ্ছিল। বিসমিল্লাহ জান আমার কানে কানে বললো, "তুমি কি একটা তামাশা দেখবে?"

"কেমন তামাশা?" বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করি।

"তুমি শুধু দেখে যাও।"

আঙ্গিনায় একটি পুরনো নিম গাছ ছিল। বিসমিল্লাহ জান মৌলভী সাহেবকে নির্দেশ দিল সেই গাছে উঠতে। দরবেশতূল্য লোকটির চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি কাঁপতে লাগলেন। এ ধরণের অপকর্ম আমাকে অবাক করলো। মীর সাহেব তার মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলেন। বেচারী মৌলভী সাহেব প্রথমে আকাশের পানে এবং পরে বিসমিল্লাহ জানের দিকে তাকালেন। চূড়ান্ত আদেশ দেয়ার মতো সে আবার বললো, "গাছে উঠুন, আমি বলছি।"

মৌলভী সাহেব 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণ করে উঠলেন এবং তার দীর্ঘ পিরহান খুললেন। গাছটির পাশে পৌঁছে বিসমিল্লাহ'র দিকে ফিরলেন। সে ভ্রুকুটি করে 'হু' শব্দ করলো। মৌলভী সাহেব তার পাজামা গুটিয়ে গাছে উঠতে শুরু করলেন। একটু উঠে আবার তিনি বিসমিল্লাহ জানের দিকে ফিরলেন এটা বুঝতে যে তার আরোহণ যথেষ্ট হয়েছে কিনা।

"আরো ওপরে উঠুন," বিসমিল্লাহ আদেশ দিল।

মৌলভী সাহেব আরো খানিকটা উঠে নির্দেশের অপেক্ষায় থাকলেন। "আরো ওপরে", বিসমিল্লাহ বার বার বলছিল বৃদ্ধ লোকটি গাছের প্রায় মগডালে না উঠা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

ওপরের দিকের ডালগুলি এতো সরু যে তিনি যদি আর একটু ওপরে উঠেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি পড়ে যাবেন এবং তার আত্মা তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যাবে। বিসমিল্লাহ জান আবার উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল, "আরো উঠুন', আমি তার পায়ে পড়লাম। মীর সাহেব ও আমি বিসমিল্লাহ জানকে অনুরোধ করলাম মৌলভী সাহেবকে নেমে আসার জন্যে বলতে। মৌলভী সাহেব, কোন ভাবে গাছে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু গাছ থেকে নেমে আসা তার জন্যে কঠিন হয়ে পড়লো, এবং বেশ ক'বার ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। দীর্ঘ চেষ্টায় তিনি মাটিতে নেমে এলেন এবং তাও কোন হাড় না ভাঙ্গা অবস্থায়। কিন্তু তার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল, ঘেমে তার শরীর ভিজে গিয়েছিল এবং মনে হচ্ছিল তিনি মাটিতে পড়ে যাবেন। অনেক চেষ্টায় তিনি নিজেকে স্থির করতে সক্ষম হলেন এবং তার কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা পড়লেন। পিরহানটি গায়ে চড়িয়ে আবার তিনি তসবি ঘুরাতে শুরু করলেন আগের জায়গায় বসে।

মাটিতে বসে পড়লেও তাকে অত্যন্ত অস্থির মনে হচ্ছিল। পবিত্র লোকটির পাজামার মধ্যে পিঁপড়া ঢুকে পড়েছিল।

"আল্লাহর কসম, আসল হাসি ঠাট্টায় দেখছি বিসমিল্লাহ জান ওস্তাদ, মির্জা রুসওয়া হেসে উঠলেন।

"এ ধরণের একটি ঘটনাকে হাসি ঠাট্টা বলা যেতে পারে না। ওই হৃদয়হীন সৃষ্টি কোন প্রকার আবেগ না দেখিয়ে বসেছিল বরং বসে বসে হাসছিল সে।

যন্ত্রণার কোন ধরণই নিঃশেষ্ট থাকে না,
আমার প্রেমের পরীক্ষা নিয়ে
উপভোগ করে আমার যন্ত্রণাকে।"

"এই প্রবচনটি দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্যে কাউকে হাসাতে যথেষ্ট। কিন্তু কাউকে দৃশ্যটি উপলব্ধি করতে হবে। তুমি যখন কথা বলছো, আমি তখন তোমাকে, মীর সাহেব, বিসমিল্লাহ জান ও মৌলভী সাহেবকে দেখতে পাচ্ছি নিম গাছসহ আঙ্গিনা। যেন আমি একটি ছবি দেখছি। আসলে দৃশ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে হাসি উদ্রেক করার মতো নয়। আমাকে এর কৌতূকের দৃশ্যটি ভাবতে দাও। না, মোহতারিমা, এর মধ্যে আমি হাসির কিছু দেখছি না। হতচ্ছাড়া মৌলভীর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে। বিসমিল্লাহ জান নিঃসন্দেহে মেয়েরূপী একটি শয়তান, যে সত্তর বছর বয়সের কে বৃদ্ধকে গাছে উঠার হুকুম দিতে পারে। আর একজন বৃদ্ধ মানুষ সে আদেশ পালন করে! এ ধরণের জটিল অবস্থা আমি বুঝতে পারছি না।"

"ব্যাপারটা যে আপনার কাছে প্রতারণামূলক মনে হচ্ছে তা আমি বুঝতে পারছি। কারণ এর পটভূমি আপনি জানেন না। তাই না, তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে বলতেই হয়।

"এটা থাকুক। আর কোন কেলেংকারীর ঘটনা আছে?"

আরো কিছু বলার ছিল। মৌলভী সাহেব চলে যাওয়ার পর আমার বান্ধবীকে বললাম, "তোমার ওপর কিসে ভর করেছে বিসমিল্লাহ? বুড়ো লোকটি যদি গাছ থেকে পড়ে যেতেন, তাহলে অকারণে একটি জীবন হারাতো।"

www.pathagar.com

"তার জীবনের থোড়াই তোয়াক্কা করি আমি," ছিনালী ঢং এ বললো সে।

"এই বিরক্তিকর বৃদ্ধ নিয়ে আমি হয়রান হয়ে গেছি। গতকাল সে আমার ধান্নোকে এমন জোরে আছাড় মেরেছে বেচারীর সব হাড্ডি ভেঙ্গে গেছে।"

ধান্নো বিসমিল্লাহ জানের পোষা বানরী, যাকে সে সদ্য বিবাহিতা বধূর মতো করে রাখে। ধান্নোকে ব্রোকেডের স্কার্ট এবং নেটের ওড়নাসহ এমব্রয়ডারী করা ব্লাউজ পরিয়ে রাখা হতো। বানরীটির জন্যে ছিল সোনার কানের দুল, গলার হার, রূপার চুড়ি এবং পায়ে ঘুঙুর। পছন্দমতো খাবার খাওয়ানো হতো তাকে। যখন সেটিকে কেনা হয়েছিল তখন ছিল ছোট হাড় জিরজিরে বাচ্চা। দু'তিন বছর ভালোভাবে থাকার পর বানরীটি বেশ নাদুসনুদুস হয়ে পড়ে। ধান্নোকে যারা চিনতো তারা তাকে ভয় করতো না, কিন্তু অচেনা লোকের জন্য ছিল রীতিমতো আতংক। এতো শক্তিশালী ছিল সে যে মোটামুটি শক্ত সমর্থ লোকও তার খপ্পরে পড়লে হাত ছাড়িয়ে নিতে পারতো না।

মৌলভী সাহেবকে যেদিন নিম গাছে উঠতে বাধ্য করা হয় তার আগের দিন তিনি বিসমিল্লাহ জানের বাড়িতে এসেছিলেন। চুপচাপ চৌকিতে বসেছিলেন তিনি। বিসমিল্লাহ জান কিছু তামাশা করার জন্যে ধান্নোকে শিখিয়ে দেয় পিছন দিক থেকে মৌলভী সাহেবের কাঁধের ওপর লাফিয়ে উঠতে। মৌলভী সাহেব পিছন দিকে ফিরেই চমকে উঠেন এবং ভয়ে বানরকে কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলেন। ধান্নো চৌকি থেকে পড়ে গিয়ে মৌলভী সাহেবের দিকে তাকিয়ে দাঁত মুখ খিচাতে থাকে। মৌলভী সাহেব তার লাঠি উঁচাতেই ধান্নো তার মালকিনের কোলে আশ্রয় নেয়। বিসমিল্লাহ জান বানরীকে আশ্রয় দিয়ে ওড়না দিয়ে সেটিকে ঢেকে রাখে। এরপর সে মৌলভী সাহেবের কাছে গিয়ে বানরীকে আদর করতে বলে এবং তাকে গালিগালাজও করে। কিন্তু গালি দিয়েও সে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। পরদিন সে এই শাস্তির কথা ভাবে।

"একটি বানরের প্রতি রুষ্ট হওয়ার উপযুক্ত চিন্তাই বটে," মির্জা রুসওয়া মন্তব্য করেন।

"কোন সন্দেহ নেই। বিসমিল্লাহ জান মৌলভী সাহেবকে কালো-মুখো খেলা বানরে পরিণত করেছিল।"

"মৌলভী তার উপযুক্ত প্রাপ্য পেয়েছেন। বিখ্যাত প্রেমিক মজনু তার মাশুকা লাইলির কুকুরকে পর্যন্ত চুম্বন করেছিল বলে শোনা যায়। আমাদের মৌলভী সাহেব শুধু তার প্রেমিকার আদরের বানরীকেই ঝেড়ে ফেলেননি, বরং তার ছড়ি দেখিয়ে হুমকি দেয়ার মাধ্যমেও অসম্মান প্রদর্শন করেছেন। রমণী সেবা শর্তের পথ থেকে বহু দূরে ছিল তার আচরণ।"

একদিন সন্ধ্যা ৮টার দিকে, আমি বিসমিল্লাহ জানের কামরায় ছিলাম। সে গান গাইছিল। আমি তানপুরা বাজাচ্ছিলাম, আর খলিফাজি তবলায় বোল তুলছিলেন। শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেবের আবির্ভাব ঘটলো তখন।

www.pathagar.com

তাকে দেখেই বিসমিল্লাহ জান গান থামিয়ে বললো, "গত আট দিন ধরে কোথায় ছিলেন আপনি?"

"কি উত্তর দেব আমি?" মৌলভী সাহেব কোনমতে বললেন। "আমি তো ভাবতেও পারিনি যে আমাকে এই যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আমার তো কাজ ছিল শুধু তোমাকে দেখা। এই চিন্তা আমার মধ্যে কিছু জীবনের সঞ্চার করেছে।"

"আপনি নিশ্চয়ই মিলনের আনন্দে উপনীত হয়েছিলেন," বিসমিল্লাহ জান দ্ব্যর্থবোধক প্রশ্ন করলো। মৌলভী সাহেব কিছু মনে করলেন বলে মনে হলো না। "জি হ্যা, মোহতারিমা," তিনি উত্তর দিলেন। "সেটিই হয়তো সর্বোত্তম উপায় ছিল, কিন্তু আমার মৃত্যুতে কি লাভ হতো তোমার?"

"আমি আপনার ওরস শরীফে প্রতি বছর গিয়ে নেচে গিয়ে হাজারো লোক সমাগম করতে পারতাম। আপনার খ্যাতির আলো ছড়িয়ে দিতে পারতাম।"

এই সুরে কিছু কথাবার্তার পর বিসমিল্লাহ জান আবার তার গান শুরু করলো। ওই পরিস্থিতিতে যে কথাগুলো উপযুক্ত সেগুলোই গাইলো সে :

"মরণ শয্যায়ও আমি মৃত্যুর কথা ভাবি না
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তার পথ ভাবি।"

মৌলভী সাহেব ভাবাবেশের পরিস্থিতিতে ছিলেন। তার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে তার পবিত্র দাড়ি বেয়ে পড়ছিল। সহসা সামনের দরজা খুলে গেল এবং মাঝারি উচ্চতার গাট্টাগোট্টা শরীরের কালো দাড়ি বিশিষ্ট গোলমাল চেহারার এক লোক প্রবেশ করলো। তার গায়ের রং কালো এবং সূচিকর্ম করা আটসাট মসলিনের আলখেল্লা পরনে, পাজামা ঢোলা, মাথায় বাঁধা মখমলের চাদর। বিসমিল্লাহ জান তাকে দেখেই বলে উঠলো : "হুজুর, আপনি : এভাবেই কি আপনি আপনার শপথ রক্ষা করেন? এতোদিন পর এখানে আসার সাহস কি করে হলো আপনার। আর লাল কাপড়ের গাঁইটগুলো কোথায়? সে কারণেই কি আপনি আপনার মুখ লুকাচ্ছেন?"

"জি না, মোহতারিমা, সে কারণে নয়," অনুনয়ের কাতরতা নিয়ে লোকটি উত্তর দিল। "আসলে আমার কোন সময় ছিল না। আমার আব্বা হুজুর অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, আর আমি তার সেবায় ব্যস্ত ছিলাম।

"এখনই আমি জানতে পারলাম যে, আপনি কতোটা কর্তব্যপরায়ণ পুত্র," বিসমিল্লাহ জান বিদ্রুপ করে বললো। "আপনার চিন্তার চাইতেও বেশী জানি আমি। আপনি কেন স্বীকার করছেন না যে, বব্বনের ছোট্ট নোংরা মেয়ে লোকটির প্রতি আপনার টান এবং প্রতি সন্ধ্যায় আপনি তার কাছে যান। আর এখানে এসে আপনি বলছেন আপনার আব্বাজানের অসুস্থতার কথা।"

আগন্তুকের কণ্ঠ মৌলভী সাহেব শুনেছেন। তাকে দেখার জন্যে তিনি পিছনে ফিরলেন। মুহূর্তের জন্যে দু'জনের চোখ মিলিত হলো এবং মৌলভী সাহেব সাথে সাথে

www.pathagar.com

মুখ ফিরিয়ে আনলেন। আগন্তুকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং হাত পা কাঁপতে লাগলো। লোকটি দরজার দিকে গিয়ে দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বিসমিল্লাহ জান তাকে কয়েকবার ডাকলেও তার আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

তরুণ লোকটির এহেন আচরণে বিসমিল্লাহ জানের মধ্যে একটু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সে কিছু বলেনি। অতঃপর সে ভুরু কুঁচকে জোরে বলে উঠলো, "কে পরোয়া করে!" আবার গানে ফিরে গেল সে।

সেদিনের পর আমি আর কখনো ওই তরুণকে বিসমিল্লাহ জানের ওখানে দেখিনি। কিন্তু মৌলভী সাহেব তার কাছে আসতেন।

"তখনকার দিনগুলোতে লোকজন আসলেই তাদের মতো অবিচলিত ছিলেন।"

একদিন বিসমিল্লাহ জান গাইছিল। মৌলভী সাহেব সেখানে উপস্থিত। আমি সেখানে থাকতে পারি অনুমান করে গওহর মির্জাও কামরায় প্রবেশ করে। বিসমিল্লাহ জান এবং সে পরস্পর ঠাট্টা মস্করা করতে পছন্দ করতো। বন্ধু সুলভ গালিগালাজ এবং কিছুটা রগড়ে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পরিচিত ছিল। এতে আমি কিছু মনে করতাম না।

গওহর মির্জা বসলো আমার ও বিসমিল্লাহ জানের মাঝখানে এবং বিসমিল্লাহ জানের কাঁধের ওপর হাত রাখলো। "চমৎকার গাইছো তুমি, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আজ আমি তোমাকে.....।"

মৌলভী সাহেবের কপালের ভাঁজ রাগে কাঁপতে শুরু করেছিল। গওহর মির্জার চোখ মৌলভী সাহেবের ওপর পড়তেই সে বৃদ্ধ লোকটির মুখ সতর্কতার সাথে পরখ করতে শুরু করলো। এরপর নিজের কান ধরে পিছনের দিকে কাঁত হয়ে পড়লো, যেন সে ভয় পেয়েছে। এ দৃশ্যে বিসমিল্লাহ জান হাসিতে ফেটে পড়লো। তবলাবাদকও হেসে ফেললো। আমি রুমাল দিয়ে মুখ ঢাকলাম। মৌলভী সাহেবের চেহারা, রাগে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। তিনি চলে যাওয়ার উপক্রম করতেই বিসমিল্লাহ জান বাধা দিল, "বসুন।" বেচারী যেখানে বসা ছিল সেখানেই বসে রইলো। বিসমিল্লাহ জান মৌলভী সাহেবকে এমন একটি ধারণা দিতে চাইলো যে গওহর মির্জাও তার প্রেমিকদের একজন। তার মধ্যে ঈর্ষা জাগানোর ইচ্ছা ছিল তার। গওহরের সাথে সে হাসি মস্করা করতে লাগলো এবং মৌলভী সাহেবকে উদ্বেগের মধ্যে রাখলো। বেচারী বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তিনি অঙ্গারে পুড়ছেন। হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। মৌলভী সাহেবের জন্যে আমার দুঃখ হলো। গওহর মির্জাকে বললাম, "যথেষ্ট হয়েছে তোমার বাঁদরামি। চলো, এখন যাই।" মৌলভী সাহেব উপলব্ধি করলেন যে, গওহর মির্জা আমার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বিসমিল্লাহ জানের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আনন্দের সাথে তিনি হাসলেন। বিসমিল্লাহ আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলো।

"আমি ধরে নিচ্ছি যে মৌলভী সাহেবের প্রেম অত্যন্ত খাঁটি।"

"অবশ্যই খাঁটি প্রেম।"

www.pathagar.com

"অতএব, তার ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়।"

"তুমি কি বিশ্বাস করো যে, খাঁটি প্রেমের মধ্যে ঈর্ষার কোন স্থান নেই? কিন্তু আমি নিশ্চিত যে আছে।"

"তাহলে সে প্রেমকে খাঁটি বলা যায় না।"

"আমি মৌলভী সাহেবের প্রেমকে খাঁটি ভেবেছিলাম। কিন্তু কে জানে তার হৃদয়ে কি ছিল?"

খানুমের মহলের মেয়েগুলোর চেহারা সুন্দর ছিল। তাদের মধ্যে খুরশীদ ছিল তুলনাহীন। দুধে আলতা রং-এ পরীর মতো ছিল তার চেহারা। তার মুখ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য এতোটাই নিখুঁত ছিল, মনে হতো সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে তাকে গড়েছেন। তার হাত ও পা ছিল কোমল তুলতুলে। তার চোখ আসল মুক্তার মতো জ্বলজ্বল করতো। তাছাড়া সে জানতো যে কি করে পোশাক পরিধান করতে হয়, কারণ সে যে জামাকাপড় পরতো মনে হতো সেগুলো তার জন্যেই বিশেষভাবে ডিজাইন করা। সবসময় হাসিখুশী থাকতো এবং তার ব্যবহার এতো মধুর ছিল যে কেউ একবার তার দিকে তাকালে বিহ্বল হয়ে পড়তো। সে যখন কোন কামরায় প্রবেশ করতো মনে হতো সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। সব পুরুষের দৃষ্টি পড়তো তার ওপর এবং অন্যান্য বাঈজিদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করতো তারা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সে অতি দুর্ভাগা মেয়ে ছিল। কেউ সকল দোষ তার গ্রহের ফের বলে চালিয়ে দিতে পারে না। যদিও সে নিজের ওপর অনেক দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছিল। আল্লাহ তাকে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছিলেন, শোভন আচরণে সমৃদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু পাশাপাশি প্রেমের আকাংখায় তাকে পূর্ণ করেছিলেন।

তার প্রথম প্রেমিক ছিল পিয়ারে সাহেব। তিনি খুরশীদের ওপর হাজার হাজার টাকা ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্যে জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। খুরশীদ তার প্রেম সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই শুধু তার প্রেমে পড়লো। বহুদিন পর্যন্ত তার ক্ষুধা ছিল না। পিয়ারে সাহেবের আগমণে বিলম্ব হলেই কান্নাকাটি শুরু করে দিতো এবং সান্ত্বনা পেতেও অস্বীকৃতি জানাতো। আমরা তাকে সতর্ক করতাম, "পুরুষ মানুষ বিশ্বাসহীন। তোমাদের দু'জনের মধ্যে শুধু সম্পর্ক হয়েছে এবং দ্রুত সরে যাওয়া বালির ওপর প্রতিষ্ঠিত এ ধরণের সম্পর্ক। তুমি তো কোন কসম কাটোনি, তুমি তো তাকে বিয়ে করোনি। তার ওপর যদি হৃদয় দিয়ে বসে থাকো তাহলে নিজের মস্ত ক্ষতি করবে তুমি এবং এজন্যে পস্তাবে।"

আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হলো। পিয়ারে সাহেব যখন উপলব্ধি করলেন যে, মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছে তখন তিনি গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরতে লাগলেন। কখনো তিনি চব্বিশ ঘন্টা তার সাথে কাটান। আবার কখনো দিনের পর দিন তিনি আর তাকে দেখাও দেন না।

অতঃপর বেচারী খুরশীদের জীবন সরু একটি তারের ওপর ঝুলে রইলো। সে কাঁদতো, নিজেকে প্রহার করতো এবং খেতো না।

www.pathagar.com

খুরশীদকে নিয়ে খানুমের বড় আশা ছিল। খুরশীদের মধ্যে যদি বেশ্যার সামান্য গুণও থাকতো তাহলে লাখো লোকের মনে দাগ কাটতে পারতো। কিন্তু বেচারীর শুধু রূপই ছিল।

খুরশীদ গাইতে পারতো না এবং তাল মিলিয়ে নাচতেও পারতো না। শুরুর দিকে সে বহু আমন্ত্রণ পেয়েছে। কিন্তু যখন জানাজানি হলো যে নাচ গান সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই, তখন লোকজন তাকে আর ডাকতো না। যারা শুধু তার চেহারা দেখে আকৃষ্ট হতো—বিশেষ করে শহরের কিছু অভিজাত লোক-তারা তাকে দেখতে আসতো। তাদেরকেও হতাশ হতে হতো। সবসময় সে যেনতেন পোশাক পরতো, কারণ প্রেমে আচ্ছন্ন থাকতো সে। তার নিরাসক্ত ভাব ভদ্রলোকের পছন্দ হতো না, অতএব তারা কেটে পড়তো। শুধু পিয়ারে সাহেবই রয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বিপরীত মোড় নিল। পিয়ারে সাহেবের পিতা রাজরোষের শিকারে পরিণত হয়ে তার বাড়ি হারালেন, তার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হলো এবং তার পরিবার সর্বশান্ত হয়ে গেল। তা সত্ত্বেও পিয়ারে সাহেবের জন্যে খুরশীদের ভালোবাসায় কোন ভাটা পড়েনি। বরং সে পিয়ারে সাহেবকে অনুরোধ করলো তাকে বাড়ি নিয়ে তার রক্ষিতা হিসেবে রাখতে। পরিবারের কথা বিবেচনা করে অথবা পিতার ভয়ে পিয়ারে সাহেব তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে খুরশীদের আশা ভরসা খানখান হয়ে গেল।

অল্পে বিশ্বাস করার মতো মেয়ে ছিল খুরশীদ এবং সে কারণে অনেকে তাকে প্রতারণা করে বহু অর্থ হাত করে নিয়েছে। পীর ফকিরদের ওপর তার প্রচুর আস্থা ছিল। একদিন এক ফকির আমাদের বাড়িতে আসে যে ব্যক্তি কোন একটি জিনিসকে দু'টিতে পরিণত করতে পারে বলে দাবি করতো। খুরশীদ ফকিরকে তা একজোড়া বালা দেয়। পবিত্র লোকটি বালা দু'টি তার পাত্রে রেখে তার ওপর কিছু কালো রং এর বীজ রেখে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেয়। একটি লাল কাপড় দিয়ে ঢাকনাসহ পাত্রটির মুখ লাল ফিতা দিয়ে বেঁধে খুরশীদকে নির্দেশ দেয় সে যাতে পরদিন সকালের আগে পাত্রের মুখ না খুলে। লোকটি তাকে আশ্বস্ত করে যে তার মহান গুরু তাকে যে শক্তি দিয়েছেন তার গুণেই বালার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পরদিন সকালে সে যখন পাত্রটি খুললো, তখন কালো বীজগুলো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

আরেকদিন এক যোগী এসে তার মুখ থেকে ফনা তোলা একটি গোখরা সাপ টেনে বের করে। সে খুরশীদকে বলে যে, দু'দিন পর সাপ তাকে দংশন করবে। খুরশীদ তার কানের দুল, নাক ফুল খুলে যোগীকে অর্পণ করে তাকে অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেয়ার জন্যে।

খুরশীদ কখনো তার মেজাজ খারাপ করতো না। কোন ভদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এমন চমৎকার মেজাজের মহিলা পাওয়া মুশকিল। একটি মাত্র ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে যখন সে একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। পিয়ারে সাহেব তার

www.pathagar.com

বিয়েতে যে পোশাক পরবেন তা দেখাতে এনেছিলেন খুরশীদকে। খুরশীদ পোশাকটি দেখে চুপচাপ মুখ গোমড়া করে। ক্রমে তার মুখের রং লাল বর্ণ ধারণ করতে থাকে এবং একসময় সে জ্বলে উঠে। সে উঠে দাঁড়ায় এবং পিয়ারে সাহেবের পরিহিত পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এরপর কাঁদতে শুরু করে সে এবং দু'দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল তার কান্না। তার দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেল এবং ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন যে তার যক্ষ্মা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে দু'মাস পর তার অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে।

খুরশীদ যদিও পিয়ারে সাহেবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়ে অন্য লোকদের গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু যে কারো সাথে যেতে তার আপত্তি ছিল। এবং এ কারণে অন্যেরাও তাকে আর মেনে নিতে পারতো না। যখন সে লোকদের সঙ্গে বিনোদনে ব্যস্ত থাকতো, তার মন পড়ে থাকতো অন্যত্র এবং তার আচরণে কোন সঙ্গতি পাওয়া যেতো না।

তখন বর্ষা মওসুম। সারা সকাল বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ইতোমধ্যে মেঘ কেটে গেছে এবং শহরের বাড়ীগুলোর উঁচু দেয়ালে বিকেলের রোদ পড়েছে। পেঁজা পেঁজা মেঘ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং পশ্চিম দিগন্তে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র রং এর।

চক এলাকায় ক্রমে ভিড় দেখা যাচ্ছে, কারণ শহরের ভদ্রলোকেরা আমাদের কোঠার দিকে পথ করে নিচ্ছে। দিনটি যেহেতু শুক্রবার ছিল, বহু লোক আইশবাগের মেলার দিকেও যাচ্ছিল।

খুরশীদ, আমির জান, বিসমিল্লাহ জান ও আমি মেলায় যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। রজব আমাদের উজ্জ্বল সবুজ রং করা ওড়নাগুলো সবে এনেছে, পরিচারিকারা সেগুলো ভাঁজ করতে ব্যস্ত। আমাদের চুল আঁচড়ে বেণী পাঁকানো হচ্ছে। গহনার বাক্স থেকে সোনা ও রূপার গহনা বের করা হচ্ছে। খানুম একটি সোফায় হেলান দিয়ে বসে দীর্ঘ হুক্কার দীর্ঘ নল টানতে টানতে দৃশ্যগুলো দেখছেন। মীর সাহেব তাকে মেলায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে চেষ্টা করলেও, কিন্তু তিনি প্রতিবাদ করছেন যে, তিনি এখন মেলায় যাওয়ার উপযুক্ত নন। আমরা শুধু নিরবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছিলাম যে তিনি যাতে তাকে মেলায় যাওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং আমরা আসলেই ভালো সময় কাটাতে পারি।

খুরশীদকে খুব চমৎকার দেখাচ্ছিল। সবুজ মসলিনের ওড়নার মাঝখানে তার ফর্সা মুখ বেরিয়ে আছে। আটসাট ব্লাউজে তার স্তন চমৎকার ভাবে দৃশ্যমান। কিছু অলংকার পড়েছে সে; একটি হীরার নাক ফুল, কানে সোনার রিং, মুক্তার মালা ও ব্রেসলেট। তার কামরায় বড় আয়নার সে নিজেকে দেখছিল। তার সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত। আমার যদি তার মতো সুন্দর মুখ থাকতো, তাহলে আয়নায় প্রতিবিম্বিত আমার চেহারার ওপর থেকে আমার ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিকে সরিয়ে নিতে হতো। কিন্তু খুরশীদের মন খারাপ, কারণ সে মনে করছে যে তার দিকে কেউ তাকিয়ে দেখছে না। যাদের সুন্দর চেহারা তারা তো অবশ্যই

www.pathagar.com

সুন্দর, এমনকি মন খারাপ সত্ত্বেও খুরশীদকে সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল কেউ এখনই কোন কবিকে দুঃখপূর্ণ একটি কবিতা আউড়াতে শুনেছে, যা কারো হৃদয়ের জটাজানে আটকা পড়েছে। পরীর মতো সুন্দরী খুরশীদের দুঃখপূর্ণ সৌন্দর্যও তেমনি ছিল।

বিসমিল্লাহ জানও দেখতে খুব খারাপ ছিল না। তার গায়ের রং বাদামি রং এর বড় আকৃতির মুখ, খাড়া নাক, বড় আয়ত চোখ। তার দেহ শীর্ণাকৃতির। এমব্রয়ডারি করা কামিজ, হলুদ রং এর সালোয়ার, গাঢ় সবুজ ওড়না পড়েছে সে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত দামী সব অলংকার তার সব অঙ্গে। চুলের খোপায় জড়িয়েছে ফুলের মালা। তাকে মুধচন্দ্রিমায় যেতে প্রস্তুত বধূর মতো লাগছে। গা ভরা তার ঢলঢলে লাবণ্য। মেলায় সে লোকদের ভেংচি কাটলো, পুরুষদের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো এবং তাদের কারো তির্যক দৃষ্টি দেখে ঢং করে সে ভিন্ন দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

মেলায় এতো ভিড় যে কেউ যদি ওপরের দিকে একটি প্লেট ছুঁড়ে দেয় তাহলে সেটি মাটিতে পড়তে পারবে না মানুষের মাথা ভেদ করে। মেলায় খেলনা ও মিষ্টির দোকান। শুকনা ফলের ফেরিওয়ালা, মালা তৈরিকারক, পান বিক্রেতা মহিলা, হুকা বরদার এবং অন্যান্য পণ্যের দোকানী। মানুষের মুখ দেখায় আমার বেশী আগ্রহ। উৎসব ও উচ্ছলতার বাধাহীন এমন পরিবেশে লোকজন নিজেদের প্রকাশ করে এবং কেউ সহজে বলতে পারে যে তারা কি সুখী না অসুখী, দরিদ্র না ধনী, বজ্জাত না ভদ্র, শিক্ষিত না মূর্খ, সদ্বংশজাত না নিচু বংশের, উদার না কৃপণ। একটি লোক তার মসলিনের পিরহান, নীল বন্ধনী, সূচালো টুপি, মখমলের জুতা দেখাচ্ছিল। আরেকজন মাথায় রঙিন রুমাল বেঁধেছে এবং লাম্পট্যপূর্ণ দৃষ্টিতে বাঈজিদের পানে তাকাচ্ছে। একটি লোককে দেখা গেল সে মেলায় এলেও ভুলে গেছে যে সে কোথায় এবং ক্রুদ্ধভাবে নিজের সাথে কথা বলছে। মনে হচ্ছিল যেন সে স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে এসেছে এবং বাড়িতে যা বলতে পারেনি তা মেলায় বলছে। আরেকজনকে দেখা গেল একটি শিশুসহ যার সাথে সে কথা বলছে। তার প্রতিটি বাক্যে 'আম্মি' শব্দটি থাকছে। আম্মি নিশ্চয়ই রান্না করছেন, আম্মির শরীর ভালো নেই, আম্মি ঘুমাচ্ছেন, আম্মি জেগে আছেন। দুষ্টুমি করো না, তাহলে আম্মি ডাক্তারের কাছে চলে যাবেন। আর এই লোকটি কাঁধে তুলে এনেছে তার সাত বছরের কন্যাকে। লাল টকটকে রং এর জামা তার পরনে এবং বেণীতে বাঁধা লাল ফিতা। তার নাকে ছোট্ট একটি রিং এবং দু'হাতে রূপার চুড়ি। তার বাবা হাত দু'টি ধরে রেখেছে। যাতে কেউ হাত থেকে চুড়ি খুলে নিতে না পারে। তার হাতে ব্যথা লাগলেও বাবা কোন খেয়াল করছে না। বাবার এটা কখনো মনেও হয়নি যে মেলায় আনার জন্যে মেয়েটিকে চুড়ি পরানো ঠিক হয়নি।

আরেক ধরণের লোক মেলায় এসেছে তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে নিয়ে। অশ্লীল ভাষায় কথা বলছিল তারা এবং পরস্পর গালিগালাজ বিনিময় করে নিজেদের পরিচিতি ব্যক্ত করছিল। "কিরে দোস্ত, একটা পান খেলে কেমন হয়?" বলে একজন পানওয়ালার

www.pathagar.com

দিকে একটি পয়সা ছুঁড়ে দিল যেন ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিচ্ছে। বিত্তশালী লোকের সব নিশানা তার মধ্যে পরিস্ফুট, দু'এক পয়সা তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। সে হুকা বরদারকে হাঁক দেয়, "ভাই সাকি, এদিকে এসো, হুকা কি প্রস্তুত?" আরেক বন্ধু তাদের সাথে যোগ দেয়। একে অন্যের প্রতি গালি ছুঁড়ে তারা এবং এরপর শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর পরস্পরের শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেয়। "এই যে মিয়া, একটা পানের জন্য কতোক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখবে আমাকে?" সমাবেশটি ভালো, একজন মুসলিম, আরেকজন হিন্দু, যে মুসলিমের স্পর্শ করা কোনকিছু খায় না। পানওয়ালার কাছ থেকে মুসলিম লোকটি পান ছিনিয়ে নিয়ে বলে, "বুড়ো মিয়া, মাফ করে দিও, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।" হিন্দু লোকটিকে বোকা বোকা মনে হলো। সে কোমর থেকে আরেকটি বের করে বলে, "এই যে ভাই, এলাচ দানা দিয়ে আমাকে আরেকটি দাও। চুন বেশী দিও না।" মুসলিম বন্ধুর দিকে ফিরে সে বলে, "তুমি অন্ততঃ আমার ধূমপান সহ্য করবে।" সে হুকার নলে মুখ লাগাতে যাচ্ছিল, যাতে তাকে মুসলিম কারো ব্যবহৃত নলে মুখ লাগাতে না হয়। হুকা বরদার দৃষ্টি কঠোর করে। বেচারী হিন্দু লোকটি এক হাতে পয়সা বের করে, আরেক হাতে নল ধরে থাকে।

গওহর মির্জা মুক্তা হ্রদের পাশে আমাদের বসার ব্যবস্থা করেছিল। মেলায় ঘুরে এবং গাছপালার মধ্য দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে কাটালাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। পালকির কাছে এসে দেখলাম যে খুরশীদ জানের পালকি শূন্য। আমরা তার কোন খোঁজ না পেয়ে বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরলাম। খবরটি শোনা মাত্র খানুম মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করলো। পুরো বাড়িতে শোকের ছায়া। তার খোঁজে পিয়ারে সাহেবের বাড়িতে একজন লোককে পাঠানো হলো। লোকটি দ্রুত ফিরে এলো। কারণ পিয়ারে সাহেব হাজার বার কসম কেটেছেন যে, খুরশীদের কোন খবর তিনি জানেন না। তিনি মেলায় পর্যন্ত যাননি। কারণ তার স্ত্রী অসুস্থ এবং তাকে ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তার ওপর সন্দেহের আর কোন কারণ ছিল না। তিনি তার স্ত্রীর এতোটাই অধীনস্থ হয়ে পড়েছিলেন যে, চকে আসা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাকে এবং সন্ধ্যার পর বাইরে বের হতে দিতেন না। সম্ভবতঃ খুরশীদের সাথে পুরনো প্রেমের কারণে খানুম পিয়ারে সাহেবের কথা ভেবেছিলেন।

খুরশীদের নিরুদ্দেশ হওয়ার দেড় মাস পর কালো চেহারার শাল জড়ানো শুকনো এক লোক একদিন আমার ঘরে হাজির হলো। তার হাবভাব দেখে মনে হলো যে, বাঈজিদের বাড়ির রীতি রেওয়াজের সাথে লোকটি পরিচিত নয়। আমার ধারণা ভুল ছিল না। শিগগিরই আমি বুঝতে পারলাম যে, শহরের গুন্ডা বদমাশদের সাথে তার চলাফেরা। তখন আমি একা ছিলাম, অতএব হোসাইনী খালাকে ডাকলাম। খালা আসতেই সে উঠে দাঁড়াল এবং তার হাত ধরে ঘনিষ্টতর হলো। সে কি বলেছে তার সামান্যই আমার কানে এসেছে। হোসাইনী খালা খানুমের সাথে দেখা করতে গেল। যখন সে ফিরে এলো, তখন লোকটির সাথে আবার কথা বলতে লাগলো। তার শেষ কথার মর্ম ছিল যে তাকে এক মাসের বেতন অগ্রিম দিতে হবে। লোকটি তার কোমরবন্ধ থেকে এক থলে রৌপ্য

www.pathagar.com

মুদ্রা বের করলো। হোসাইনী খালা তার কামিজের প্রান্ত উঁচু করে ধরলে সে মুদ্রাগুলো তার কোলে ঢেলে দিল। "এখানে কতো আছে?" খালা জানতে চাইলো।

"আমার জানা নেই। আপনি নিজে গুনে নি।"

"আমি মূর্খ। গুনতে জানি না আমি।"

" আমার মনে হয়, এখানে পঁচাত্তর টাকা আছে। কিছু কম বেশীও হতে পারে।"

"জনাব, পঁচাত্তর কি?" হোসাইনী খালা প্রশ্ন করেন।

"তিন কুড়ি পনের টাকা। পঁচিশ টাকা কম একশ'।"

"একশ থেকে পঁচিশ টাকা কম। এটা ক'দিনের জন্যে।"

"পনের দিন। বাকী পনের দিনের টাকা আমি কাল দেব। তাহলে আমি যে সেবা পাব তার বিনিময়ে আপনি মোট দেড়শ' টাকা পাবেন।"

লোকটির কথাবার্তা আমার ভালো লাগলো না। আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম যে, সে অতি সাধারণ গোছে। কিন্তু আমার পছন্দের কোন মূল্য ছিল না, কারণ আমি বাঈজি, তাও আরেক মহিলার অধীনে।

হোসাইনী খালা টাকা নিয়ে খানুমের কাছে গেলেন। আমি জানি না তার মনের অবস্থা কি ছিল। সাথে সাথে তিনি টাকাগুলো গ্রহণ করেন। অর্থের প্রশ্নে তিনি অতি বিত্তবান অভিজাতকেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম যে, তাকে পরে বাকী টাকা দেয়া হবে, এই আশ্বাস তিনি মেনে নিয়েছিলেন।

লোকটি সে রাত আমার কামরায় কাটালো। ভোর হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে আমার নিচের দরজায় কাউকে টোকা দিতে শুনলাম। সাথে সাথে জেগে উঠে সে বললো, "আমাকে এখনই যেতে হবে। কাল সন্ধ্যায় আবার আমি আসবো।" সে আমাকে পাঁচটি সোনার আশরফী এবং তিনটি আংটি দিল; একটি আংটিতে রুবি, আরেকটিতে নীলকান্ত মণি ও তৃতীয়টিতে হীরা বসানো। খানুমকে কিছু না বলে আমাকেই উপহারগুলো রাখতে বললো সে। আমি অত্যন্ত পুলকিত হয়ে তাকে প্রীত করার জন্যে আংটিগুলো আঙ্গুলে পরলাম। খুবই চমৎকার সেগুলো। এরপর আশরফী ও আংটি আমার গহনার বাক্সের গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাখলাম।

পরের দিন সন্ধ্যায় আমি যখন গানের রেয়াজ করছিলাম তখন আবার লোকটির আবির্ভাব ঘটলো। রেয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো এবং ওস্তাদ ও যন্ত্রীদের পাঁচ টাকা বখশিশ দিল। ওস্তাদ ও সারেঙ্গী বাদক তাকে তোষামুদ শুরু করলো। ওস্তাদের দৃষ্টি পড়েছিল লোকটির গায়ের শালটির উপর। অনেক চাটু বাক্যের পর তিনি লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে শালটি চেয়ে বসলেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

"আপনি আমার কাছে অর্থ বা অন্য কিছু চাইতে পারেন, কিন্তু এই শাল আমি দেব না। এটি আমার এক বন্ধুর দেয়া উপহার," লোকটি দৃঢ়তার সাথে বললো। ওস্তাদ হতাশায় চুপ করে রইলেন।

www.pathagar.com

অবশিষ্ট পঁচাত্তর টাকা লোকটি গুনে গুনে হোসাইনী খালার হাতে দিয়ে তাকে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা বখশিশও দিল। আমরা দু'জন যখন কামরায় একা তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে সে কোথায় আমাকে প্রথম দেখে আমার কাছে আসার জন্যে আগ্রহী হয়েছে।

"দু'মাস আগে আইশ বাগের মেলায়।"

"সিদ্ধান্ত নিতে আপনার দু'মাস সময় লাগলো?"

"আমাকে শহরের বাইরে চলে যেতে হয়েছিল এবং আবার হয়তো কিছুদিনের জন্যে যেতে হবে।" আমি একজন বেশ্যার মতোই তার সাথে প্রেমের অভিনয় করার সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রণয়ের ভান করে বললাম, "আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেন?"

"খুব বেশী দিনের জন্যে নয়। শিগগিরই ফিরে আসবো আমি।"

"আপনি কোথায় থাকেন?"

"আমার বাড়ি ফররুখাবাদে। কিন্তু এখানে আমার বেশ কিছু ব্যবসা আছে এবং লক্ষ্ণৌতেই অধিকাংশ সময় কাটাই। কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাই, আবার ফিরে আসি।"

"এই শালটি কার স্মৃতি?"

"ওহ, এটি। তেমন বিশেষ কারো নয়।"

"আমি জানি, এটি আপনার প্রেমিকার।"

"তোমার মাথার কসম কেটে বলছি, আমার কোন প্রেমিকা নেই। তুমিই আমার সব।"

"তাহলে এটি আমাকে দিন।"

"না, আমি তোমাকে এটি দিতে পারি না।"

লোকটি দেখলো যে তার কথায় আমার মন খারাপ হয়েছে। বড় বড় মুক্তা ও এমারেল্ড বসানো একটি কণ্ঠহার, হীরাখচিত দু'টি বালা, দু'টি সোনার আংটি আমার সামনে রাখলো সে। কেমন খটকা লাগার মতো ব্যাপার যে সে আমাকে কোন চিন্তাভাবনা না করেই হাজার টাকা মূল্যের জিনিস দিতে প্রস্তুত, কিন্তু শালটিকে নিজের কাছ ছাড়া করতে রাজী নয়, যার মূল্য কিছুতেই পাঁচশ টাকার বেশী হতে পারে না। আমি শালের কারণে তাকে খুব বিরক্ত করতে চাইনি। অতএব আমি নিজের কাছে মনোযোগী হতে এবং বেশী কৌতূহলী না হতেই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার গহনার বাক্সে নতুন গহনাগুলোও লুকিয়ে রাখলাম। আমি আনন্দে উচ্ছসিত।

ভদ্রলোকের নাম ফৈয়াজ আলী। সে গভীর রাতে আসে এবং ভোরে চলে যায়। এক মাস বা আরো কিছুটা বেশী সময়ের যখন লোকটি আমার সাথে রাত যাপন করেছে, তখনই আমি দরজায় টোকা দেয়ার বা বাঁশীর আওয়াজ শুনেছি, যা তার জন্যে জেগে উঠার ও চলে যাওয়ার সংকেত ছিল। এ সময়ে সে আমাকে এতো সোনা ও মূল্যবান

www.pathagar.com

পাথরখচিত গহনা দিয়েছে যে আমার গহনার বাক্সটি ভরে গিয়েছিল। এসব ছাড়াও সে আমাকে অনেকগুলো সোনার আশরফী ও রৌপ্য মুদ্রাও দিয়েছিল, যা আমি কখনো গুনতে পারিনি। দশ টাকা বারো হাজার টাকার গহনা জড়ো হয়েছিল আমার কাছে, যেগুলোর ব্যাপারে খানুম বা হোসাইনী খালার কোন ধারণাই ছিল না।

ফৈয়াজ আলীর ব্যাপারে যদিও আমার বিশেষ কোন খেয়াল ছিল না, তার প্রতি কোনরূপ বিরূপতাও প্রদর্শন করিনি কখনো। তাকে অপছন্দ করার কোন কারণ ছিল না আমার। সে কুৎসিৎ নয়, বরং তার উদারতার মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ আছে। কিছুদিন পর আমিই তার আগমন প্রতীক্ষা করতাম এবং সে না আসা পর্যন্ত আমার চোখ দরজার দিকে নিবদ্ধ থাকতো। গওহর মির্জা দিনের বেলায় আসতো এবং যারা সন্ধ্যায় আমার কাছে আসতো শিগগিরই তাদেরও ধারনা হলো যে আমার সেবা বিশেষ একজনের জন্যে নির্ধারিত। তারা আগেভাগে চলে যেত অথবা আমি কোনভাবে তাদের থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতাম।

ফৈয়াজ আলী আমার অনুরাগী হয়ে পড়েছিল এবং নানাভাবে তার ভালোবাসা প্রকাশ করতো। আমি যদি প্রথমে গওহর মির্জাকে না জানতাম তাহলে আমি অবশ্যই তার প্রেমে পড়তাম। তবুও আমি যে তাকে আসলেই ভালোবাসি এমন ভান করে তাকে সুখী রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম আমি। আমি যা বলতাম সবই সে বিশ্বাস করতো এবং আমার মায়াজালে সে ধরা পড়লো। সে আমাকে যে জিনিসগুলো গোপনে দিয়েছিল সে সম্পর্কে টু শব্দটি পর্যন্ত করিনি কারো কাছে। কখনো কখনো হোসাইনী খালা ও খানুম তাদের উপহারের জন্যে আমাকে বলতে বাধ্য করতো। সে তাদেরকেও দিতো, যেন কোন পবিত্র দায়িত্ব পালন করছে। কারণ অর্থ তার কাছে কোন ব্যাপার ছিল না। আমি বহু বিত্তবান ও শাহজাদাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু তাকে ছাড়া আর কাউকে এমন মুক্ত হস্ত দেখিনি।

"তা হবে না কেন! অনুপার্জিত সম্পত্তি দুশমনের মতো, যা কেউ পছন্দ করে না। তার মতো বিরাট হৃদয়ের চাইতে তার সম্পদকে অপছন্দ করার কোন কারণ থাকতে পারে না।"

"আপনি কেন বলছেন যে সেই অর্থ উপার্জিত নয়?"

"তুমি কি মনে করো যে সে তোমাকে দেয়ার জন্যে তার আম্মার গহনাগুলো নিয়েছে?"

সন্ধ্যায় যারা আমার কাছে আসতো তাদের মধ্যে পান্নামল নামে এক স্বর্ণকার ছিল যে, এক বা দু'ঘন্টা আমার কাছে থাকতো। সে শুধু সঙ্গটুকুই চাইতো, তার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়া হলে অন্য লোকের উপস্থিতিতে সে কিছু মনে করতো না। প্রতি মাসে সে আমাকে দু'শ টাকা দিতো এবং উপহার প্রদানেও উদার ছিল। যে সময়ের মধ্যে ফৈয়াজ আলীর সঙ্গে আমার মাখামাখি চলছিল, তখন অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকের মতো আমার কাছে তার আগমনও কমে যায়। প্রতিদিন আসার পরিবর্তে প্রতি দুই বা তৃতীয়

www.pathagar.com

দিনে আসতে লাগলো এবং এরপর টানা পনের দিন এলো না। যখন এলো তখন সে যেন দুর্দশার প্রতিচ্ছবি। তার সাথে কথা বললেই শুধু সে বলে এবং এরপর চুপ করে থাকে। তার কাছে জানতে চাই যে কি ঘটেছে।

"তুমি কিছুই শোনোনি?" সে বলে।

"কি শুনবো!"

"আমাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে। বংশ পরম্পরায় অর্জিত সম্পদ একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমরা ধ্বংস হয়ে গেছি।"

"ডাকাতি!" বিস্ময়ে আমি বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াই। "কি পরিমাণ সম্পদহানি হয়েছে?"

"দুই লাখ টাকার অলংকার ও মণিমুক্তা। সব গেছে, কিছুই আর নেই।"

আমি মনে মনে হাসলাম। কারণ তার পিতা চান্না মল কোটিপতি বলে খ্যাত। দুই লাখ টাকা নিঃসন্দেহে বিরাট অংক। কিন্তু চান্না মলের জন্যে কিছুই নয়। চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ এনে সহানুভূতি জানালাম।

"গত কয়েক দিনে শহরে অনেকগুলো চুরির ঘটনা ঘটেছে," দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে সে বললো।

"বেগম মালিকা আলমের মহলে চুরি হলো। এরপরের ঘটনা ঘটলো লালা হরপ্রসাদের বাড়িতে। খুবই কেলেংকারীর ঘটনা। আমি জানতে পেরেছি যে বাইরে থেকে একদল চোর শহরে এসেছে। কোতোয়ালও পেরেশানীতে পড়েছেন। শহরের সব দাগী আসামীকে তিনি গ্রেফতার করেও কোন তথ্য বের করতে পারেননি তাদের কাছ থেকে। তারা নিজেদের কান ধরে কিরে কেটেছে যে এ কাজ তাদের নয়।"

পরদিন আমি আমার রুমে বসেছিলাম। তখনই চকের দিকে শোরগোল শুনলাম। উঠে পর্দার আড়ালে দাঁড়ালাম। বহুলোক উত্তেজিতভাবে কথা বলছে।

"শেষ পর্যন্ত সে তাহলে ধরা পড়লো।"

"সব কৃতিত্ব কোতোয়াল সাহেবের। সব পুলিশ কর্মকর্তার তার মতো হওয়া উচিত।"

"কোন কিছু কি উদ্ধার করা গেছে?"

"বেশ কিছু পাওয়া গেলেও বেশীর ভাগই পাওয়া যায়নি।"

"ফইজু কি পাকড়াও হয়েছে?"

"হ্যাঁ, ওই যে সে।"

মানুষের ভিড়ের মধ্যে পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত হাতকড়া পরিহিত ফইজুকে দেখতে পেলাম। একটি কাপড় দিয়ে সে মুখ ঢেকে রেখেছে।

www.pathagar.com

নিয়মমাফিক ফৈয়াজ আলী সন্ধ্যার কয়েক ঘন্টা পর এলো, যখন অন্যেরা বিদায় নিয়েছে।

"আমি শহরের বাইরে যাচ্ছি এবং আগামী পরশু ফিরে আসবো।" ঘরে প্রবেশ করেই বললো সে এবং উদ্বেগ প্রকাশ করলো, "উমরাও জান, শোনো। আমি যেসব জিনিস তোমাকে দিয়েছি সে সম্পর্কে কাউকে জানতে দিও না। সেগুলোর কোনটাই হোসাইনীকে দিও না অথবা খানুমকে দেখিও না। এগুলো একদিন কাজে লাগবে।" একটু থেমে আমার হাত ধরে নিয়ে প্রশ্ন করলো : "তুমি কি কয়েক দিনের জন্যে আমার সাথে বাইরে যেতে পারো?"

"আপনি তো ভালো করেই জানেন যে, আমি নিজে আমার মালিক নই।" আমি উত্তর দিলাম।" এ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন খানুম। আপনি তাকে বলুন , তিনি রাজী হলে আমার আপত্তির কি থাকতে পারে?"

"একথা তো সত্য যে তোমাদের লোকজন অত্যন্ত বিশ্বাসহীন। তোমার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি, আর তুমি এমন শুকনোভাবে আমার কথার জবাব দিচ্ছো। ঠিক আছে, হোসাইনী খালাকে ডাকো।"

আমি হোসাইনী খালাকে ডেকে আনলে সে বললো, "আমি কি ক'দিনের জন্যে ওকে বাইরে নিয়ে যেতে পারি?"

"কোথায়?"

"ফররুখাবাদে। আমি সম্পদশালী লোক। ফররুখাবাদে আমার বিশাল ভূসম্পত্তি আছে এবং সেখানে ক'মাস কাটাতে যাই। মোহতারিমা রাজী হলে আমি দু'মাসের টাকা অগ্রিম দিতে চাই এবং তিনি চাইলে আরো বেশী দিতে পারি।"

"আমার মনে হয় না যে খানুম রাজী হবেন," হোসাইনী খালা সন্দিগ্ধভাবে বললো। " মেহেরবানী করে আপনি তার কাছ থেকে জেনে আসুন।"

হোসাইনী খালা খানুমের কাছে গেল।

ফৈয়াজ আলী আমার প্রতি এতো সদয় ছিল যে আমি যদি আমার মালিক হতাম তাহলে তার সাথে যেতে কোন দ্বিধাই করতাম না। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, লোক লক্ষ্ণৌতে আমার প্রতি এতো উদার হতে পারে, সে তার নিজ শহরে আমার যে কোন আকাংখা অবশ্যই পূরণ করবে। আমর মনে এসব ঘুরপাক খাচ্ছিল তখনই হোসাইনী খালা ফিরে এলো। সোজাসাপ্টা অস্বীকৃতি –কোন শর্তেই মহল ছেড়ে আমার যাওয়ার অনুমতি মিলবে না।

"তার ভাতা আমি দ্বিগুণ করে দেব।"

"চার গুণ করলেও না," হোসাইনী খালা উত্তর দিল। "আমাদের মেয়েদেরকে আমরা এই আঙ্গিনা পেরুতে দেই না।"

"তাহলে তাই হোক.....।"

www.pathagar.com

হোসাইনী খালা তার কামরায় ফিরে গেল। চোখ তুলে দেখলাম, ফৈয়াজ আলীর মুখ অশ্রুতে ভেজা। কিছু প্রেমিকা কিভাবে তাদের প্রেমিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমি যখন সেসব কাহিনী পড়েছি তখন নিজে কাতর অনুভব করে তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছি। আমার মনে হলো যে, ফৈয়াজ আলীর পাশে যদি আমি না দাড়াই তাহলে তার সাথে অনেকটা অমন আচরণই করা হবে এবং আমার বিশ্বাসহীনতা ও অকৃতজ্ঞতা নিয়ে আর দু'টি মতামত থাকবে না। আমি তার সিদ্ধান্ত বানচাল হতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

"আমি আপনার সাথে যাব," দৃঢ়তার সাথে আমি বললাম।

"তুমি যাবে!" বিস্মিত হয়ে সে বললো।

"হ্যাঁ, ওরা পছন্দ করুক, আর না করুক, আমি আপনার সাথে অবশ্যই যাব।"

"কিভাবে?"

"আমি চুপচাপ কেটে পড়বো।"

"আমি পরশু দিন খুব ভোরে তোমাকে নিতে আসবো। আমাকে হতাশ করো না।"

"আমি নিজের ইচ্ছায় যেতে রাজী হয়েছি। আপনি দেখতে পাবেন যে কিভাবে আমি আমার কথা রক্ষা করি।"

ভোর হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে ফৈয়াজ আলী আমাকে ছেড়ে গেল। সে চলে যাওয়ার পর আমি মনে মনে যুক্তিতর্ক দিতে শুরু করলাম ঃ আমি তাকে কথা দিয়েছি, আমি কি আসলেই কথা রাখতে পারবো? আমার সিদ্ধান্ত কি পাল্টানো উচিত? যখন ফৈয়াজ আলীর প্রেম ও আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভাবলাম, আমর হৃদয় বললো, "তোমাকে অবশ্যই যেতে হবে।" একই সময়ে একটি শব্দ যেন আমার কানে সারাক্ষণ বাজছিল!" যেও না! যেও না। তুমি জানো না যে তুমি কি করতে যাচ্ছো।" আমার সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যেই ভোর হলো। সেই প্রশ্ন ভাবতে ভাবতে আমার সারাটা দিন কাটলো। সৌভাগ্যবশতঃ সে রাতে কেউ আমার কাছে আসেনি এবং আমি আমার সমস্যা নিয়ে সম্পূর্ণ একা ছিলাম। এক সময়ে আমার চোখে ঘুম এলো। গওহর মির্জা যখন আমাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছিল তখনো আমি অর্ধ ঘুমে। তার ওপর আমি ক্রুদ্ধ হলাম। আমার মাথা ভারী বোধ হচ্ছিল। আমি জানি না যে, হোসাইনী খালার সাথে আমার কেন বিবাদ হয়েছিল। ওহ্ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। এক জায়গায় গান গাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল এবং হোসাইনী খালা জানতে চেয়েছিল যে আমি যাব কিনা। আমি মুখের উপর অস্বীকার করায় খালা আমার ওপর রেগে গেল, "তুমি সব সময় 'না' বলছো। তাহলে আর এই পেশায় থাকার অর্থ কি?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি যাব না।" খালা বললো, "তোমাকে যেতেই হবে। তারা বিশেষভাবে তোমাকেই চেয়েছে এবং খানুম কথা দিয়েছেন। অগ্রিমও নিয়েছেন তিনি।" আমি বললাম, "খালা , আমি যাব না। ওদের টাকা ফেরত দিয়ে দিন।"

www.pathagar.com

"তুমি ভালো করেই জানো যে, খানুম একবার টাকা নিলে কখনো ফিরিয়ে দেন না," হোসাইনী খালা বললো।

"কেউ যদি সুস্থ বোধ না করে, তাহলেও? খানুম যদি টাকা ফিরিয়ে দিতে না চান তাহলে আমি ফেরত দেব। নিজের গাঁট থেকে দেব আমি।"

"ওহ্ হো!" হোসাইনী খালা বিদ্রূপের ঢং এ বললো। "আজকাল তাহলে তোমার অনেক টাকা হয়েছে। ঠিক আছে, আমাকে টাকাটা দাও।"

"কতো টাকা?"

"একশ' টাকা।" টাকার জন্যে সে অপেক্ষা করলো। একমাত্র আল্লাহই জানেন যে, সেদিন কেন সে এতোটা একরোখা হয়ে গিয়েছিল। আমি বেপরোয়ার মতো বললাম, "খালা তুমি কি তুচ্ছ টাকাটাই চাও, না আমার জীবনটাও চাও?"

"তোমার কাজে নগদ টাকা থাকলে এখনই আমাকে দাও।"

"সন্ধ্যার মধ্যে আমি তোমাকে দেব।"

"ওই লোকগুলো অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা থাকবে না।"

হোসাইনী খালা ধারণা করছিল যে আমার কাছে কোন টাকা নেই এবং সে যদি এভাবে আমার সাথে পীড়াপীড়ি করতে থাকে তাহলে আমি হাল ছেড়ে দিয়ে আমন্ত্রণ কবুল করবো। আমার বাক্সে এক হাজার বা দেড় হাজার টাকা মূল্যের সোনার আশরফী ছিল, গহনা ছাড়াই। তার সামনে বাক্স খোলা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেনি।

"এখন আমাকে মেহেরবানি করে একা থাকতে দাও। এক ঘন্টা পর এসো।"

"এক ঘন্টার মধ্যে কি কোন জ্বিন এসে তোমাকে টাকা দিয়ে যাবে?"

"হ্যাঁ তাই দিয়ে যাবে। এখন যাও, আমাকে বিরক্ত করো না। আমার শরীর ভালো লাগছে না।"

"তোমার কি হয়েছে? আমাকে খুলে বলছো না কেন?"

"আমার জ্বর জ্বর লাগছে এবং মাথা ব্যথাও প্রচন্ড।"

হোসাইনী খালা আমার কপালে হাত রাখলো, তোমার তো আসলেই জ্বর, কেমন ফ্যাকাসে লাগছে চেহারা। কিন্তু দাওয়াতটা পরশু দিনের জন্য। আল্লাহ করুন তার আগে যাতে তুমি সুস্থ হয়ে উঠো। আমরা টাকা ফেরত দিতে যাব কেন?"

আমি আর কিছু বলার আগেই সে চলে গেল। পরের ব্যাপারে তার নাক গলাবার মানসিকতা আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে এবং একটি দুষ্ট চিন্তা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করলো। নিজেকে বললাম, "এই লোকগুলো আমার অসুস্থতার মধ্যেও যদি আমার কোন কিছুর পরোয়া না করে এবং শুধু নিজেদের স্বার্থটাই দেখে তাহলে তাদের সাথে বসবাস করার কোন অর্থ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

খানুমের বাড়ি চকের এক বিচ্ছিন্ন কোণায়, এর পশ্চিম দিকে বাজার। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বিশিষ্ট বাঈজি বিবিজান ও হোসাইনী বান্দীর কামরা। পিছনের দিকে মীর হাসান আলীর অভ্যর্থনা কক্ষ। এখানে কোন দিক থেকেই কোন চোরের প্রবেশের সুযোগ ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনজন নৈশপ্রহরী ছিল ছাদের ওপরে অবস্থান করে চারদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য। যখন থেকে ফৈয়াজ আলী আমার কাছে আসতে আরম্ভ করে, তখন মাক্কা নামে একজন প্রহরীকে বিশেষভাবে আমার দরজায় মোতায়েন করা হয়েছিল। সে রাতে ফৈয়াজ আলীকে ভিতরে প্রবেশ করাতো এবং দিনের আলো ফুটে উঠার আগেই তাকে বের হওয়ার জন্যে দরজা খুলে আবার বন্ধ করে তালাবদ্ধ করে দিতো।

ফৈয়াজ আলী তার কথা মতো সন্ধ্যায় এলো। কিছু সময়ের জন্য আমরা আমাদের পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা আলোচনা করলাম ফিসফিস করে। মাক্কা তখন হাই তুলে শরীর ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। ফৈয়াজ আলী তাকে ভিতরে ডেকে বললো, আমি তোমাকে আগে কখনো কিছু দেই নি। এই নাও একটি টাকা। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তুমি চলে যাও। আমরা জেগেই থাকবো। কোন ভয় নেই"

মাক্কা সালাম দিয়ে বের হয়ে গেল। ফৈয়াজ আলী বললো, "এখনই উপযুক্ত সময়, চলো বের হয়ে যাই।" একটি পুটলিতে দুই প্রস্থ কাপড় নিয়ে আমার গহনার বাক্স বের করলাম। এগুলো বগল তলায় নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলাম পা টিপে টিপে। অপেক্ষমান গরুর গাড়ীতে উঠে আমাদের পথে চললাম। একটু দূরে ফৈয়াজ আলীর সহিস ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ফৈয়াজ আলী ঘোড়ার পিঠে উঠে গরুর গাড়ীর পাশাপাশি চললো। সকালের মধ্যে আমরা মোহনলাল গঞ্জে পৌঁছে একটি সরাইখানায় পৌঁছলাম এবং বিকেল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলাম।

পরদিন আমরা এলাম বায়বেরেলিতে। সেখানে আমি কাপড় পাল্টে লক্ষ্ণৌ থেকে পরে আসা কাপড় পুটুলিতে রাখলাম। লক্ষ্ণৌ থেকে আনা গরুর গাড়ী ছেড়ে দিয়ে নতুন গাড়ী ভাড়া করলাম। আমরা রায়বেরেলি থেকে দশ মাইল দূরের লালগঞ্জের পথ ধরলাম। সন্ধ্যায় লালগঞ্জে পৌঁছে সেখানে একটি সরাইখানায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ফৈয়াজ আলী খাবার কিনতে গেলে আমি পাশের কক্ষে অবস্থানরত মহিলার সাথে কথাবার্তা বললাম। মহিলা স্থানীয় বেশ্যা, নাম নাসিবান। সুন্দর তার বেশবাস এবং বেশ কিছু গহনাও পরেছে। যদিও তার ভাষা গ্রাম্য, কিন্তু নিজেকে ভালোভাবেই প্রকাশ করতে সক্ষম। আমি কোত্থেকে এসেছি তা জানতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে তার প্রশ্নের শুরু। তাকে বললাম আমি ফৈজাবাদের । "আমার বোন পিয়ারা ফৈজাবাদে থাকে, তুমি নিশ্চয়ই তাকে জানো।' সে বললো।

আমার মনে হলো যে সে আমার পেশা সম্পর্কে ধারণা করে ফেলেছে। "আমি কি করে তাকে চিনবো?" আমি বললাম।

"ফৈজাবাদে এমন কোন মাগী নেই যে তাকে চিনে না।"

www.pathagar.com

"আমি দীর্ঘদিন যাবত উনার সাথে লক্ষ্ণৌতে বাস করছি।" ফৈয়াজ আলীর উল্লেখ করে আমি বললাম।

"তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি, ফৈজাবাদে তোমার জন্ম হয়েছে।"

তার কথা পুরোপুরি সঠিক । আমি শুধু বলতে পারলাম। "আমি সেখানে জন্মেছি, কিন্তু শৈশব থেকে ফৈজাবাদ থেকে দূরে ছিলাম আমি।"

"তুমি কি ফৈজাবাদের কাউকেই জানো না।?"

"একজন লোককেও না।"

"এখানে এসেছো কেন?"

"উনার সাথে এসেছি।"

"কোথায় যাবে তোমরা?"

"উন্নাও।"

"তোমরা তাহলে ঘোরাপথ বেছে নিয়েছো কেন? তোমাদের উচিত ছিল নরপতগঞ্জ হয়ে উন্নাও যাওয়া।"

"উনার কিছু কাজ ছিল রায়বেরেলিতে।"

"তোমরা যে পথে যাচ্ছো , সেটি বিপজ্জনক রাস্তা," নাসিবান সতর্ক করলো।

"ডাকাতির ভয়ে সে পথে লোকজন খুব একটা চলাচল করে না। তাছাড়া রাস্তার একটি অংশ পুলিয়ার জলার মধ্য দিয়ে, যেখানে শত শত পথচারী লুণ্ঠিত হয়েছে। তোমাদের তিনজন লোকের মধ্যে তুমি তো মহিলা। তার ওপর গহনা পরা। যে ডাকাতরা বড় বড় বরযাত্রীদলকে পর্যন্ত লুটে নেয় সেখানে দু'জন পুরুষ মানুষ কি করতে পারবে?"

"আমরা ভাগ্যের উপর নিজেদের ছেড়ে দিয়েছি।"

"তুমি সাহসী মেয়ে।"

"এছাড়া আমার আর উপায় কি?"

ছোটখাট বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। সে কোথায় যাচ্ছে আমি তা জানতে চাইলে তার উত্তর আমাকে বিস্মিত করে, "আমি আমার পথে ঘুরছি"

"আমি তোমার কথা বুঝতে পারিনি।"

"পথে ঘোরা মানে বুঝো না তুমি? তুমি তাহলে কেমন বেশ্যা?"

"আমি কি করে জানবো বোন ! ভিক্ষুকরাই শুধু পথে পথে ঘুরে বলে জানি।"

"আমাদের দুশমনরা ভিক্ষা করুক," জোরে হেসে উঠে সে বলে। এরপর কিছুটা করুণ কণ্ঠে বলে, "এর মধ্যে আসল সত্য হচ্ছে একজন বেশ্যাও ভিক্ষুকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই–যদিও একজন বেশ্যা অনেক আরাম আয়েশে থাকতে পারে।"

"তুমি ঠিকই বলেছো। আমি 'পথে ঘোরার মতো কোন কিছু শুনিনি। সেজন্যে প্রথমে বুঝতে পারিনি।"

www.pathagar.com

নাসিবান ব্যাখ্যা করলো, "বছরে একবার আমরা আমাদের কোঠা ছেড়ে, গ্রামে গ্রামে যাই এবং ধনী জমিদারদের বাড়িতে কাটাই। তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ী আমাদের দেয়। তাদের অনেকে নাচগানে উৎসাহী। অনেকে এসবে আগ্রহী নয়।" "বুঝতে পারছি। এখানে তোমার ধনী আমন্ত্রণকারীটা কে?"

"আমি রাজা শম্ভু ধ্যান সিং এর কাছে গিয়েছিলাম, এখান থেকে কিছু পথ দূরে তার একটি দূর্গ আছে। তিনি একটি রাজ আদেশ পেয়েছে পথের রাহাজানি দূর করার জন্যে, সেজন্য তাকে হঠাৎ করেই এখান থেকে যেতে হয়েছে। আমি বেশ ক'দিন অপেক্ষা করে শেষে বিরক্ত হয়ে চলে এসেছি। কাল আমি এখান থেকে দুই ক্রোশ দূরে সামারিহায় আমার খালার বাড়ি যাব। ওই গ্রামটি বেশ্যাদেরই গ্রাম।"

"ওখান থেকে পরে কোথায় যাবে?"

"রাজা সাহেব ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি খালার সাথেই থাকবো। এরপর তার দূর্গে ফিরে যাব। তার ফিরে আসার অপেক্ষায় অনেক নাচিয়ে গাইয়ে সেখানে আছে।"

"রাজা সাহেব কি নাচগানের প্রতি খুব আগ্রহী?"

"তাইতো ছিলেন।"

"এখন কি হয়েছে?"

"তিনি লক্ষ্ণৌ থেকে একটি বেশ্যাকে আনার পর আমাদের মতো লোকদের ওপর থেকে তার সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।"

"কে সে?"

"তার নাম আমার মনে নেই। মেয়েটি খুব ফর্সা, মুখটিও অত্যন্ত সুন্দর। একহারা গড়নের।"

"নিশ্চয়ই সে খুব ভালো গান গায়।"

"একেবারে বাজে। একটা লাইনও গাইতে পারে না। তবে সামান্য নাচতে পারে। রাজা সাহেব তার মধ্যে একেবারে মজে গেছেন।"

"রাজা সাহেবের সাথে ক'দিন ধরে আছে সে?"

"ছ'মাস বা তার কাছাকাছি সময় হবে।"

আমার মনে সন্দেহের উদয় হলো যে লক্ষ্ণৌর এই বেশ্যা কে হতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলাম না। রাতে ফৈয়াজ আলীকে বললাম নাসিবান রাস্তার ব্যাপারে সে কথাগুলো বলেছিল। সে আমাকে এ নিয়ে উদ্বিগ্ন না হতে বললো। কারণ সে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে।

আমরা যখন মোহনগঞ্জ ছাড়লাম তখনও অন্ধকার ছিল। নাসিবানের গরুর গাড়ী আমার ঠিক পিছনেই। অতএব আমরা কথা বলতে পারছিলাম। ফৈয়াজ আলী ঘোড়ার

www.pathagar.com

পিঠে ছিল। কিছুপর নাসিবান সামারিহার পথের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। রাস্তার পাশের জমিগুলোতে কিছু মহিলা পানি ছিটাচ্ছে। আবার কেউ কেউ জমির মাটি সমান করছে। এক মোটসোটা মহিলা একটি কূয়ার পাশে বদল ঘোরাচ্ছে। আর স্বামী পানি দিয়ে ভিশতি ভরছে। নাসিবান আমাকে বললো যে, এইসব মহিলারা সবাই বেশ্যা ছিল। আমি অবাক হলাম যে, তারা কেন এই পেশা গ্রহণ করেছিল এবং এখনো কঠিন কাজে লিপ্ত, যা পুরুষদের জন্যও সহজ কোন কাজ নয়। তাদেরকে মনোযোগ দিয়ে দেখে বুঝতে পারলাম যে কেন তারা এ কাজ করছে। তারা মহিষের রাখালদের চাইতেও কুৎসিৎ এবং গোবরের ঘুটে বিক্রেতা। সামারিহায় পৌছে নাসিবান চলে গেল।

সামারিহা থেকে দুই ক্রোশ চলার পর আমরা একটি নদীর ঢালুতে পৌছলাম। পথ অতি দুর্গম এবং গভীর নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। নদীর দুই তীরে বিশাল গাছপালার জঙ্গল। আমরা ছাড়া আর কোন লোক নেই। ফৈয়াজ আলী তার ঘোড়াকে আগে নিয়ে গেল এবং আমি তাকে থামাতে পারার আগেই দৃষ্টি সীমার আড়ালে চলে গেল। নদী পার হবার পর অন্য তীরে তাকে দেখা গেল। মন্থর গতির গরুর গাড়ীতে আমাকে রেখে সহিস মনিবকে অনুসরণ করলো।

আমি একদল দস্যুকে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে আসতে দেখলাম। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার। পিঠে বন্দুক। তাদের মশাল জ্বলছিল। গরুর গাড়ী ঘিরে ফেললো তারা।

"থামো! গাড়ীতে কে? দল নেতা জানতে চাইলো।

"গাড়ী থামাবো কেন? গরুর গাড়ীর চালক বললো, "সওয়ারী খান সাহেবের বাড়ির একজন ভদ্র মহিলা।"

"তার সাথে কি কোন পুরুষ মানুষ নেই?"

"লোকজন সামনের দিকে গেছে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।"

"মোহতারিমা, গাড়ী থেকে নেমে আসুন।" দলনেতা হুকুম দিল। আদেশ পালনের আগে দলের আরেক সদস্য রূঢ়ভাবে বললো, "পর্দা সরিয়ে ওই মাগীকে টেনে নামাও।" ওতো বেশ্যা, পর্দা টানিয়ে রাখার কি অধিকার আছে ওর?"

একজন গাড়ীর ছই এর পর্দা ছিড়ে ফেলে আমাকে নামতে আদেশ করলো। তিনজন আমাকে ঘিরে ধরলো। হঠাৎ নদীর দিক থেকে ধূলি উড়তে দেখা গেল এবং আমাদের দিকেই আসছিল ধূলির মেঘ। ঘোড়ার পদধ্বনিও শোনা গেল। ফৈয়াজ আলী একজন অশ্বারোহী নিয়ে ধেয়ে আসছিল। দস্যুরা সেদিকে ঘুরে একসাথে গুলী ছুড়লো। ফৈয়াজ আলীর দু'জন অশ্বারোহী মাটিতে ঢলে পড়লো। অন্যেরা তলোয়ার বের করে দস্যুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। অশ্বারোহী ও দস্যুদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হলো। ফৈয়াজ আলীর আরেকজন লোক আহত হয়েছে। দস্যুদের তিনজন ভূপাতিত হওয়ার পর অবশিষ্টরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো।

www.pathagar.com

আমি আবার গাড়ীতে উঠলাম। অশ্বারোহীদের ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে গরুর গাড়ীতে আমার পাশেই তুলে দেয়া হল। আবার আমাদের যাত্রা শুরু হলো। গাড়ীর দু'পাশে দু'জন করে অশ্বারোহী । অন্যেরা সামনে ও পিছনে। আমি ফৈয়াজ আলীকে বলতে শুনলাম, "ভাই ফজল, লক্ষ্ণৌ থেকে খুব কষ্টে আমি বের হয়ে আসতে পেরেছি। কোনমতে জীবনটা রক্ষা করেছি।"

"তুমি কেন স্বীকার করছো না যে, তুমি বেশ ভালো সময় কাটিয়েছো." ফজল বললো।

"আমি জানি, তুমি তাই বলবে।"

"আমার বলা উচিত ছিল না। কিন্তু তোমার সাথে তো আনন্দের শিকার আছেই। আমার নতুন ভাবীজির মুখটা এক নজর দেখতে দিও আমাকে।"

"তাতো বটেই। আনন্দের ব্যাপার হবে। তোমার সামনে সে অবশ্যই পর্দা করবে না।"

"আমরা আগে আমাদের গন্তব্যে পৌছি। আমাদের কাজ সমাপ্ত হলে আমি তাকে দেখবো।"

"আরেকটি নদীর কিনারায় পৌছলাম আমরা। অত্যন্ত খাড়া তীর । আমাকে গরুর গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে হলো। গাড়ী নদীর অপর তীরে নিতে আমাদের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে। গাড়ীতে এতো ঝাঁকুনি লেগেছে যে আহত লোকগুলো পট্টি পর্যন্ত খুলে রক্তে গাড়ীর পাটাতন ভিজে গিয়েছিল।

নদী অতিক্রম করে আমরা আবার আহত লোকদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। গাড়ীর রক্ত ধুয়ে সাফ করা হলো। আবার যখন যাত্রা শুরু হলো তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম। গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল জনহীন প্রান্তর দিয়ে। নদী থেকে প্রায় চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এক গ্রামের কাছে একটি ফলের বাগানে আমরা থামলাম। সামান্য দূরে কয়েকটি তাঁবু খাঁটানো হলো ঘোড়া তাঁবুর বাইরে। কিছু লোক রান্নায় লেগে গেল। অন্যেরা পায়চারি করছিল উদ্দেশ্যহীনভাবে। একজন এসে ফজলের কানে কিছু বললো। ফজলকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে দেখা গেল এবং সে ফৈয়াজ আলীর কাছে গেল। চাপা কণ্ঠে কথা বলছিল তারা। ফৈয়াজ আলী হঠাৎ উচু করে বলল, "সময় এলে আমরা দেখবো। প্রথমে আমরা খেয়ে নেই।"

"খাওয়ার সময় নেই আমাদের । এখনি এখান থেকে কেটে পড়তে হবে।"

"আমরা খাওয়া শেষ করবো। তাবু গুছিয়ে ঘোড়ায় জ্বিন বাঁধাবো, ফৈয়াজ আলী তাকে আশ্বস্ত করার সুরে বললো।

একটি আম গাছের নিজে গালিচা বিছানো হলো। অনেকগুলো চাপাতি ও সব্জি ডাল আনা হল সামনে। আমরা তিনজন, ফৈয়াজ আলী, ফজল ও আমি একত্রে বসে খেলাম। যদিও আমাদের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট, কিন্তু সবাই হাসছিল খেতে খেতে।

www.pathagar.com

আমাদের খাওয়া শেষ করার সময়ের মধ্যে তাবু গুটিয়ে গাধার পিঠে চাপানো হয়েছে এবং ঘোড়ার জ্বিন বাধা হয়েছে। যাত্রা শুরু হলো।

আমরা তিন ক্রোশ পথও অতিক্রম করিনি, আমরা বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লাম। আমাদের দল সেজন্যে প্রস্তুত ছিল এবং তারা পাল্টা গুলি চালালো। আমি ভীত হয়ে পড়েছিলাম এবং গাড়ীতেই অবস্থান করে দোয়া উচ্চারণ করছিলাম। একটু পর পর্দার একটি কোণা তুলে দেখতে চেষ্টা করলাম যে কি ঘটছে। দেখলাম চারদিকে আহত মানুষ পড়ে আছে। লোকজন পড়ে যাচ্ছে ও নিহত হচ্ছে। আমাদের দলে মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাটজন লোক ছিল। ধ্যান সিং এর সৈন্য সংখ্যা আমাদের সংখ্যার চাইতে অনেক বেশী এবং আমাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করলো। ফৈয়াজ আলী ও ফজল পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। যারা ছিল তারা আমার সাথে আটক হলো।

গরুর গাড়ীর চালক পাকড়াওকারীদের অনুনয় বিনয় করে মুক্তি নিয়ে নিল। আহত লোকগুলোকে সে গাড়ী থেকে নামিয়ে মাঠে ছড়িয়ে থাকা লাশের মধ্যে রেখে তারা নিজের জীবনটা নিয়ে কেটে পড়লো। বন্দীদের হাত পিছনে কষে বাঁধা হলো এবং তাদেরকে পাঁচ ক্রোশ দূরে দূর্গের দিকে যাত্রা করা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পরই রাজা সাহেবের সাক্ষাৎ মিললো। তিনি লোকজনসহ অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন। আমাদেরকে তার সামনে প্রদর্শন করা হলো। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, "এই মেয়েটিকে কি লক্ষ্ণৌ থেকে আনা হয়েছে?"

আমি দুই হাত যুক্ত করে কুর্ণিশ করলাম, "হুজুর, আমি আপনার মার্জনা ভিক্ষা করি। আপনি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে আমার অপরাধ দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে আমার কোন দোষ নেই। প্রতারণাপূর্ণ চরিত্র সম্পর্কে নারীদের অভিজ্ঞতা সামান্য। লোকটি সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।"

"কিছু না জানার ভান করো না" রাজা সাহেব ধমকের সুরে বললেন। তোমার অপরাধ প্রমাণিত। তোমাকে যে প্রশ্ন করা হয় তুমি সেগুলোর জবাব দাও।"

"আমি আপনার আদেশের অপেক্ষায় আছি, হুজুর।"

"তুমি লক্ষ্ণৌর কোথায় থাকো?"

"চকে।"

রাজা সাহেব মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ভাবলেন, এরপর তার লোকদের ডেকে নির্দেশ দিলেন, "পাশের গ্রাম থেকে একটি গরুর গাড়ি নিয়ে এসো। আমাদের স্থানীয় বেশ্যাদের মতো সে কষ্ট সহিষ্ণু নয়। এখানকার বেশ্যাগুলো তো সারারাত নেচে বিয়ের শোভাযাত্রার সাথে নাচতে নাচতে দশ ক্রোশ বা আরো বেশী দূরত্ব যেতে পারে। কিন্তু সে লক্ষ্ণৌর বাঈজী।"

"আল্লাহ আপনার মর্যাদা রক্ষা করুক," আমি বিস্মিত হয়ে বললাম।

www.pathagar.com

লোকগুলো একটি গরুর গাড়ী আনলে আমি গাড়ীতে উঠলাম। বন্দী লোকগুলো হাত বাঁধা অবস্থায় আগের মতোই গাড়ীর পাশাপাশি হেঁটে চললো। আমরা দূর্গে পৌছার পর বন্দীদেরকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়া হলো। আমাকে দূর্গ চত্তরে নিয়ে আমার কামরা দেখিয়ে দেয়া হলো। আমার হুকুম তামিলের জন্য দু'জন লোককে মোতায়েন করা হলো। আমাকে অত্যন্ত উপাদেয় খাবার পরিবেশন করা হলো–বিভিন্ন ধরনের পুরি, মিষ্টি ও নানা রকম আচার। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসার পর এই প্রথমবার আমি পেট পুরে খেলাম। পরদিন সকালে জানতে পারলাম যে বন্দীদের লক্ষ্ণৌ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আমাকে মুক্তি দেয়ার একটি নির্দেশও এসেছে। কিন্তু রাজা সাহেব তখনো আমাকে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেন নি। কিছু পরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তোমাকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ পেয়েছি। কিন্তু দুই বদমাশ ফৈয়াজ আলী ও তার বন্ধু ফজল পালালেও আমরা তাদের অবশিষ্ট সঙ্গীদের পাকড়াও করেছি। তারা লক্ষ্ণৌতে তাদের প্রাপ্য শাস্তি লাভ করবে। তোমার নির্দোষিতা সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে এ ধরনের লোকদের সাথে মেলামেশা করার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক না করে পারছি না। তোমার ইচ্ছা হলে তুমি কিছুদিন এখানে থাকতে পারো। আমরা তোমার গানের অনেক প্রশংসা শুনেছি।"

আমার মনে পড়লো যে রাজা সাহেবের অধীনে লক্ষ্ণৌর একজন বাঈজি আছে বলে নাসিবান আমাকে বলেছিল। নিশ্চয়ই সে আমার প্রশংসা করে থাকবে। "আমার গান সম্পর্কে হুজুরকে কে বলেছে? অজ্ঞতার ভান করে আমি জানতে চাইলাম।

"শিগ্‌গিরই তুমি দেখতে পাবে।"

লক্ষ্ণৌর সেই রহস্যময়ী বাঈজিকে তলব করা হলো। দেখা গেল সে সুন্দরী খুরশীদ জান। দৌড়ে এসে গভীর আলিঙ্গনে সে আমাকে আবদ্ধ করলো। আমরা দু'জনেই কেঁদে ফেললাম। রাজা সাহেবকে আমরা অসন্তুষ্ট করতে চাইনা। অতএব চট্টজলদি চোখের পানি মুছে শান্ত হয়ে বসলাম। তিনি সুর শিল্পীদের ডাকলেন। আমার মুক্তির নির্দেশের কথা শোনার পর আমি একটি কবিতা রচনা করেছিলাম। যে লাইনগুলো আমার মনে আছে আমি তা গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাজা সাহেব এবং উপস্থিত সকলে প্রতিটি লাইন উচ্চারণ করার সাথে সাথে প্রশংসা করছিলেন :

খাঁচার বাইরে পোষা গানের পাখির মতো
আমার বন্ধন টুটে গেছে,
যখন আমি আসলে বন্ধনকেই ভালোবেসেছি
আমার ভালোবাসা আমাকে ছেড়ে দিলেও
তার বেশী আমাকে আটকে রাখে।
পুরনো কায়দায় নিপীড়নে ক্লান্ত হয়ে
সে নিপীড়নের নতুন কৌশল খোঁজে,

www.pathagar.com

হায়, আমার ভৃত্য তূল্য প্রেম তাকে
অসন্তুষ্ট ছাড়া আর তো কিছু করেনি
আমি মুক্তি খোঁজে পেলেও এ মুক্তিতে
কোন আনন্দ নেই।
আমাকে যিনি বন্দী করেছেন তিনি এতো সদয়
যে আমার কোন যাতনা তিনি সইতে পারেন না।
আমাকে মুক্তি দেন যাতে আমার বিলাপ
তাকে শুনতে না হয়। শুধু জাগতিক দুঃখ নয়,
আরো হাজারো দুঃখ আছে
জীবনের জটাজালে আবদ্ধ হয়ে
মুক্তির আশা কেন করো?
সে নতুন বন্দী ধরে, আর ঈর্ষায় আমি জ্বলি,
আমি প্রেমের যন্ত্রণা ভালোবাসি
'আদা' প্রেমের কারাগার থেকে মুক্তি নেই
প্রেমের বন্দীরা স্বাধীনতার স্বাদ পায় না।

শেষ লাইনটা উচ্চারিত হওয়ার পর রাজা সাহেব জানতে চাইলেন যে, কার ছদ্ম নাম 'আদা'। খুরশীদ জান বললো, "এটি ওর নিজের রচনা।"

সন্তুষ্ট হলেন রাজা সাহেব। "আমরা আগে জানলে তো তোমাকে কখনো মুক্তি দিতাম না" তিনি বললেন।

"হুজুর নিশ্চয়ই আমার গান শুনে মনে করছেন যে, এখান থেকে বিদায় নিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এখন আপনি শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, আর আপনার অধম দাসী মুক্তি পেয়ে গেছে।"

মাহফিল শেষ হলো। রাজা সাহেব গোঁড়া হিন্দু, তিনি রান্নাঘরে গেলেন খেতে। খুরশীদ এবং আমি মন খুলে কথা বললাম। "দেখো বোন, তুমি আমার দোষ দিও না, সে ব্যাখ্যা করলো। "খানুম এবং রাজা সাহেবের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত খারাপ সম্পর্ক ছিল। রাজা সাহেব বেশ ক'বার আমাকে চেয়েছেন খানুমের কাছে। কিন্তু তিনি আমাকে যেতে দিতে সোজা অস্বীকার করেছেন। এরপর তিনি আইশবাগের মেলায় তার লোক পাঠান। তারা জোর করে আমাকে ধরে আনে। আমাকে অনেক যত্ন করা হয়েছে এবং বেশ আরাম আয়েশের মধ্যেই আমি বাস করছি।"

"কিন্তু কি করে তুমি এই গেঁয়োদের মধ্যে যাতনা সহ্য করতে পারছো?" আমি তাকে প্রশ্ন করি।"

www.pathagar.com

"কথাটা সত্য, খুরশীদ স্বীকার করে। "কিন্তু তুমি তো আমার মেজাজ সম্পর্কে জানো। প্রতিদিন আমি নতুন নতুন পুরুষের কাছে যাওয়া সহ্য করতে পারি না, যা আমাকে খানুমের ওখানে করতে হয়েছে। এখানে আমাকে শুধু রাজা সাহেবের কথাই ভাবতে হয়। বাকী সবাই আমার হুকুম মানে। তাছাড়া এখানেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি। অতএব, এখানকার সবকিছু আমি পছন্দ করি।"

"তোমার কি লক্ষ্ণৌ ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা নেই?"

"আমি 'না' বলায় তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে। এখানে আমি বেশ ভালো আছি। আমি তোমাকেও পরামর্শ দেব এখানে রয়ে যেতে।"

"আমাকে বাধ্য হতে না হলে আমি কখনো এখানে থাকবো না।"

"তুমি কি লক্ষ্ণৌ যাবে?"

"না।"

"তাহলে কোথায়?"

"আল্লাহ আমাকে যেখানে নিয়ে যান।"

"মেহেরবানী করে কিছুদিন এখানে থাকো।"

"আমি সাময়িকভাবে এখানে থাকবো।"

আরো পনের বা বিশদিন আমি দুর্গেই অবস্থান করলাম। তখন প্রতিদিন খুরশীদ জানের সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো। সে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হলেও আমি খুবই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ছিলাম। অবশেষে রাজা সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ পেশ করলাম।

"তুমি কি এখন চলে যেতে চাও?" রাজা সাহেব জানতে চাইলেন।

"হুজুর যদি এই দাসীকে যাওয়ার অনুমতি দেন তাহলে সে আবার নিজেই আসতে পারে।"

"লক্ষ্ণৌবাসীর পক্ষ থেকে এটিই উপযুক্ত কথা। তুমি কোথায় যাবে?"

"কানপুর।"

"আর কখনো লক্ষ্ণৌতে ফিরে যাবে না?"

"আমি কি করে লক্ষ্ণৌতে আমার মুখ দেখাবো?" খানুমের সামনে তো আমি যেতেই পারবো না। অন্য মেয়েরাও আমাকে দেখে হাসবে।"

আসলেই লক্ষ্ণৌ ফিরে যাওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না আমার। অবশ্য আমি একথাও ভেবেছি যে আমি যদি লক্ষ্ণৌর কথা উল্লেখ করি তাহলে রাজা সাহেব তার মন পরিবর্তন করতে পারেন। কারণ সেখানে গেলে আমি খুরশীদের অবস্থান সম্পর্কে কথা বলতে পারি এবং এ নিয়ে খানুম রাজা সাহেবের জন্যে একটা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারেন। যাহোক, আমার পরিকল্পনার কথা তাকে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট করেছিল।

"তুমি কি আর কোনদিন লক্ষ্ণৌ যাবে না?" তিনি জানতে চান।

www.pathagar.com

"লক্ষ্ণৌতে আমার কেউ নেই", আমি উত্তর দিলাম। "আমার পেশা হচ্ছে নাচ গান করা। আমি যেখানেই থাকি না কেন, কোন না কোন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে পাবো। খানুমের কয়েদখানা তূল্য বাড়িতে আমি আর থাকতে চাই না। তা না হলে আমি কখনো লক্ষ্ণৌ ছেড়ে আসতাম না।"

পরদিন রাজা সাহেব আমার কল্যাণ কামনা করে বিদায় জানালেন। তিনি আমাকে দশটি সোনার মোহর, একটি শাল ও একটি ওড়না দিলেন। তিনটি গরুসহ একটি গাড়ী, একজন গাড়িয়াল এবং দু'জন লোককে সাথে দিলেন আমাকে উন্নাও পর্যন্ত পৌছে দিতে। সংক্ষেপে ভ্রমণকারী একজন বাঈজীর যাবতীয় সুযোগ করে দিলেন আমার জন্য।

উন্নাও এ পৌছে আমি প্রহরী দু'জনকে বিদায় দিয়ে শুধু গরুর গাড়ী ও চালককে রাখলাম এবং একটি সরাইখানায় আশ্রয় নিলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমি আমার কক্ষের সামনে বসে সরাইখানায় যেসব মুসাফির আসছিল ও যাচ্ছিল তাদেরকে লক্ষ্য করছিলাম এবং সরাইখানার তদারকদারীদের বিবিদের হাঁকডাক শুনছিলাম। "জনাব মুসাফির, এদিকে যান। না, না ওখানে নয়। আমাদের আরো পরিচ্ছন্ন একটি ঘর আছে, ধূমপান করার জন্যে চমৎকার হুক্কা, পান করার জন্য স্বচ্ছ সুপেয় পানি, উত্তম খাদ্য, পানীয় এবং আপনার ঘোড়া ও গাধার জন্যে নিম গাছের ছায়া আছে.....।"

হঠাৎ আমার চোখ পড়লো ফৈয়াজ আলীর সহিস এদিকেই আসছে। সরাইখানার দরজায় পৌছার সাথে সাথে আমাদের চোখাচোখি হলো এবং সে আমার কাছে এলো। সে বললো যে, ফৈয়াজ আলী আমার উন্নাও এ পৌছার খবর পেয়েছে এবং সে নিশ্চিত যে রাতে সে আমার কাছে আসবে।

আমি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লাম। কারণ, আমি আর ফৈয়াজ আলীর সাথে যেতে ইচ্ছুক নই। আমার বিশ্বাস ছিল যে, রাজা সাহেবের লোকদের সাথে সংঘর্ষের পর তার সাথে আমার সম্পর্ক চুকে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে, আবারও আমার গলায় বেড়ি পরাবার জন্যে সে আমার জীবনে ফিরে আসছে।

সহিসের কথাই ঠিক। রাতের অন্ধকার গাঢ় হবার পর ফৈয়াজ আলী আমার কক্ষে এলো। তার সাথে সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি ও স্বস্তি বোধ করছি এমন ভান করলাম। আমি জানি যে, আমি তার খপ্পরে পড়েছি এবং তার যে কোন কথায় আমাকে সম্মতি দিতে হবে। আমরা কিছু সময় ধরে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললাম এবং উননাও ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা করলাম। প্রথমেই সে সিদ্ধান্ত নিল গরুর গাড়ীর চালককে বিদায় দিয়ে তার সহিসকে গাড়ী চালনার দায়িত্ব দেয়ার। এরপর সে নিজেই সিদ্ধান্ত পাল্টে সরাইখানায় গাড়ী রেখে রাতের অন্ধকারে গঙ্গা নদী পার হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। মাঝরাতের পর আমরা ঘোড়ার পিঠে উঠে সরাইখানা ত্যাগ করলাম। আমি ঘোড়ার জিনে তার পিছনে বসেছিলাম। রাতের অন্ধকারে উচুনিচু পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ

www.pathagar.com

অতিক্রম করার পর আমার শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি ব্যথা হয়ে গেল। অবশেষে আমরা নদীর তীরে পৌঁছলাম এবং বহু খোঁজ করে একটি নৌকা পেলাম। নদীর অপর পাড়ে পৌঁছার পর ফৈয়াজ আলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, "এখন আর কোন ভয় নেই।"

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের সময়ের মধ্যে আমরা কানপুর পৌঁছে লাঠি মহালে যাত্রা বিরতি করলাম। ফৈয়াজ আশপাশে ঘুরে দেখলো। ফিরে এসে আমাকে বললো যে সে এক জায়গায় একটি বাড়ি ভাড়া করেছে, কারণ লাঠি মহাল নিরাপদ জায়গা নয়। একটি পালকি ভাড়া করে আমরা বিশাল এক বাসভবনের সামনে নামলাম। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম বাড়ীটি সাজনো গোছানো নয়। বারান্দায় দু'টি চারপায়া, একটি কক্ষে ছিন্নভিন্ন তোষক, অদ্ভুত আকৃতির একটি হুক্কা। হুক্কাটি দেখে যে কারো ধূমপান পরিত্যাগ করার ইচ্ছা জাগবে। ফৈয়াজ আলী বাজারে গেল কিছু কিনে আনতে। আমি সেখানে একা রয়ে গেলাম।

জায়গাটি কেমন ভূতুড়ে এবং মনে হচ্ছিল যেন ফৈয়াজ আলী বাজারেই রয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কখনো ফিরে আসবে না। এক ঘন্টা কেটে গেল, এরপর আরো এক ঘন্টা, দুপুর হয়ে গেল। বিকেলও কেটে গেল এবং সান্ধ্য ছায়া সুদীর্ঘ হয়ে আঙ্গিনা পর্যন্ত বিস্তার হলো। সূর্য অস্তমিত হলো এবং সংক্ষিপ্ত গোঁধূলি রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আমি বসে আছি এবং বিশাল শূন্য বাড়িটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি, যেন এটি আমাকে গিলে ফেলবে। আল্লাহ ছাড়া আমি সম্পূর্ণ একা। আতংকে আমি কাতর হয়ে পড়েছি এবং নিজের ছায়ামূর্তির শিকারে পরিণত হয়েছি। একটি শূন্য কক্ষ থেকে আমি একটি মূর্তিকে বের হতে দেখলাম, আরেকটি মূর্তিকে দেখলাম বারান্দায় পায়চারি করতে। ছাদের ওপর মানুষের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম এবং সিঁড়ি দিয়ে পা ফেলে নিচে নেমে আসার শব্দ হচ্ছিল। মধ্যরাত পর্যন্ত আঙ্গিনা ও প্রাচীর চন্দ্রালোকিত ছিল। এরপর চাঁদ তার মুখ লুকালো এবং চারদিক নিকষ কালো অন্ধকার হয়ে গেল। আমি শাল দিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম। শব্দটি কিসের? রাতটি কি কখনো ফুরোবে?

অবশেষে ভোর হলো। আমি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেছি। নিজের জীবনকে কি এক বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলেছি! আমি লক্ষ্ণৌতে আমার সহজ সচ্ছন্দ ও আরামদায়ক জীবনের কথা ভাবলাম। ভৃত্যরা সব সময় অপেক্ষায় থাকতো কখন ডাক পড়বে। একজন শুধু শব্দটি বলতে হবে, তাহলেই সব কিছু হাজির, হুক্কা, পান, খাওয়ার ও পান করার যে কোন কিছু।

বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি কিন্তু ফৈয়াজ আলী এলো না। আমি সেই বাড়িতে অবস্থান না করার ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। দরজার ছিটকিনি খুলে রাস্তায় বের হয়ে এলাম। আমি বিশ পদক্ষেপও যাইনি, দেখলাম ঘোড়ার পিঠে একজন সুবেদারসহ কিছু সৈনিক আমার দিকেই আসছে। তাঁদের সাথে পিছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ফৈয়াজ আলী। প্রচন্ড আঘাত পেয়ে আমি যেন মৃতের মতো হয়ে গেছি। মসজিদের দিকে গেছে,

www.pathagar.com

এমন একটি গলি দেখলাম। নিজেকে বললাম, "আল্লাহর ঘরের চাইতে ভালো জায়গা আর থাকতে পারে না। কিছু সময়ের জন্যে আমি সেখানে আশ্রয় নিতে পারি।" দ্রুততার সাথে গলি দিয়ে এগিয়ে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম সাহস করে। আমি মোল্লার গায়ে প্রায় ধাক্কা খেয়েছিলাম। যিনি নীল লুঙ্গী পরে পায়চারি করছিলেন। যেভাবে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাতে আমার ধারণা হলো যে তিনি মনে করেছেন আমি কোন দান দিতে এসেছি। আমি মিহরাবে পা ঝুলিয়ে বসলাম। তিনি এগিয়ে এসে তার কামানো মাথা আমার দিকে ঝুঁকিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বললেন, "মোহতারিমা, এখানে আপনি কি কাজে এসেছেন?"

"আমি একজন ক্লান্ত মুসাফির," দুষ্টুমির ভঙ্গিতে উত্তর দিলাম। "আমি ভেবেছিলাম যে এটি আল্লাহর ঘর, যেখানে কিছু সময়ের জন্যে আমি বিশ্রাম নিতে পারি। আমার উপস্থিতিতে আপনার আপত্তি থাকলে আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

মোল্লা কিছুটা সংস্কৃতি বর্জিত লোক, কিন্তু আমার ধৃষ্ট আচরণ যাদুর মতো কাজ করলো এবং পুরোপুরি ধরা দিলেন আমার কৌশলে। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে আমাকে কি বলবেন, হা করে শুধু তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। একটু পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন, "আপনি কোত্থেকে এসেছেন?"

"তাতে কি কিছু আসে যায়? কিছু সময়ের জন্যেই তো আমি এখানে থাকবো।"

"কি মসজিদের ভিতরে?" শংকিত হয়ে তিনি বললেন।

"না জনাব, আপনার হুজরাখানায়।"

"শয়তানের হাত থেকে আল্লাহ্ আমাদের রক্ষা করুন।"

"মোল্লাজি, শয়তান কোথায়? এখানে তো আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"মোহতারিমা, এই মসজিদে আমি একা থাকি। সেজন্যেই আমি জানতে চেয়েছি যে আপনার কাজ কি?"

"কথাটা ভালো শোনায় না! আপনি যেখানে থাকেন, সেই জায়গায় কি আর কেউ থাকতে পারেনা? আর মসজিদে আমার কি কাজ আমাকে সেই প্রশ্ন করার আপনি কে? আপনি কি করছেন এখানে?"

"আমি ছেলেদের পড়াই।"

"আমিও আপনাকে দু'একটা পাঠ দিতে পারি।"

"আল্লাহ শয়তান থেকে আমাদের রক্ষা করুন।"

"সারাক্ষণ আপনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছেন কেন? শয়তান কি আপনার পিছনে লেগে আছে?"

"শয়তান মানুষের দুশমন। একজন মানুষের উচিত তাকে ভয় করা।"

www.pathagar.com

"কারো উচিত হলো আল্লাহকে ভয় করা, বেচারা শয়তানকে নয়। তাছাড়া আপনি কি করে নিজেকে মানুষের মধ্যে গণ্য করেন?"

"আমি তাহলে কে?" কিছুটা বিব্রত হয়ে তিনি বললেন।

"আমার বিশ্বাস, আপনি একটি জ্বিন। যে কোন রকম ভয়ভীতি ছাড়া এমন একটি জায়গায় একা থাকতে পারে সে নিশ্চয়ই জ্বিন।"

"আমি কি করবো? আমি তো একা থাকতেই অভ্যস্ত।"

"সেজন্যেই আপনাকে এমন জংলী দেখাচ্ছে। আপনি কি প্রবাদ শোনেন নি যে একা থাকা মানে অর্ধেক পাগল হওয়া!"

"আপনাকে অনেক শুকরিয়া। আমি যেমন আছি সেভাবেই সুখী", মোল্লা অনড় ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন। "আপনি আপনার কাজ ও আপনার সফরের উদ্দেশ্যে বলুন।"

"কোন কিছুর অর্থ জানতে হলে কাউকে কোন গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়। এই মুহূর্তে আমরা মৌখিক বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি।"

কিছু লোকের চেহারাই এমন যে কেউ তাকে নিয়ে রসিকতা না করে পারে না। যদিও মোল্লার বয়স কম এবং দেখতেও খারাপ নয়। কিন্তু বুনোমতন কিছু একটা ছিল তার মধ্যে। তার দাড়ি অবিন্যস্ত এবং যত্নহীনভাবে দীর্ঘ, কিন্তু ঠোঁটের উপরিভাগ কামানো। তার লুঙ্গি কোমরের বেশ ওপরে বাঁধা এবং মাথায় বড়োসড়ো ডোরাকাটা টুপি। তার কথা বলার ধরনটাও অদ্ভুত। দ্রুত তিনি মুখ খোলেন ও বন্ধ করেন। একটি বাক্য শেষ করার পর নাক দিয়ে 'পুত' শব্দ ছাড়েন। তখন তার দাড়ি কেঁপে উঠে এবং নিচের ঠোঁট উপরের ঠোঁটে উঠে যায়। মনে হয় তিনি এক সাথে খেতেও কথা বলতে চেষ্টা করছেন এবং মুখ তাড়াতাড়ি বন্ধ করছেন, যেন কিছু পড়ে যাবে মুখ থেকে।

আমি জামার পকেট থেকে একটি টাকা বের করলাম। মোল্লা ভাবলেন এটি তার জন্যে এবং ধার্মিকতার নিষ্ঠায় বিস্মিত হওয়ার মতো বললেন, "এর কি প্রয়োজন ছিল?" "বরং বলা যায়, এটাই প্রয়োজনীয়।" আমি হেসে উত্তর দিলাম। "আমি ক্ষুধার্ত, কাউকে বলুন আমার জন্যে কিছু খাবার আনতে।"

তিনি তার বিব্রতভাব কাটাবার চেষ্টা করলেন। যখন আমি বললাম যে, এর কি প্রয়োজন, তখন আসলে আমি তাই বুঝাতে চেয়েছি। "নিশ্চয়ই আপনাকে কিছু খেতে দেয়া সম্ভব আমার পক্ষে!"

"সেই সম্ভাবনা কি দ্রুত না সুপ্ত, অনিবার্য না দুর্ঘটনার মতো?"

"এটা দ্রুত সম্ভাবনার মতো কিছু নয়। আমার ছাত্রদের একজন আমার জন্য কিছু খাবার আনবে। আপনি তা থেকে খেতে পারেন।"

"আমার পক্ষে এখন ধৈর্য ধরার মতো সহনশীলতাও নেই। তাছাড়া আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে পবিত্র রমজান সাহেব এক মাসের জন্যে বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন এবং বছরের অবশিষ্ট সময় এই মসজিদে বিচ্ছিন্ন অবস্থার মধ্যে কাটান।"

www.pathagar.com

"আমি একথা অস্বীকার করবো না যে এ মুহূর্তে আমার কাছে কোন কিছুই নেই। কিন্তু আমি বলেছি আমার এক ছাত্র শিগগিরই কিছু খাবার আনবে।"

"ধরে নেয়া যাক এবং নিশ্চিতই ধরে নেই যে অসম্ভবটাই ঘটেছে এবং খাবার হাজির হয়েছে, কিন্তু তা আপনার নিজের জন্যেই যথেষ্ট নয়। তাহলে এক্ষেত্রে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? কিন্তু কোন কারণে তাতে আমার জন্যেও হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও আরবি প্রবাদটাও আমাদেরকে মেনে নিতে হবে, অপেক্ষা করা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ অবস্থা। পারসিকরা বলে, সর্প দ্বারা দংশিত লোক ইরাক থেকে ওষুধ আসার আপেক্ষা করতে পারে না।"

"আহ্! মনে হচ্ছে আপনি অত্যন্ত শিক্ষিত মহিলা।"

"আর আমার সূক্ষ্ম বিচার কাজে না লাগিয়েও বলতে পারি, আপনাকে একজন অকর্মা লোক মনে হয়।"

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটিই সত্য, কিন্তু.....।"

"এর কারণ আপনি অর্থহীন কথাবার্তা বলছেন, আর এদিকে আমার পেট খাদ্যের জন্যে ইবাদত শুরু করেছে?" বাধা দিয়ে আমি বললাম।

"ঠিক আছে, আমি এখনই কিছু খাবার আনছি।"

"আল্লাহর দোহাই, কিছু আনুন।"

অবশেষে মোল্লা গেলেন। এক ঘন্টা পর এলেন চারটি পাউরুটি , এক বাটি তরকারি নিয়ে যা রীতিমতো নীল বর্ণ ধারণ করেছে। তিনি আমার সামনে সেগুলো রাখলেন। আমি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। মূর্খ লোকটি বুঝতে পারেনি যে কি কারণে আমার মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি কাপড়ের গিট খুলে সাড়ে চৌদ্দ আনার খুচরা পয়সা এবং দুই পয়সা মূল্যের কড়ি বের করে আমার সামনে রাখলেন। "মোহতারিমা, রুটির দাম চার পয়সা, তরকারি এক পয়সা, তাছাড়া টাকা ভাঙানোর জন্যে আমাকে এক পয়সা দিতে হয়েছে কমিশন হিসেবে। বাকী পয়সা আপনার সামনে। খাওয়ার আগে ভাংতিগুলো গুনে নিন।"

আমি এতো ক্ষুধার্ত যে যুক্তিতর্ক করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কয়েক টুকরা রুটি মুখে পুরে তাকে বললাম, "ওহে বুযুর্গ ব্যক্তি, আমি বলতে চাচ্ছি, এই ধ্বংসপ্রায় শহরে কি আপনি এই খাদ্যগুলোই পেলেন?"

"এটা তো লক্ষ্ণৌ শহর নয় যে আপনি দিনের চব্বিশ ঘন্টাই মাহমুদের খাবার দোকানে পোলাও ও সুগন্ধি চালের ভাত পাবেন?

"কিন্তু এখানে তো কোন মিষ্টির দোকান অবশ্যই আছে?"

"মিষ্টির দোকান? কেন মসজিদের নিচেই তো একটা আছে!"

"তাহলে আপনি কেন চার ক্রোশ দূরে গেলেন? ছয় ঘন্টা সময় ব্যয় করলেন, আর কি পেলেন, কুকুরের খাবার!"

www.pathagar.com

"অমন কথা বলবেন না, মানুষই এসব খায়।"

"আপনার মতো লোক এগুলো খেতে পারে। বাসী রুটি, আর তরকারি পচে নীল হয়ে গেছে।"

"এটা নীল হয়নি.....আমি কি আপনার জন্যে একটু দধি আনবো?"

"না ধন্যবাদ, আমাকে সেটি থেকে রক্ষা করুন।"

"টাকা নিয়ে ভাববেন না। আমিই আপনার জন্য কিনবো।"

আমি কিছু বলার আগেই মোল্লা বের হয়ে গেলেন। টক দধিপূর্ণ একটি মাটির বাটি নিয়ে ফিরলেন। আমার সামনে এমন উজ্জ্বল ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন যেন দাতা হাতিম তা'য়ীকেই লজ্জার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। দীর্ঘ কাহিনী সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলছি, রুটিগুলো গলা দিয়ে নামিয়ে জগ ভর্তি পানি খেলাম। আমি তরকারি বা দধি স্পর্শ করলাম না, কিংবা আমার সামনে রাখা ভাংতি তুলে নেয়ার গরজও দেখালাম না। আমি হাত ধোয়ার জন্যে উঠলে মোল্লা ধরে নিলেন যে অবশেষে আমি মসজিদ ছেড়ে যাচ্ছি। স্বস্তির সাথে তিনি বললেন, "আপনার টাকা আর কড়িগুলো নিতে ভুলে যাবেন না।"

"আমার নামে মোমবাতি জ্বালাবেন।"

কানপুরে মোল্লা আমার অনেক কাজে লেগেছেন। তার চেনাজানা হওয়ার সুবাদে আমার পক্ষে সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া নেয়া সম্ভব হয়েছিল এবং সেটিকে সুন্দর শয্যা, গালিচা, সাদা চাদর, কাঁসার বাসনপত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে গুছিয়ে নিয়েছিলাম। আমি একজন বাবুর্চি, একজন পরিচারিকা এবং দু'জন ভৃত্যকে নিয়োগ দিয়ে জাঁকজমকের সাথে বাস করতে শুরু করলাম। বেশ ক'জন যন্ত্রশিল্পীর পরীক্ষা নিলাম, কিন্তু তাদের বাজানোর ধরণ আমার পছন্দ হলো না। অবশেষে লক্ষ্ণৌর এক তবলচিকে পেলাম, যিনি খলিফাজির পরিবারের একজন সদস্যের কাছ থেকে তালিম পেয়েছেন। খানুমের বাড়ীতে থাকাকালে খলিফাজি আমার গানে তবলা সঙ্গীত করতেন। তার মাধ্যমে আমি তুলনামূলকভাবে ভালো দু'জন সারেঙ্গী বাদকও পেলাম। আমার দল পরিপূর্ণতা পেল। শিগ্‌গিরই প্রচার হলো যে লক্ষ্ণৌর একজন বাঈজি কানপুর শহরে এসেছে। লোকজন আসতে শুরু করলো। সন্ধ্যার শুরু থেকে মাঝরাতের পর পর্যন্ত আমার বাড়িতে গানবাজনা চলতো। আমি যে কবিতা রচনা করি লোকজন তাও জানতে পারলো। এমন দিন কমই ছিল যে আমি বাইরের কোন অনুষ্ঠান ও মাহফিলে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেতাম না। গান গাইতে যাওয়া আমন্ত্রণের কোন কমতি ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যে আমি প্রচুর অর্থের মালিক হলাম। যদিও কানপুরের মানুষের চালচলন ও কথা বলার ভঙ্গি আমার ভালো লাগতো না এবং প্রতি মুহূর্তে লক্ষ্ণৌর কথা মনে পড়তো, কিন্তু পাশাপাশি আমি যে নিজের মালিকে পরিণত হয়েছি। এই বোধ আমার ভালো লাগতো এবং কখনো লক্ষ্ণৌ ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতাম না। আমি জানতাম যে লক্ষ্ণৌ ফিরে গেলে আমি আবার খানুমের মেয়েগুলোর একটিতে পরিণত হবো। এই পেশায় নিয়োজিত সব মহিলা

www.pathagar.com

খানুমকে ভয় পেতো। অতএব আমি যদি নিজের মতো করে সবকিছু করতে পারি তাহলে আমার সাথে কারো কিছু করার থাকবে না। ভলো যন্ত্রশিল্পী পাওয়া কঠিন হবে। ভালো সুরশিল্পী ছাড়া কারো পক্ষে কি করে নাচগানের ব্যবসা পরিচালনা করা সম্ভব? শহরের নামীদামী পরিবারগুলোর সাথে আমার পরিচয় খানুমের মাধ্যমে। যদিও আমি লক্ষ্ণৌর ভালো সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে গণ্য ছিলাম কিন্তু আমার মতো ভালো শিল্পী তো আরো ছিল। যাই বলা হোক না কেন, খুব কম সংখ্যক লোকের পক্ষেই ভালো ও মন্দ গানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব। অধিকাংশ মানুষ খ্যাতির সন্ধান করে। বিখ্যাত লোকদের দৃষ্টি পড়ে সুন্দর বারান্দা ও চমৎকার বাসভবনের উপর। খুব সাধারণভাবে একা একা যদি আমি লক্ষ্ণৌতে আমার পেশা শুরু করতাম তাহলে কে আমার তোয়াক্কা করতো? কানপুরে আমি আমার আশার চাইতেও বেশী প্রশংসা অর্জন করলাম। প্রতিটি উৎসবে এবং বিত্তশালী অভিজাতদের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হতো মর্যাদার প্রতীক হিসেবে।

কেউ যখন লক্ষ্ণৌ ছেড়ে দূরে চলে যায় কেবল তখনই সে লক্ষ্ণৌর সত্যিকার মূল্য বুঝতে পারে। লক্ষ্ণৌর এক কবির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো যিনি 'শারীক' ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্ণৌতে কেউ তার নাম শোনেনি, কিন্তু কানপুরে তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং কবিদের রাজা হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল তার। বহুসংখ্যক অনুসারী ছিল তার, যারা কবিতার কৌশল শিখতে তার কাছে যেতো। আপনাকে মজার একটি ঘটনা বলছি। একদিন এক ভদ্রলোক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমাদের আলোচনা কবি থেকে কবিতায় গড়ালো। তিনি প্রথমেই আমার কাছে জানতে চাইলেন যে আমি লক্ষ্ণৌর কবি শারীককে জানি কিনা। আমি উত্তর দিলাম যে আমি তাকে চিনি না এবং প্রশ্ন করলাম, "শারীক কে?" ঘটনাচক্রে তিনি স্বয়ং শারীকের ভক্ত ও ছাত্র ছিলেন। অতএব আমার প্রশ্নে তিনি মনক্ষুন্ন হলেন।

"আমাকে তো ধারণা দেয়া হয়েছিল যে আপনি লক্ষ্ণৌর অধিবাসী ," বিদ্রূপের সাথে তিনি বললেন।

"জী, জনাব আমার গরীবালয় লক্ষ্ণৌতেই।

"তাহলে কি করে একটা সম্ভব যে লক্ষ্ণৌতে আপনি এই মহান কবির নাম শোনেন নি?"

"লক্ষ্ণৌতে বিখ্যাত কবিদের এমন একজনও নেই যে আমি তাকে জানি না। এমনকি আমি ছোটখাট কবিদের কবিতার সাথেও পরিচিত। এই বিখ্যাত কবির আসল নামটা কি? এই ছদ্মনাম আমি কখনো শুনিনি।"

"আপনাকে তার আসল নাম বলার কি অর্থ থাকতে পারে?" বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন।

www.pathagar.com

"তার 'শারীক' ছদ্মনামই তো পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সারাদেশে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে।"

"আমার কথায় আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে বলছি যে, এটি এক ধরনের কাব্যিক অতিরঞ্জনের মতো শোনাচ্ছে। তিনি যেহেতু আপনার ওস্তাদ, তখন আপনি তার প্রশংসা করবেন এটাই যথার্থ। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, যদিও তার ছদ্মনামে আমি তাকে চিনতে পারছি না, আসল নামে তাকে হয়তো আমি চিনতে পারবো।"

"মীর হাসান আলী সাহিব শারীক'

"আমার কান অবশ্যই এই নামের সাথে পরিচিত," বলে আমি অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করলাম যে, এই হাসান আলী সাহিবটা কে হতে পারে। এরপর একজনের কথা ভাবলাম। "আপনার ওস্তাদ কাসিদা আবৃত্তি করেন তাই না?"

"জী মোহতারিমা, তার চাইতে ভালো কাসিদা আর কেউ রচনা করেনি।"

"আপনি যথার্থ বলেছেন!" আমি বিদ্রূপ মিশিয়ে বললাম। "আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি বিখ্যাত কাসিদা রচয়িতা মীর আনিস ও মির্জা দাবীরের চাইতেও ভালো।"

"তিনি তাদের পর্যায়ের।"

"তিনি কার কাসিদা আবৃত্তি করেন?" একই সুরে আমি বললাম।

"তিনি কেন অন্যের কাসিদা আবৃত্তি করবেন, যে ক্ষেত্রে তিনি নিজেই বিখ্যাত কবি। এইতো মাত্র সেদিন তিনি একটি নতুন কবিতা লিখেছেন, যার প্রশংসা প্রত্যেকেই করেছে।"

"আপনার সম্ভবতঃ সেই কবিতাটির কিছু অংশ মনে আছে?"

"তরবারির প্রশংসায় লিখা কটি লাইন শহরে সবার মুখে মুখে । অপূর্ব এক কবিতা!"

" মেহেরবানী করে আপনি আমার জন্যে আবৃত্তি করুন।"

"কোরআনের আয়াত যখন নাজিল হলো
হীরার মতো জ্বলজ্বল করছিল
খাপের বাইরে বের করা হলে
চকচক করছিল সোনার মতো।"

"সকল প্রশংসা আল্লাহর! এই লাইনগুলোর খ্যাতি আরো দূর পর্যন্ত ছড়িয়েছে। এই কবিতার পাঁচটি লাইনের উদ্ধৃতি আমিও দিতে পারি।"

"জী মোহতারিমা," স্পষ্টতঃ সন্তুষ্ট হয়ে তিনি বলতে থাকলেন। "আপনি লক্ষ্ণৌতে নিশ্চয়ই কবিতাটি শুনে থাকবেন। আমি ঠিক সেই কথাটিই বলেছি যে, কবিতা ও সাহিত্যে উৎসাহী লক্ষ্ণৌর একজন মোহতারিমার পক্ষে কি করে মহান শারীকের নাম না শোনা সম্ভব! এখন আমি বুঝতে পারছি যে, আপনি আমার সাথে রসিকতা করেছেন।"

www.pathagar.com

আমার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল যে, তার ওস্তাদের মতো মানুষগুলো যদি মারা যায় এবং আবার পুর্নজন্ম লাভ করে তাহলেও তাদের পক্ষে মরহুম দাবীরের এই কবিতার মতো কোন লাইন লিখা সম্ভব হবে না। কিন্তু চিন্তাভাবনা করে নিরব থাকলাম।

"তুমি ঠিকই করেছো, উমরাও জান, তা না হলে বেচারি তার জীবিকার উপায় হারাতো। অন্যের কবিতা নিজের বলে চালিয়ে দেয়ার কাজটি শুধু মীর হাশিম আলী সাহিত একা করেননি, আরো কিছু ভদ্রলোকের এই চৌর্যবৃত্তির অভ্যাস আছে। অন্যের কাজ নিজের হিসেবে আবৃত্তি করায় তাদের বিবেকে বাধে না। মাত্র ক'দিন আগে এক ভদ্রলোক আমার এক বন্ধুর পাণ্ডুলিপি চুরি করে নিয়ে হায়দরাবাদে তার কবিতাগুলো আবৃত্তি করে ফিরছিল। এতে অনেক সুপরিচত কবি ও সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করে সে। কিন্তু কবিতার পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম কিছু লোকের সন্দেহ হওয়ার তারা লক্ষ্ণৌতে তাদের বন্ধুদের কাছে ক্রুদ্ধও হলো। এ ধরনের লোকদের কারণে লক্ষ্ণৌর এমনই বদনাম হয়েছে যে প্রকৃত কবিও তার নামের সাথে 'লক্ষ্ণৌর' কবি যোগ করতে বা 'লক্ষ্ণৌভি' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেও লজ্জা পায়। আমি সত্তর গোষ্ঠী পর্যন্ত জোচ্চোরদের জানি যাদের পূর্বপুরুষ গেঁয়ো, সংস্কৃতিবর্জিতভাবে লালিত হয়েছে, কিন্তু বলার সময় নিজেদের পরিচয় দেয় 'লক্ষ্ণৌভি' বলে। মাত্র ক'দিন লক্ষ্ণৌতে পড়াশুনা করে বা কোন ব্যবসা করার সুবাদে তারা এটা করে আসছে। লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা হওয়ার এই বিশেষ অহংকারের কারণ আমি বুঝতে পারি না। বিশেষ করে অনেকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি মিথ্যা বলে।"

"বহু লোক লক্ষ্ণৌর নামের ওপর নির্ভর করে তাদের আয় রোজগার করছেন, আমিও কানপুরে তাই করেছি। তখনকার দিনে কোন রেল যোগাযোগ ছিল না। অতএব লক্ষ্ণৌর লোকজন তাদের শহর ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কথা কখনো ভাবেনি। অন্যদিকে অন্যান্য শহরের ভালো শিল্পী ও কারিগররা এখানে এসেছে কারণ, এখানেই তারা তাদের উপযুক্ত মূল্যায়ন পেয়েছে। রাজধানী দিল্লীর অবক্ষয় হয়েছে আর লক্ষ্ণৌ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গিয়েছিল।"

"কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এখন লক্ষ্ণৌর অবক্ষয় শুরু হয়েছে এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়েছে দাক্ষিনাত্যে। আমি কখনো দাক্ষিণাত্যে যাইনি, কিন্তু শুনেছি যে সেখানেও লক্ষ্ণৌর বহু লোকজন গিয়ে বসবাস করছে।"

"যারা লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা বলে নিজেদের দাবি করে তাদের শুদ্ধভাবে কথা বলতে শিখানো উচিত। কথা বলতে যদি তারা আটকে যায় তাহলে কিভাবে তা থেকে মুক্ত হতে পারবে তাও তাদের বলে দেয়া উচিত।"

"তুমি ঠিক বলেছো। কারো পক্ষে কিছু শব্দ মুখস্থ করা সম্ভব, কিন্তু তারা কখনো সঠিক উচ্চারণে বলতে পারবে না।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

"দৈবের ক্ষমতার উর্ধ্বে কোনকিছুই নয়;
দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষও
রহস্যজনকভাবে আবার মিলিত হয়।"

হ্যাঁ, যেসব লোক কোন কারণে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তারা প্রায়ই একত্রিত হয়, এমন ঘটনা ঘটে। এমনকি দীর্ঘদিন যাবত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাচ্ছে, এবং দু'জনের মাঝে আবার দেখা হওয়ার সামান্যতম আশাও নেই তারাও মিলিত হয়েছে। একদিন আমার ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছিল।

কানপুর আমার ছয় মাস অতিবাহিত হয়েছে। আমি এতো জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিলাম যে, লোকজন শহরের রাস্তায় অলিগলিতে আমার গান গুনগুন করতো। প্রতি সন্ধ্যায় আমার কামরা সঙ্গীত প্রেমিকদের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকতো।

গ্রীষ্মের বিকেলে আমি বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, দরজা জানালার চিকগুলো শুকিয়ে গেছে। আমি উঠে ভৃত্যকে বললাম চিকে পানি ছিটিয়ে পাখা টানতে। হঠাৎ আমার কানে এলো কেউ নিচে দোকানির কাছে জানতে চাচ্ছে যে লক্ষ্ণৌর বাঈজি কোথায় থাকে।

একটু পর সত্তর বছর বয়সের ভারে ন্যুব্জ এক মহিলা লাঠিতে ভর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এলো। মহিলার গায়ের রং ফর্সা, ত্বকের সর্বত্র ভাঁজ পড়েছে এবং মাথার চুল তূলার মতো ধবধবে সাদা। আপনি কি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন?" হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি বললেন মেঝের ওপর বসে।

"জী, মোহতারিমা," আমি বিছানা থেকে নেমে পানের বাটা হাতে নিয়ে ভৃত্যকে বললাম হুকা সাজিয়ে আনতে।

"আমার মালকিনের ইচ্ছা যে আপনি তার ছেলের জন্মদিনে তার বাড়িতে আসবেন। অনুষ্ঠানে শুধু মহিলাদেরকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তা আপনাকে কতো দিতে হবে?"

"আপনার মালকিন কি আমার সম্পর্কে জানেন?"

"আমার সম্পর্কে কেন জানবেন না? আপনার নাম শহরে সবার মুখে মুখে। আর বেগম সাহিবা স্বয়ং লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা।"

www.pathagar.com

"তাই নাকি? আপনিও নিশ্চয়ই লক্ষ্ণৌর?"

"কি করে বুঝলেন আপনি?"

"কেউ কি তার কথা বলার ধরন পাল্টাতে পারে?"

"জী, আমিও লক্ষ্ণৌর অধিবাসী," মহিলা স্বীকার করলেন। "দয়া করে বলুন, গান গাওয়ার জন্যে আপনি কতো নিয়ে থাকেন? আমাকে আরো অনেকগুলো কাজ করতে হবে এবং আমি খুব বিলম্ব করতে পারবো না।"

"আমি কতো নেই, সবাই তা জানে। এক একটি অনুষ্ঠানে আমি পঞ্চাশ টাকা করে নেই। আপনার মালকিন যেহেতু লক্ষ্ণৌর এবং আমাকে দাওয়াত দেওয়ার মতো উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন সেজন্য তার কাছ থেকে কিছুই নেব না। অনুষ্ঠান কখন?

"আজ সন্ধ্যায়, তিনি উত্তর দিতে দিতে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন। এটি অগ্রিম রাখুন। বাকীটা পরে দেখা যাবে।"

"এর কোন প্রয়োজন নেই," টাকা নিয়ে আমি বললাম। "তবু নিচ্ছি,, তা না হলে আবার বেগম সাহেব অপমানিত বোধ করতে পারেন। কোথায় থাকেন উনি?"

"বাড়িটা এখান থেকে একটু দূরে। আমি একটি ছেলেকে পাঠাবো আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনার সাথে যাতে কোন পুরুষ সঙ্গী না থাকে।"

"তাহলে যন্ত্রশিল্পীদের ব্যাপারে কি হবে?"

"যন্ত্রশিল্পী ও চাকর নওকরদের ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। ওদের বাইরে কোন পুরুষ মানুষ থাকতে পারবে না।"

"আপনি আশ্বস্ত থাকতে পারেন। আমি এমন কাউকে চিনি না যে যাকে আমার সাথে নিতে পারি।"

আমি ভৃত্যকে ইশারা করলাম তার সাজিয়ে আনা হুকো মহিলার সামনে পেশ করতে। অত্যন্ত আয়েশের সাথে তিনি হুকা টানতে শুরু করলেন। একটি পান বের করে তাতে চুন মাখলাম। একটু সুপারির গুড়া ও এলাচদানা দিয়ে খিলি বানিয়ে মহিলার দিকে এগিয়ে দিলাম।

"বেটি আমার দাঁত কোথায় যে পান চিবুবো?" তিনি বললেন।

"এটি আপনার জন্যেই বানিয়েছি, একটু খেয়ে দেখুন।"

পান মুখে পুরে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। "আহা কি সংস্কৃতিবান আমার নগরী।" বিস্ময় প্রকাশের পাশাপাশি আমাকে দোয়া করলেন তিনি। উঠে যেতে যেতে তিনি বললেন, "একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। জন্মদিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে সূর্যাস্তের এক ঘন্টা আগে।"

"কিন্তু দিনের ওই সময়ে আমরা সাধারণতঃ কোথাও বের হই না। কিন্তু যেহেতু বেগম সাহিবা বলেছেন, আমি আগেই আসবো।"

www.pathagar.com

এ কথা সত্য যে কেউ তার নিজের শহরের প্রশংসা করে যখন সে শহর ছেড়ে দূরে থাকে। এখন আমি লক্ষ্ণৌর লোকদের মাঝে থাকার আকাংখা পোষণ করি। আমি কানপুরে শত শত অনুষ্ঠানে গেছি, কিন্তু কোনটিতেই যাওয়ার জন্যে এতো ব্যগ্রতার সাথে অপেক্ষা করিনি। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন মনে হচ্ছিল সীমাহীন পর্বতের মতো। অবশেষে দিন গড়ালো বিকেলে এবং পাঁচটার সময় ছেলেটি এলো। আমি পোশাক পরে তৈরি ছিলাম এবং যন্ত্রশিল্পীদের ডেকে জড়ো করলাম। ছেলেটি তাদেরকে বেগম সাহিবার বাড়ির অবস্থান বললো। আমি একটি পালকিতে উঠে রওয়ানা হলাম।

বেগম সাহিবার বাড়ি শহর থেকে এক ঘন্টার পথ। রাস্তা শেষ অংশটুকু একটি খালের পাশ দিয়ে ক্যাকটাস ও কাটাওয়ালা গাছের প্রাচীরবেষ্টিত বাগানের মধ্য দিয়ে গেছে। ইংলিশ স্টাইলে বাগানটি সাজানো। লাল পাথরের রাস্তার দু'পাশে পাম গাছের সারি এবং এর পরই পাথর ভেদ করে উঠেছে পার্বত্য সব গাছ। বাগানটি পানির সরু নালা দিয়ে বিভক্ত এবং নালাগুলো দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্ফটিক স্বচ্ছ পানি। মালীরা গাছে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে। গাছের পাতা ধৌত ও সবুজ। সারাদিন ধরে সূর্যের তাপে দগ্ধ ফুলগুলোও তাজা ও প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে।

বাগান থেকে আমি বাড়ির ভিতরে মহিলাদের গাওয়া গানের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, যেখানে জন্মদিনের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। আমি বাইরে অপেক্ষা করলাম এবং যন্ত্রশিল্পীরা পৌছলে আমি শুভেচ্ছামূলক একটি গান এবং 'শাম কল্যাণ' এর একটি অংশ গাইলাম। যেহেতু সেখানে কোন শ্রোতা ছিল না, আমাকে থামতে হলো। বেগম সাহিবা যেখানে ছিলেন সেখান থেকে হয়তো আমার গান শুনতে পেয়েছেন এবং মুগ্ধ হয়ে একটি সোনার মোহরও পাঁচটি রৌপ্য মুদ্রা প্রেরণ করলেন।

একটু পর রাতের অন্ধকার নেমে এলো। চাঁদ উঠলো এবং বাগানে ছড়িয়ে পড়লো রূপালি আলো। সেই আলো বাগানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত পুকুরে কম্পিত পানিতে প্রতিফলিত হচ্ছিল। চাঁদের মৃদু আলো, পুকুরে পানি পড়ার শব্দ এবং ফুলের সুবাস অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

পুকুরের পাশে রঙিন স্তম্ভশোভিত একটি কাঠের মঞ্চ। এখানেই মেহমানদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে গালিচার ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে। তাকিয়া রাখা হয়েছে হেলান দেয়ার জন্যে।

সবুজ আবরণ দেয়া দু'টি প্রদীপ হাতে একজন পরিচারিকা এগিয়ে এসে গালিচার সামনের দিকে সেগুলো স্থাপন করলো। যন্ত্রশিল্পীদের বলা হলো ভৃত্যদের কামরায় গিয়ে অবস্থান করতে যেহেতু অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে মহিলাদের জন্যে। তারা চলে গেলে বেগম সাহিবা ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন। যে পথ দিয়ে তিনি এলেন সেটি গোলাপের পাঁপড়িতে ছাওয়া এবং মঞ্চকে বাড়ির সাথে যুক্ত করেছে। তাকে সম্মান জানাতে আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি গালিচায় বসলেন এবং আমাকে ইশারায় ডেকে তার পাশে বসতে

www.pathagar.com

বললেন। তাকে সালাম দিয়ে আমি বসলাম। তার মুখের ওপর থেকে আমি চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না।

"ওরা আমার চোখ দেখলো যে
তাতে পার্থিব কোন উজ্জ্বলতা নেই,
কিন্তু তার সৌন্দর্যে আমি শুধু
অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

উদ্যানের সৌন্দর্য ও চাঁদের আলো এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন পরীর দেশে অবস্থান করছি। আমি বুঝতে পারছি যে এটা সত্য, কারণ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আমার সামনে বসে আছেন স্বয়ং পরীদের রানী। তার চুল মাঝখান থেকে সিঁথি কাটা এবং দীর্ঘ বেণী ঝুলে আছে কোমর পর্যন্ত। তিনি ফর্সা এবং গালে চমৎকার গোলাপি আভা। তার কপাল প্রশস্ত, ভুরু বাঁকা এবং তার বড় বড় চোখ গোলাপের পাতার মতো দুইপ্রান্তে সূচালো। তার নাক খাড়া এবং মুখ গোলাপের কুঁড়ির মতো। কামিনীর ডালের মতো সরু তার দেহ এবং মনোরমভাবে বাঁকানো। তিনি পোশাকও পরেছেন চমৎকার ভাবে। তার হলুদ রং এর ফিনফিনে ওড়না কাঁধ পর্যন্ত ঝুলানো এবং আঁটসাট একটি ব্লাউজ পরেছেন। তাছাড়া পোশাক ও চেহারার সাথে মানানসই অলংকার পরেছেন। পান্না বসানো কানপাশা, হীরার নাকফুল, সোনার হার, হাতে রত্ন পাথরের বালা এবং পায়ে সোনার খাড়ু। অসংখ্য সুন্দরী মহিলা দেখেছি আমি, কিন্তু বিপর্যস্ত করার মতো এমন সুন্দরী কারো ওপর আমার চোখ পড়েনি। খুরশীদ জানের সাথে কোথায় জানি তার চেহারার একটা মিল আছে, কিন্তু খুরশীদ যেহেতু একজন বেশ্যা এবং সদ্বংশজাত কেউ নয়, অতএব মর্যাদা ও প্রশংসার দাবীদার স্বয়ং বেগম সাহিবা। তদুপরি, খুরশীদ জান সব সময় দুর্দশার ছবি হয়ে থাকতো, প্রেমিক কর্তৃক পরিত্যক্ত মহিলার মতো। বেগম সদা প্রফুল্ল, কোমল হাসি সারাক্ষণ তার ঠোঁটে লেগেই আছে। তিনি কথা বললে মনে হয় গোলাপের পাঁপড়ি ঝরে পড়ছে। তিনি জানেন যে কিভাবে মানুষকে তার সঠিক অবস্থানে রাখতে হয় এবং তার সাথে অন্তরঙ্গতার সুরে কেউ কথা বলতে সাহস করে না পর্যন্ত। আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই কিভাবে শোভনীয়তা বজায় রাখা সম্ভব তিনি তা জানেন। আরো অবাক হওয়ার ব্যাপার যে, আমি যখন তার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম, তখন তার চোখও নিবদ্ধ ছিল আমার ওপর। তাকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমরা একা হতে পারিনি। এক পরিচারিকা তার পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে বাতাস দিচ্ছিল। আরো দু'জন ছিল সামনে, একজন রূপার একটি জগ হাতে, আরেকজন পানের বাটা হাতে। অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন ; "তোমার নাম কি?"

"উমরাও জান," দুই হাত যুক্ত করে আমি উত্তর দিলাম।

"তুমি কি লক্ষ্ণৌর মূল শহরের?"

www.pathagar.com

প্রশ্নটি তিনি এমনভাবে করলেন যে সঠিকভাবে উত্তর দেয়া কঠিন হয়ে পড়লো আমার জন্যে। যদি উত্তর দিতাম যে আমি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা, তাহলে আমার মনের যে লক্ষ্য ছিল তা অর্জনে আমাকে ব্যর্থ হতে হতো। আমি যদি বলতাম যে, আমি ফৈজাবাদের তাহলে ভুল সময়ে আমি একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করে ফেলতাম। মুহূর্তের জন্যে প্রশ্নটির ওপর ভেবে উত্তর দিলাম, "জী, মোহতারিমা, আমি লক্ষ্ণৌতেই বড় হয়েছি।" উত্তর দেয়ার সাথে সাথে আমার মনে হলো যে পরের প্রশ্নও আমাকে একই সমস্যার মধ্যে ফেলবে। আমার ধারণা ভুল ছিল না, কারণ বেগম সাহিবা প্রশ্ন করে বসলেন, "এর অর্থ কি এই যে, তুমি লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করোনি?"

বুঝতে পারছিলাম না যে, আমি কি উত্তর দেব। তার প্রশ্ন শুনতে পাইনি ভান করে মুহূর্ত খানেক আমি চুপ করে থাকলাম। এরপর প্রসঙ্গ পাল্টাতে চেষ্টা করলাম তাকে প্রশ্ন করে, "মোহতারিমাও কি লক্ষ্ণৌর অধিবাসী?"

"এক সময়ে আমি লক্ষ্ণৌতেই ছিলাম। এখন কানপুরেই আমার বসতবাড়ী।"

"আমিও তাই করবো বলে ভাবছি।"

"কেন?"

এ প্রশ্নটিও কঠিন।" যে এক লম্বা কাহিনী, "আমি বললাম।" যে কাহিনী শুনে আপনার বিরক্তি ধরে যাবে। উদ্ভূত কিছু পরিস্থিতি আমাকে লক্ষ্ণৌ ফিরতে দিচ্ছে না।"

"আমারও একই অবস্থা। যখন খুশী তুমি এখানে আসতে পারো।"

"এমন মেহেরবান ও বিদূষী মালকিন এবং এতো সুন্দর একটি উদ্যানসহ এই স্থান আমি কখনো ছেড়ে যেতে চাইবো না। আমার মতো আবেগপ্রবণ মহিলার জন্যে এখানকার আবহ মৃতসঞ্জিবনীর মতো।"

"এই নির্জনতার মধ্যে তোমার কি ভালো লাগছে? যেখানে কোন জনমানবের চিহ্ন নেই, সেখানে আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। শহর থেকে বেশ ক'মাইল দূরে এ জায়গা। তুমি যদি চার পয়সার জিনিস কিনতে কাউকে সকালে পাঠাও, তাহলে সন্ধ্যার আগে সে ফিরতে পারবে না। কাষ্ঠ স্পর্শ করো এবং শয়তানকে বধির হয়ে যেতে দাও। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে যখন ডাক্তার আসবে ততোক্ষণে সে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে যাবে।"

"প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচি ও অভ্যাস থাকে," আমি বললাম। "আমি নিশ্চিত যে যদি আমি এখানে বাস করি, তাহলে আমার আর কোনকিছুর প্রয়োজন হবে না। আর এমন জায়গায় কেন একজন লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে?"

"আমি এখানে প্রথম এসে অমনই ভেবেছি। কয়েকদিন কাটানোর পর আমি উপলব্ধি করলাম যে, যারা শহরের আরাম আয়েশে বাস করতে অভ্যস্ত তাদের পক্ষে এমন জায়গায় বাস করা সম্ভব নয়। অন্যান্য বিষয় বাদ দিলেও, যখন আমার স্বামী কলকাতায় চলে যেতেন, তখন ভয়ে আমার ঘুম আসতো না সারারাত। যদিও আল্লাহর

www.pathagar.com

রহমতে আমার কিছু সৈনিক, নৈশপ্রহরী এবং ভৃত্য আছে–এখনো এক ডজন অনুচর এবং বহুসংখ্যক মহিলা আছে আমাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য, তবুও আমি সারাক্ষণ ভীতির মধ্যে কাটাই। আমি আরো কিছুদিন এখানে থাকবো এবং আমার স্বামী ফিরে এলে আমরা শহরে একটি বাড়ি ভাড়া নেব।"

"আমার সাহস দেখানোর ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করবেন। মোহতারিমা সম্ভবতঃ অনেক কিছু কল্পনা করেন। আপনি কানপুরে এলে দেখতে পাবেন যে শহরে প্রচণ্ড গরম ও কীটপতঙ্গসহ পরিবেশ কেমন। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আমরা মাছির মতো মরি না।"

আমাদের কথা বলার সময়ের মধ্যেই আয়া বেগম সাহিবার ছেলেকে নিয়ে এলো। তিন বছরের ফুটফুটে বালক, ময়না পাখির মতো মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছে। বেগম সাহিবা তাকে কিছুক্ষণ কোলে রাখলেন এবং আবার আয়ার কাছে ফেরত দেয়ার আগে আমি তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে আমার কোলে বসালাম এবং দীর্ঘক্ষণ আদর করে আয়ার কাছে দিলাম। "অন্য কোন কারণে না হলেও, আমি ছোট্ট মনিবকে দেখতে অবশ্যই আসবো।" আমি বললাম।"

তিনি বললেন : আমি তোমার আগমন প্রত্যাশা করবো, কি কারণে তুমি আসবে, তাতে কিছু মনে করবো না", তিনি হাসলেন।

"আমি এতো ঘনঘন আসবো যে, মোহতারিমা শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে যাবেন", তাকে আশ্বস্ত করতে বললাম।

পরিচারিকা এসে ঘোষণা করলো যে খাবার দেয়া হয়েছে। বেগম সাহিবা যন্ত্রশিল্পীদের খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন এবং প্রহরীদের চলে যেতে বললেন, যেহেতু তাদের আর কোন প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি আমার হাত ধরে বাড়ির ভিতরে যেতে যেতে আমাকে বললেন, "তোমাকে অনেক কিছু বলার আছে, আমার। আজ আমরা কথা বলার সুযোগ পাবনা, এবং কাল আমি ব্যস্ত থাকবো। পরশু সকালে এসো, মধ্যাহ্ন ভোজ পর্যন্ত এখানে কাটাবে।"

"আমারও কিছু কথা আছে আপনাকে বলার।"

"এখানে কোনকিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমরা খাওয়ার পর তোমার গান শুনবো।"

"কিন্তু মোহতারিমা, আপনি তো যন্ত্রশিল্পীদের বিদায় দিয়েছেন।"

"আশেপাশে পুরুষ মানুষ থাকলে আমি গান শোনার আনন্দ পাই না। আমার এক পরিচারিকা খুব ভালো তবলা বাজাতে পারে। সে তোমার গানে তবলা সঙ্গত করবে।"

দীর্ঘ বারান্দা এবং আয়না, ঝাড়বাতি দিয়ে সজ্জিত অনেকগুলো কক্ষ সমৃদ্ধ প্রাসাদতূল্য ভবনে প্রবেশ করলাম। খাবার ঘরে, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আরো দু'জন মহিলা। তাদের একজন পত্র-লেখক, আরেকজন বেগম সাহিবার বান্ধবী।

www.pathagar.com

দু'জনই আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী এবং মূল্যবান জামাকাপড় তাদের পরনে। উপাদেয় সব খাবারের আয়োজন করা হয়েছে। সাধারণ পোলাও, মিষ্টি টক মিশ্রিত পোলাও, সুগন্ধি চালের ভাত, সাধারণ চালের ভাত, পায়েস মিষ্টি, দই ইত্যাদি। লক্ষ্ণৌ ছেড়ে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো আমি এতো সুস্বাদু খাবার খেলাম। সাধারণতঃ খুব কম খাই আমি। কিন্তু বেগম সাহিবা সেদিন আমাকে অনেক বেশি খেতে বাধ্য করেছেন।

এক পরিচারিকা খাবার শেষে চিলমচি ও এক পেয়ালা ছোলার গুড়া এগিয়ে ধরলো। আমরা হাত ও মুখ ধুয়ে নিলাম ভালো করে। পান মুখে পুরে আবার ফিরে এলাম বাগানে। এখন শুধু বেগম সাহিবা ও তার পরিচারিকাবৃন্দ, পত্রলেখক, বান্ধবী ও অন্যান্য ভৃত্যদের সমাবেশ। বেগম সাহিবা তবলা আনার নির্দেশ দিলেন এবং সাথে তানপুরা। তিনি নিজে তানপুরা নিয়ে তার এক সঙ্গীকে তবলা বাজাতে বলে আমাকে গান গাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন মধ্যরাত। পাথর ও গাছগাছালির ঘন অবস্থান বাগানে ভীতিকর এক পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। সন্ধ্যায় যে চাঁদ উজ্জ্বল ছিল এখন সেটি দিগন্তে নিচু হয়ে ঢলে পড়েছে, গাছের ঘন শাখায় আড়ালে আবছা আলো দিচ্ছে। দীর্ঘ অন্ধকার ছায়া স্বপ্নালোকিত বাগানে ছড়িয়ে আছে। বাতাস বইতে শুরু করেছে এবং সাইপ্রেস গাছগুলো প্রবলভাবে আন্দোলিত হওয়ায় পাতাপূর্ণ শাখা ভূতুড়ে আওয়াজ তুলছে। ব্যাঙ ও ঘুঘড়া পোকাও টানা ডেকে চলেছে। এছাড়া ছিল বাতাস ও পুকুরে পানি পড়ার শব্দ। হঠাৎ করে পাখির তীক্ষ্ণ ডাকও উঠছিল যেন ঘুম ভেঙে গেছে আচমকা অথবা কোন শিকারি জন্তুর থাবা থেকে বাঁচতে ডানা ঝাপটে উড়াল দিচ্ছে পাখি। কখনো পুকুরে মাছ লাফ দিয়ে আবার ঝপাৎ শব্দে পানিতে পড়ছে। বাতাস একটু জোরে প্রবাহিত হওয়ায় সবুজ আবরণে ঢাকা দু'টি বাতি ছাড়া একে একে সবগুলো নিভে গেল। সে অবস্থায় আমরা রংচং এ জামা ও অনেক অলংকার পরা এক ডজন মহিলা মৃদু আলোকিত পাটাতনে গাদাগাদি করে চারদিকে অন্ধকারের মধ্যে সমুদ্রের মাঝে বসে আছি। অন্ধকার আকাশে দু'একটি তারাও ছিল, আর পুকুরের পানিতে মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। এই পরিবেশের উপযুক্ত গান আমার জানা, অতএব আমি একটি মোহিনী গাইতে শুরু করলাম। গানের সুর মহিলাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে এবং তাদের মুখে ভীতির ছায়া আরো প্রকট হয়েছে।

আমরা এতোটাই আতংকিত হয়ে পড়েছিলাম যে ঘন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অন্ধকারে আমাদের চারপাশের মুখগুলোর বৃত্তের বাইরে আর কোনকিছুর দিকে তাকাতে সাহস করছিলাম না। একটি শিয়াল ভীতিপূর্ণ আর্তনাদ করে উঠলো এবং একটি কম্পন নেমে গেল আমাদের শিরদাঁড়া বেয়ে। কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো। বেগম সাহিবা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে ছিলেন, সহসা তিনি সোজা হয়ে বসলেন, কোনকিছুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোরে আর্তনাদ করে ঢলে পড়লেন। আমরা পিছনে ফিরে মুখ বাঁধা অবস্থায় হাতে তরবারিসহ আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম প্রায় পনের জন লোককে। ভৃত্যরা মহিলাদের চিৎকার শুনে দৌড়ে এলো। কিন্তু তারা মাত্র গুটি

www.pathagar.com

কয়েকজন এবং নিরস্ত্র কিংবা শুধু লাঠি হাতে। ডাকাতের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের অধিকাংশ চুপিসারে কেটে পড়লো। মাত্র পাঁচজন এগিয়ে এসে আমাদের চারপাশে অবস্থান নিল। মহিলারা এতো আতংকিত হয়ে পড়েছিল যে তারা একে অন্যের ওপর পড়ে গাদাগাদি করে আছে যেন তাদের আর কোন দম নেই। শুধু আমারই পাথরের হৃদপিণ্ড ছিল বলে আমি বসে বসে শুধু দেখছিলাম। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে কি রেখেছেন?

বেগম সাহিবার প্রহরীদের মধ্যে যারা সসস্ত্র ছিল তারা জীবন বাজি রেখে লড়তে প্রস্তুত । সরফরাজ নামে একজন নেতৃত্ব গ্রহণ করলো। "আগে আমরা দেখি যে লোকগুলো কি চায়, "সে বললো। ডাকাতদের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, "তোমরা কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছো?"

"এখনই তুমি তা টের পাবে," ডাকাতদের একজন বললো।"

"তোমাদের উদ্দেশ্য কি মানুষ হত্যা করা না লুট করা।"

"আমাদের পিতাদের কি হত্যা করা হয়েছে যে আমরা তার প্রতিশোধ নিতে আসবো?" আরেকজন উত্তর দিল। "কারো জীবননাশ করার ইচ্ছে নেই আমাদের। কিন্তু আমাদের কাজে বাঁধা দিলে তোমরা প্রাণ হারাবে।"

সরফরাজ দৃঢ়তার সাথে বললো, "অন্যদের স্ত্রী কন্যাদের যদি সম্মানহানি করতে চাও, তাহলে.....।"

"না জনাব, অন্যের স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে আমাদের কি কাজ," আরেকজন মাঝখানে বলে উঠলো। "আমাদের নিজেদের ঘরেও কি স্ত্রী কন্যা নেই? কেউ কোন মহিলাকে স্পর্শ করবে না।" কণ্ঠটি আমার পরিচিত বলে মনে হলো।

স্বস্তি বোধ করলো সরফরাজ। "ভাইয়েরা, আমি আসলে এই বিষয়টিই জানতে চাইছিলাম। আমি তোমাদেরকে কামরার চাবি দেব। যে মহিলারা এখনো ভিতরে আছে তারা বাইরে বেরিয়ে আসবে। এরপর তোমরা ভিতরে গিয়ে তোমাদের যা নিতে ইচ্ছে হয় নিও। আমি মোহতারিমাদের বলবো তাদের গহনা খুলে দিয়ে দিতে। এই তুচ্ছ জিনিসগুলো গেলে আমাদের মনিবের সম্পদ কমবে না। আল্লাহর রহমতে ব্যাংকে তার লাখ লাখ টাকা আছে, এছাড়া বিশাল জমিদারী আছে তার।"

"এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? কিন্তু তোমাকে হুশিয়ার করছি। কোন বেঈমানী নয়!" ডাকাতদের সরদার হুমকি দিলো।

"এক সিপাহির পুত্র কখনো বেঈমানীর আশ্রয় নিতে পারে না। তোমাদের সে ভয় করার কারণ নেই," সরফরাজ আশ্বাস দিল।

যে ডাকাতের কণ্ঠ আমি চিনতে পেরেছিলাম, সে সামনে এগিয়ে এলো, "আশ্বাস দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। একজন মানুষের কথার চাইতে বেশী প্রয়োজন আর কিসের

www.pathagar.com

হতে পারে? চাবি বের করো।" আমাদের চোখ মিলিত হলো এবং আমি তাকে চিনতে পারলাম। সে ফৈয়াজ আলীর সঙ্গী ফজল। সে আমার কাছে আসার আগ পর্যন্ত ভয়ে আমার মুখে কোন কথা ফুটছিল না। সে বললো, "ভাবীজি, আপনি এখানে কি করছেন?"

"আপনার ভাই কয়েদখানায় যাওয়ার পর থেকে এখানেই আছি।"

"কার সাথে থাকছেন?"

"আমার এক বোন বেগম সাহিবার অধীনে নিয়োজিত, আমি তার সাথে দেখা করতে আসি।"

"আপনার বোন কোথায়?"

"শোরগোল শুনে বেচারি বেহুশ হয়ে গেছে। সে আমার মতো নয়। সে বোরখা পরে। কম বয়সে সে স্বামীকে হারিয়েছে। এরপর থেকেই অভিজাত ব্যক্তিদের বাড়িতে কাজ করছে।"

ফজল তার সঙ্গীদের দিকে ফিরলো, "এখান থেকে আমি কোন কিছুর একটা টুকরা পর্যন্ত নিতে পারবো না। তাহলে তা আমার জন্যে অভিশাপতুল্য হবে। আমি আর তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারছি না।"

"বড় অদ্ভুত কথা," তার সঙ্গীদের একজন বলে উঠলো। "তাহলে তুমি আমাদের সাথে এসেছো কেন?"

"আমরা কি উদ্দেশ্যে এসেছি তোমরা তা ভালোভাবেই জানো," ফজল বললো, "কিছু মানুষের জন্যে কারো না কারো শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমি ফৈয়াজ আলী ভাই এর স্ত্রীর এবং তার বোনের কিছু লুট করতে আসিনি অথবা এমন কারো ওপরও হাত তুলতে পারি না, যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি যদি কয়েদখানায় বসেও এ ঘটনা জানতে পারেন, তাহলে কি বলবেন তিনি?" ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করলো। যদিও ফজলকে তারা ভয় করতো এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছিল না, কিন্তু খালি হাতে ফিরে যেতেও চাচ্ছিল না তারা। তারা বললো যে তাদের পরিবার পরিজন না খেয়ে কাটাচ্ছে এবং সুযোগ পেয়ে কাজে না লাগানো তাদের জন্যে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার হবে। কি করে তারা তাদের উদর পূর্তি করবে?

ফজল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কালো চেহারার এক লোক তার সাথে যোগ দিল, "আমিও তোমার সাথে আছি। তাকে মনোযোগ দিয়ে দেখলাম এবং চিনতে পারলাম যে, সে ফৈয়াজ আলীর ঘোড়ার সহিস। এক পাশে তাকে ডেকে নিয়ে সবার অলক্ষে বেগম সাহিবা আমাকে যে সোনার মোহর ও টাকাগুলো দিয়েছিলেন তা তুলে দিলাম তার হাতে। ফজল সরফরাজের দিকে ফিরে বললো, "ভাই, আমি তোমার সাথেই আছি। এখন ব্যাপারটি তোমার ও এই লোকগুলোর মধ্যে।"

"আমি তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিন্তু এখান থেকে আমরা একটু সরে যাই। মহিলারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছেন। বেগম সাহিবা এখনো বেহুশের মতো পড়ে আছেন। তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন, তাহলে তোমরা যা চাও তোমাদের তাই দেব।"

www.pathagar.com

ডাকাতরা সরফরাজের সাথে গেল।

বেগম সাহিবার তখনো দাঁতে দাঁত লেগে আছে। আমি পুকুরের পাড়ে গিয়ে দুই হাতের আঁজলায় পানি ভরে এনে তার মুখের ওপর ছিটিয়ে দিলাম। তার হুশ ফিরে এলে তাকে বললাম যে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বিপদ কেটে গেছে। অন্যান্য মহিলার মুখেও আমি পানি ছিটালাম এবং একে একে তাদের হুশ ফিরে এলো। তাদেরকে বললাম যে কি ঘটেছে। বেগম সাহিবা আমার ওপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

বেগম সাহিবা সরফরাজকে খবর দিলেন এবং সে এসে বললো, "মোহতারিমা, তাদেরকে কিছু না দিয়ে আমরা তাদের হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার পাবো না। উমরাও জান যদি এখানে না থাকতো তাহলে এতো সহজে আমাদের পক্ষে এ বিপদ কাটানো সম্ভব হতো না।"

দীর্ঘ এ কাহিনী খাটো করছি এখানে। বেগম সাহিবা তার টাকার বাক্স আনতে পাঠালেন এবং ডাকাত দলকে পাঁচশ' রৌপ্য মুদ্রা এবং পাঁচশ' টাকা মূল্যের সোনা ও রূপার গহনা দিলেন। আবার নিঃশ্বাস নিতে সক্ষম হলাম আমরা। বেগম সাহিবা সেই মুহূর্তে কি বলেছিলেন এখনো আমার তা মনে আছে : "উমরাও জান, এই উদ্যানে বাস করার মজা দেখলে তো?"

রাত তিনটার সময় আমরা বাগান ছেড়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। এমন একটি ঘটনার পর কি করে কারো চোখে ঘুম আসতে পারে? অবশিষ্ট রাত আমরা জেগে ছিলাম, কিন্তু ভোরের দিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। খুব বেশী সময় ঘুমাইনি। ভৃত্যরা এসে আমাকে জাগিয়ে দিল। তখনো চোখ ডলছিলাম আমি।"

"মোহতারিমার সফর দীর্ঘ ছিল। সেজন্যে সারারাত জেগেছিলাম আমরা", তারা বললো, "কি করে আমি যাবো, আমি উত্তর দিলাম। "আমি তো পালকি বিদায় করে দিয়েছি।"

"আপনি এখন একটু ঝটপট করুন। লক্ষ্ণৌ থেকে কিছু লোক এসেছে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে।"

তখনই আমি অনুমান করলাম যে, হোসাইনী খালা ও গওহর মির্জা ছাড়া এ লোকগুলো আর কেউ হতে পারে না। অবশেষে তারা আমার সন্ধান পেয়েছে।

আমার তৈরি হয়ে নেওয়ার সময়ের মধ্যে কিছু মহিলা ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। তারা আমাকে অপেক্ষা করতে বললো এবং চলে যাওয়ার আগে বেগম সাহিবার সাথে দেখা করে যেতে বললো। আমি বললাম যে বেগম সাহিবা কখন উঠবেন কে জানে। শহরে আমার কাজ পড়ে আছে। আমি আবার আসবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

বাড়ি ফিরে দেখলাম হোসাইনী খালা ও গওহর মির্জা আমার অপেক্ষায় বসে আছে। খালা আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। আমিও কাঁদতে লাগলাম।

www.pathagar.com

"আল্লাহর কসম, তোমার বুকটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন। আমাদের কাউকে কি তুমি ভালোবাসোনি?" খালা বললো।

আমার লজ্জা লাগছিল, কিন্তু আমার মুখে যেহেতু কোন উত্তর আসছিল না, আমিও জোরে কাঁদতে লাগলাম। আমাদের কান্নাকাটি শেষ হলে হোসাইনী খালা সেদিনই লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার কথা ঘোষণা করলো। আমি হাজারো আপত্তি তুললাম। কিন্তু আমার কোন আপত্তি শুনবেন না তিনি। তার এই তাড়াহুড়া করার কারণ আমি পরে আবিস্কার করেছি। মৌলভি সাহেব অসুস্থ ছিলেন এবং খালার পক্ষে তাকে রেখে দূরে থাকা বিছুতেই সহনীয় ছিলনা। আমার প্রতি তার প্রচন্ড ভালোবাসাই তাকে বাধ্য করেছিল তাকে ছেড়ে এসে আমাকে লক্ষ্মৌ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

আমি দিনটি কাটালাম পথের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে, বাড়িটির ভাড়াটে ঠিক করতে, ভৃত্যদের বেতন পরিশোধ করতে। আমরা কানপুর ত্যাগ করে পরদিন লক্ষ্ণৌ পৌছলাম। আবার সেই বাড়ি, সেই কামরা এবং পুরনো সব লোকজন।

বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরে আমার হৃদয়কে
আমি ক্ষতবিক্ষত করেছি
বন্ধুরা আমাকে ফাঁদে আটকে আবার
ফিরিয়ে এসেছে সেই কয়েদখানায়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

ভয়াবহ এক বিপর্যয়ের মতো শুরু হলো সিপাহী বিদ্রোহ। দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের মতো আমাদের শহরেও টালমাটাল পরিস্থিতি। বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হচ্ছে, পাকড়াও হচ্ছে লোকজন এবং নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করা হচ্ছে। মনে হচ্ছিল যে হাশরের দিন অতি নিকটবর্তী । আমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী যে শাহী সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা সাইয়িদ কুতুবুদ্দিনকে আমি জানতাম, যিনি আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং প্রায়ই আমাকে আমন্ত্রণ জানাতেন তার কর্মস্থল শাহী প্রাসাদে তার সাথে কাটাতে। এছাড়া তিনি আমাকে ঘন ঘন আমন্ত্রণ জানাতেন প্রাসাদের অনুষ্ঠানে।

অযোধ্যা রাজ্যের শেষ সময় পর্যন্ত আমি বেগম মালিকা কিশওয়ারের দরবারে বিষাদের গান গাওয়া অব্যাহত রেখেছিলাম। এ সময়েই আমার পরিচয় ঘটে বাদশাহর ছোট ভাই শাহজাদা মির্জা সিকান্দর হাশমতের সাথে। যিনি সেনাপতি নামে পরিচিত ছিলেন। যখন বেগম কিশওয়ার ও সেনাপতি দু'জনই কলকাতার উদ্দেশ্যে শহর ত্যাগ করলেন তখন শাহী প্রাসাদের সাথে আমার সম্পর্কও শেষ হয়ে গেল। কিছু বিদ্রোহী সিপাহি যখন শাহজাদা বিরাজিস কাদিরকে সিংহাসনে বসালো তখন আবার আমাকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হলো শুভেচ্ছামূলক গান গাইতে।

এই ক্ষণস্থায়ী শাসনকালের একটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে, তা হচ্ছে শাহজাদার একাদশ জন্মবার্ষিকীর জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান। কাশ্মিরী গায়ক দল যে গানটি গেয়েছিল তা এখনো আমার মনে পড়ে :

ও বিরজিস কাদির , চাঁদও তোমাকে দেখে ঈর্ষা করে
ও বিরজিস কাদির, তুমি দুর্লভ সৌন্দর্যের এক মুক্তা

এ উপলক্ষে আমিও একটি কবিতা রচনা করেছিলাম। সেটির শুরুর লাইনগুলো ছিল :

সীমাহীন পথ হাজারো হৃদয়কে মুগ্ধ করবে,
শুভার্থীদের দোয়া তোমাকে কোন ক্ষতি
থেকে মুক্ত রাখবে।

ওই দিনগুলো ছিল খুবই বিপজ্জনক এবং আমাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কখন হারাবো, এই ভয়ে দিনরাত অতিবাহিত করতাম। একটি কাগজে এই কবিতাটি লিখে আমার পানের বাটার ওপরে রেখেছিলাম বেগম কিশওয়ার যেদিন কায়সার বাগ ত্যাগ করে যান

www.pathagar.com

সেই দিন পর্যন্ত । পালানোর তাড়াহুড়োর মধ্যে মানুষ শুধু পানের বাটা নিতেই ভুলে যায় না, তাদের জুতা ও শাল নিতেও ভুলে যায়।"

"বেগম যেদিন কায়সার বাগ ছেড়ে যান সেদিনটি কবে ছিল তা কি তোমার মনে আছে?"

"সঠিক তারিখটা আমার মনে নেই। ২৭ রজবের রোজার দুই বা তিনদিন পর ছিল।"

"তুমি ঠিকই বলেছো। সেদিন ছিল ২৯ রজব। কোন্ ঋতু ছিল?"

"শীতের শেষ ভাগ। নওরোজের চার পাঁচদিন বাকি ছিল তখন।"

"একেবারে যথার্থ। ১৬ মার্চ ছিল সেদিন। তাহলে তুমি বেগমের সাথে কায়সার বাগ ত্যাগ করেছিলে?"

"জী জনাব। আমি ওইসব চক্রান্তকারী ও ভীরু সেনা কর্মকর্তাদের কথা এবং বেগম যেভাবে তাদের অনুনয় করছিলেন তা কোনদিন ভুলবো না। একজন বলে উঠে, "এই বেগমের রাজত্বে আমাদেরকে কি পায়ে হেঁটে সফর করতে হবে।" আরেকজন মন্তব্য করে, "আমরা অন্ততঃ ভালো খাবার আশা করতে পারি।" তৃতীয় আরেকজন তার আফিমের জন্য চিৎকার শুরু করে এবং চতুর্থ জন এমন আচরণ করতে থাকে যেন সময়মত হুকা না পেলে সে মরেই যাবে। ইংরেজ সেনাবাহিনী বাহরাইচ থেকে এসে (বান্দির) ওপর হামলা চালায় এবং সাইয়িদ কুতুবুদ্দিন বোন্দির প্রতিরক্ষার যুদ্ধে নিহত হন। বেগম পালিয়ে যান নেপালের দিকে। আমি জীবন নিয়ে ফৈজাবাদের দিকে কেটে পড়ি।"

"আমি শুনেছি যে কয়েকদিন ধরে বোন্দিতে বেশ কর্মতৎপরতা জারী ছিল।"

"আপনি তো শুধু শুনেছেন। আমি নিজের চোখে দেখেছি। লক্ষ্ণৌ থেকে যারা পালিয়েছিল তারা সবাই জড়ো হয়েছিল বোন্দিতে। বাজারটি দেখে মনে হতো লক্ষ্ণৌর চক।"

"ফৈয়াজ আলী যে তোমাকে অর্থ ও অলংকার দিয়েছিল সেগুলোর কি হলো?"

"ও সম্পর্কে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।"

"সেগুলো কি বিদ্রোহের সময় লুণ্ঠিত হয়ে যায়নি?"

"ওসব যদি বিদ্রোহের সময় লুণ্ঠিত হতো তাহলে আমার এতোটা দুঃখ হতো না।"

"কি ঘটেছিল তাহলে?"

"যে সন্ধ্যায় আমি ফৈয়াজ আলীর সাথে পলায়ন করি, সেদিন আমি সব গহনা সোনা ও রূপা একটি বাক্সে ভরে আমার এক বন্ধুকে দেই যার ভাই খানুমের বাড়ির ঠিক পিছনেই বাস করতো। মূল্যবান সামগ্রীগুলোসহ পুটলিতে পেচানো বাক্সটি দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে অনুনয় করে বলে সেটি আমার জন্যে রেখে দিতে। আমি ফৈজাবাদ থেকে ফিরে আসার পর সে আমাকে সেটি দেয়, আমি যেভাবে তার কাছে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবেই, সেই ছেঁড়া কাপড়ে মোড়ানো। সে যদি আমাকে বলতো যে

www.pathagar.com

পুটলিটা হারিয়ে গেছে তাহলে আমি তার কথাই বিশ্বাস করতাম। কারণ বিদ্রোহের সময় অধিকাংশ বাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমি একটি ফুটো পয়সাও হারাইনি। কেমন চমৎকার মহিলা ছিল সে। তার মতো লোকরাই পৃথিবী ও আকাশের ওজন নিজের কাঁধে নিতে পারে।"

"তোমার গহনাগুলোর মূল্য কতো ছিল?"

"অবশ্যই দশ থেকে পনের হাজার টাকা।"

"কিন্তু সেগুলোর কি হলো?"

"কি আর হতে পারে? যেভাবে ওগুলো এসেছিল সেভাবেই চলে গেছে।"

"বলা যেতে পারে যে, বিদ্রোহের সময় তুমি একটি পয়সাও হারাওনি এবং সেগুলো ছিল।"

"আমার যদি টাকা থাকতে, তাহলে এখন যেভাবে দিন কাটাচ্ছি তা কি কাটাতাম?"

"লোকজন বলে, এটাও একটি ধরণ। তোমার যদি সঙ্গতি না থাকে তাহলে তোমার ব্যয় নির্বাহ করছো কিভাবে? এখনো তো তুমি খুব গরিবী হালে কাটাচ্ছো না। তোমার বেশ ক'জন ভৃত্য আছে; তুমি ভালো খাচ্ছো, ভালো জামাকাপড় পরছো।"

"আল্লাহই সব দিচ্ছেন। তিনি দেখেন যে প্রত্যেকে তার প্রাপ্য অংশ লাভ করুক। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ওই মালামাল থেকে একটি পয়সাও নেই।"

"এখনো তুমি আমাকে সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে বলোনি।"

"আমি কি বলবো! এক দয়াশীল ভদ্রলোক....."

"আমি বুঝেছি। এ নিশ্চয়ই গওহর মির্জার কাজ!"

"আমি তো নিজে তা বলিনি। আপনার ধারণা ভুল হতে পারে।"

"তোমার বিশাল হৃদয়ের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সে আরাম আয়েশের মধ্যে বসবাস করছে এবং তোমার কোন পরোয়াই নেই তার।"

"মির্জা রুস্ওয়া একজন বাঈজির সাথে সম্পর্কের মাঝে কি আছে? সে ভাগ্যবতী হলে সম্পর্ক টিকে। আর ভাগ্যবতী না হলে সে এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না। দীর্ঘদিন ধরে সে আমার কাছে আসা বন্ধ করেছে।"

"সে কি কখনো তার উপস্থিতি দ্বারা তোমাকে ধন্য করেছিল?"

"সে কেন তা করবে? আমি প্রায়ই তার বাড়িতে যাই, যেহেতু আমি তার স্ত্রীকে জানি ও পছন্দ করি। কয়েকদিন আগেও তার স্ত্রী আমাকে দাওয়াত করেছিল তার পুত্রের স্তন পান করানো উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে।"

"আমি নিশ্চিত যে তুমি তাদের উপহার দিয়েছো।"

"কাউকে দেয়ার মতো আমার কি আছে?"

"তাহলে লুটের মাল পড়েছে জনাব গওহর মির্জার কাছে।"

www.pathagar.com

"মির্জা রুসওয়া, টাকাপয়সা কারো হাতের তালুর ময়লার মতো, যা শিগ্‌গির মুছে যায়, কারো কর্মটাই হচ্ছে ধর্তব্যের ব্যাপার। আমি আর সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই যে, এখনো আমাকে বস্ত্রহীন উলঙ্গ বা অভুক্ত থাকতে হয় না। আপনার মতো কল্যাণকামী থাকলে কখনো আমার কোন কিছু অভাব হবে না।

"আমি নিশ্চিত যে, তোমাকে অভাবে পড়তে হবে না–আমি ইতোমধ্যে তা বলেছি, এমনকি তুমি আরো শত শত ও হাজার জনের চাইতে অনেক ভালো অবস্থায় আছো। আল্লাহ তোমাকে তোমার ভালো পুরস্কার দিচ্ছেন। তিনি তোমাকে পবিত্র স্থান জিয়ারতেও সক্ষম করেছেন।"

জি জনাব, প্রভু আমার সকল মনোকামনা পূর্ণ করেছেন। আমার একমাত্র ইচ্ছা তিনি আমাকে কারবালায় নেবেন এবং সেখানকার পবিত্র ধূলি আমার শরীর মাখার সুযোগ দেবেন। মির্জা রুসওয়া, আমার অবশিষ্ট জীবন আমি সেখানে কাটানোর ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু লক্ষ্ণৌর জন্যে সহসা মাঝে দুর্বলতা জেগে উঠে এবং আমাকে ফিরে আসতে হয়। আল্লাহ চাইলে আমি যদি আবার যাই, তাহলে আর কখনো ফিরে আসবো না।"

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ফৈজাবাদে গিয়ে আমি প্রথমে একটি সরাইখানায় উঠলাম। এরপর ত্রিপোলিয়া ফটকের কাছে একটি বাড়ি ভাড়া নিলাম এবং যন্ত্রশিল্পী সংগ্রহ করে আমার পেশাগত কাজ শুরু করলাম।

ফৈজাবাদের আবহাওয়া , বাতাস, পানি সবই আমার কাছে অত্যন্ত উপভোগ মনে হলো। প্রতি সপ্তাহে একটি দু'টি করে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ থাকতো, যা দিয়ে আমার ব্যয় নির্বাহ হতো। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে শহরে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। যেখানেই আমি গান গাইতাম সেখানেই লোকজনের ভিড় জমে যেতো আমার গান শোনার জন্যে। আমার ব্যালকনির নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকজন আমার প্রশংসা করতো। আমি খুবই আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলাম।

ফৈজাবাদের আমার শৈশবের দিনগুলোর কথা প্রায়ই মনে পড়তো। আমি তৃষ্ণার্তের মতো থাকতাম আমার বাড়ি ও লোকজনকে দেখার জন্যে। বিদ্রোহের বিয়োগান্তক দিনগুলোর মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে এসেছি আমি, আমার চোখের সামনে অনেক রাজ্যের পতন দেখেছি, বিরজিস কাদিরের মতো শাহজাদাদের পতন দেখেছি এবং এসব প্রত্যক্ষ করে আমার হৃদয় পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে। আমি প্রায়ই ভাবতাম যে আল্লাহতায়ালা আমার আব্বা-আম্মাকে জীবিত রেখেছেন কিনা এবং তারা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে কিভাবে আমাকে তারা গ্রহণ করবেন। দু'টি ভিন্ন জগতের বাসিন্দা আমরা এবং রক্তের সম্পর্কও আমাকে দেখার আকাংখা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তারা আমাকে গ্রহণ করবেন না। কারণ কোন সম্মানজনক পরিবারই একজন বাঈজির সাথে মেলামেশা পছন্দ করবে না। আমার পরিবারকে খুঁজে পাওয়ার প্রচেষ্টার হয়তো সমাপ্তি ঘটবে দুঃখের মধ্য দিয়ে। এই যুক্তিগুলো সারাক্ষণ মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতো। অন্যান্য চিন্তা মনে এলে এই চিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিতাম।

কিন্তু লক্ষ্ণৌর কথা আমি কখনো মন থেকে সরিয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু যখন আমি ঘটে যাওয়া বিদ্রোহের কথা ভাবতাম, তখন আমার মন দুঃখে ভরে যেতো। কার দিকে ফিরে তাকাবো আমি? খানুম তখনো জীবিত, তার সাথে কি করে সাক্ষাৎ করবো আমি? সম্ভবত তিনি আমার ওপর তার কর্তৃত্ব চালাতে চাইবেন, যা তিনি সব সময় করেছেন। আমি তার কয়েদখানায় আর কিছুতেই কাটাতে চাইবো না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

www.pathagar.com

কিংবা আমার বিশ্বাসও হতো না যে খানুমের বাড়ির পিছনে বাস করে আমার যে বান্ধবী, তার কাছে যে মূল্যবান জিনিসগুলো গচ্ছিত রেখেছিলাম তা ফিরে পাওয়ার কোন সুযোগ আসবে এমন বিশ্বাসও করতাম না। লক্ষ্ণৌ শহর লুণ্ঠিত হয়েছে এবং তার বাড়ি লুটেরাদের হাতে পড়েনি তা কি করে হয়।

একদিন মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তাকে পানের খিলি দিলাম এবং হুকা সাজালাম। তার আলোচনা থেকেই জানতে পারলাম যে, তিনি রাজ মাতার পরিবারের সদস্য এবং একজন ভাতাপ্রাপ্ত। কথা প্রসঙ্গে আমি শাহী সমাধি সৌধগুলো আলোকিত করার কথা তুলে তার কাছে জানতে চাইলাম যে রাজমাতার পুরনো ভৃত্যদের মধ্যে কেউ এখনো বেঁচে আছে কিনা। তিনি উত্তর দিলেন, "অধিকাংশ বৃদ্ধ কর্মচারী মারা গেছেন। এখন নতুন অনেক নিয়োগ লাভ করেছে। তারা নতুন ব্যবস্থাপনার অধীনে।"

"পুরনো কর্মচারীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ জমাদার ছিলেন?"

"হ্যাঁ, তা ছিলেন । তার সম্পর্কে আপনি কি করে জানেন?"

"সিপাহী বিদ্রোহের আগে আমি একবার ফৈজাবাদে এসেছিলাম এবং আলোকসজ্জা দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার সাথে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করেছেন।"

"উনিই কি সেই জমাদার নন, যার কন্যা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো?"

"আমি কি করে জানবো!" হায়, আমি নিজেকে বললাম। ঘটনাটি এখনো বিস্মৃতিতে হারিয়ে যায়নি।"

"সব সময় অনেক জমাদার নিয়োজিত ছিল, এখনো যেমন আছে। কিন্তু বিদ্রোহের আগে তিনি আলোকসজ্জা ও অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন।"

"তার একটি পুত্র ছিল।"

"পুত্রকে কোথায় দেখলেন আপনি?"

"একই দিনে তার সাথে দেখেছি। দু'জনের চেহারার মধ্যে বেশ মিল ছিল।"

"জমাদার বিদ্রোহের আগেই ইন্তেকাল করেছেন। তার পুত্র এখন তার স্থলে কর্মরত।

এই প্রসঙ্গ থেকে তাকে সরিয়ে নিতে আমি অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমাকে একটি লোকসঙ্গীত গাইতে বললেন। আমি দু'টি করুণ গান গাইলাম। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন তিনি। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। অতএব তিনি বাড়ি চলে গেলেন।

আমার আব্বার মৃত্যুর সংবাদে আমি খুব দুঃখ পেলাম এবং সারারাত ধরে আমি কাঁদলাম। আমার প্রবল আকাংখা হলো আমার ভাইকে দেখার।

দু'দিন পর আমি একটি অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম। আমার মনে নেই জায়গাটি কোথায়, কিন্তু সেটি প্রাচীন একটি তেঁতুল গাছের নিচে দেউড়ি ঘেরা একটি বাড়ি ছিল। অনেক লোক জড়ো হয়েছে, পর্দার আড়ালে মহিলাদের ভিড়। জায়গাটির ব্যাপারে

www.pathagar.com

এমন কিছু একটা ছিল যা আমাকে রীতিমতো অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। পরিবেশটি আমাকে তেঁতুল গাছটির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, যে গাছের নিচে আমরা খেলতাম এবং আমার বাড়ীও ছিল এখানে। ভিড়ের মধ্যে কিছু কিছু মুখ মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত । অনুষ্ঠানের প্রথম পর্যায় শেষ হলো মাঝরাতে এবং আমি অনুষ্ঠানস্থল থেকে বের হয়ে এলাম। একটি ঘরের দরজায় আমি উঁকি দিলাম, যেটিকে আমার নিজের বলে মনে হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল দৌড়ে ভিতরে প্রবেশ করে আমার আম্মিজানের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ি এবং তিনি আমাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরুন । কিন্তু নিজেকে দমিয়ে রাখলাম। কারণ আমি জানতাম যে গেঁয়ো লোকজন বাঈজীদের পছন্দ করে না এবং এক্ষেত্রে আব্বা ও ভাই এর মর্যাদার প্রতি আমাকে খেয়াল রাখতে হবে। মনে হলো কি মারাত্মক এক উভয়সঙ্কটে পড়েছি আমি, যেখানে একটি মাত্র দেয়াল আম্মিজান ও আমাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং আমি তার সংলগ্ন হতে আকাংখা পোষণ করছি। আমি তাকে এক নজর দেখতে চাইলেও কি অস্বীকার করা হবে? অব্যক্ত এক নিষ্ঠুরতা মনে হলো আমার কাছে।

আমি যখন এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম তখন এক মহিলা এগিয়ে এসে জানতে চাইলো, "তুমি কি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছো?"

"জী," আমার হৃৎপিন্ড ভীষলভাবে দাপাচ্ছিল।

"আমার সাথে এসো, একজন তোমাকে দেখতে চান।"

আমি তার সাথে গেলাম। আমার পায়ে যেন পাথর বেঁধে দেয়া হয়েছে, এমন ভারী মনে হচ্ছিল আমার পা। তালের মতো স্খলিত পা ফেলছিলাম আমি।" মহিলা আমাকে বাড়ির আঙ্গিনায় গিয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে বললো। দরজায় চটের বস্তা ঝুলানো। কয়েকজন মহিলা সেই পর্দার পিছনে দাঁড়ালো।

"তুমি কি লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছো?" একটি কণ্ঠ প্রশ্ন করলো।

"জী. মাজি।"

"তোমার আসল নাম কি?"

আমার আসল নামই তাদেরকে বলার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে উত্তর দিলাম, "উমরাও জান।"

"তোমর জন্ম কি লক্ষ্ণৌতে হয়েছে?"

আমি আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না, "যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই আমার জন্ম হয়েছে।"

"তুমি কি বলতে চাও যে ফৈজাবাদে তোমার জন্ম?"

অশ্রু গড়িয়ে পড়ার কারণে আমার কণ্ঠ দিয়ে কথা বের হচ্ছিল না। কোন মতে বললাম, "জী মাজি।"

"কোন বাঈজী পরিবারে কি তোমার জন্ম হয়েছে?"

www.pathagar.com

"না, আমি অদৃষ্টের কথা বলছি।"

মহিলা কাঁদতে লাগলো। কণ্ঠটি তাকে বললো, "তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কেন বলছো না কেন যে তুমি কে?"

আমি অশ্রু মুছে উত্তর দিলাম, "আমি কি বলবো? আমি কিছুই ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না।"

পর্দার আড়াল থেকে দু'জন মহিলা বের হয়ে এলো। তাদের একজনের হাতে একটি প্রদীপ। আমার মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো, আমার কানের লতি পরীক্ষা করলো। মহিলা তার সঙ্গীর দিকে ফিরে বললো ; "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, এ সেই মেয়ে।"

"আমার আমিরন," চিৎকার করে বললেন, এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি আমার আম্মা। আমরা একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ ধরে জোরে জোরে কাঁদলাম। অবশেষে কিছু মহিলা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করলো। আম্মাকে কেঁদে কেঁদে আমার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলাম। তিনি শুনলেন ও কাঁদলেন। বাকী রাত আমরা এক সাথে কাটালাম।

পরদিন বেশ সকালে বের হয়ে এলাম। চলে আসার সময়ে আমার আম্মা যে বিষাদের দৃষ্টি ও আবেগ নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন তা অতি কখনো ভুলতে পারবো না। কিন্তু হায়! ভালো করে দিনের সূচনা হওয়ার আগেই আমি আবার নিজের কক্ষে চলে এলাম। আমার পরবর্তী অনুষ্ঠান নির্ধারিত ছিল সকালের জন্যে। কিন্তু আমি টাকা ফেরত পাঠিয়ে দিলাম আমি অসুস্থ বলে অজুহাত দিয়ে। আমি নিজেকে কামরায় বন্ধ রেখে সারাদিন শুয়ে ও কেঁদে কাটালাম।

সেই সন্ধ্যায় ইউনিফর্ম ও পাগড়ি পরা এক তরুণ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। আমি হুকা সাজিয়ে দিলাম। যেহেতু পানের বাটা খালি ছিল সেজন্যে আমি পরিচারিকাকে বললাম পান আনতে। আমরা যখন একা তখন তরুণটি প্রশ্ন করলো, "গতকালের মাহফিলে কি তুমিই গিয়েছিলে?

"জী।"

আমি তার দিকে তাকালাম এবং দেখলাম যে তার চোখ রক্তলাল। সে লজ্জায় মাথা নিচু করে তিক্ততার সাথে বললো, "তুমি নিশ্চয়ই পরিবারের সুনাম বৃদ্ধি করে এসেছো?"

আমি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম যে সে কে। উত্তর দিলাম "আল্লাহই আমার কর্মের বিচার করবেন।"

আমাদের বিশ্বাস ছিল, তোমার মৃত্যু হয়েছে।"

"লজ্জাহীন মানুষ সহজে মারা যায় না। আল্লাহ আমার মৃত্যু নিকটতর করুন।"

"তোমার উচিত ছিল লজ্জায় মৃত্যুবরণ করা। তুমি যে জীবন কাটাচ্ছো তার চাইতে বরং লাখ বার মরে যাওয়াও ভালো ছিল। কেন তুমি কিছু খেয়ে চিরতরে ঘুমিয়ে যাওনি?"

www.pathagar.com

"তা করার মতো বোধ কাজ করেনি। এবং আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ ধরনের পরামর্শও দেয়নি।"

"তোমার মধ্যে যদি সামান্যতম মর্যাদাবোধও থাকে তাহলে আর কখনো এই শহরে ফিরে এসো না। আর যদি আসতেও হয় তাহলে যে মহল্লা তোমার নিজের সেখানে অন্ততঃ কোন অনুষ্ঠানের বায়না নিও না।"

"আমার আসলে ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম না।"

"এখন তো জেনেছো?"

"এখন আমি কি করতে পারি?"

"এখন!" সে রেগে বললো। "এখন .....এখন.....।" কোমরবন্দ থেকে একটি ছুরি বের করে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার হাঁটুর নিচে আমার দু'হাত চেপে ধরে ছুরিটা ধরলো আমার গলায়। ঠিক তখনই আমার পরিচারিকা বাজার থেকে পান নিয়ে ফিরেছে। পরিস্থিতি দেখে সে চিৎকার করে উঠলো, "খুন খুন! কেউ সাহায্য করো।"

তরুণ তার ছুরি সরিয়ে নিয়ে আমার হাত আলগা হতে দিল। "একজন মহিলাকে খুন করার কি অর্থ থাকতে পারে, তাও যদি সে নিজেরই হয়.....।" সে নিজের বুক চাপড়ে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলো। আমার গলায় ছুরি ঠেকানোর কারণে আমি আতংকে নিরব হয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে ছেড়ে দেয়ায় আমিও কাঁদতে লাগলাম । প্রাণ ভরে কাঁদার পর তরুণ তার দুই হাত জোর করে আমার উদ্দেশ্যে বললো, "মেহেরবানী করে এই শহর ছেড়ে চলে যাও।"

"আমি কালই চলে যাব। আর একটিবার অআমি আম্মিজানকে দেখতে চাই"

"এর মধ্যেই যথেষ্ট হয়েছে। ওই খেয়াল মন থেকে দূরে রাখো। গতকাল আম্মা তোমাকে ডেকেছিলেন, যখন আমি বাইরে ছিলাম। আমি থাকলে ব্যাপারটি একভাবে বা অন্যভাবে ফয়সালা হতো। মহল্লার প্রত্যেকে এ নিয়ে গুজব রটাচ্ছে।

"আমি তোমার হুমকিতে ভীত নই। তোমার জন্যে বরং আমি উদ্বিগ্ন। তোমার সন্তানদের দেখাশুনার জন্যে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন। আল্লাহ যদি আমাকে আরো কিছুদিন হায়াত দেন, তাহলে আশা করি কেউ আমাকে মাঝে মধ্যে তোমার খোশখবর আমাকে দেবে।

"আল্লাহর দোহাই, আমাদের ব্যাপারে কাউকে আর কিছু বলো না।"

"তুমি যা ভালো মনে করো তাই হবে।"

তরুণ উঠে চলে গেল।

সেই রাতটি আমি ফৈজাবাদে কাটালাম। পরদিন সবকিছু চুকিয়ে লক্ষ্ণৌর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

খানুমের বাড়িতে গেলাম আমি। আবার সেই চক, সেই একই কামরা এবং পরিচিত সেই মেয়েগুলো। আমাদের পুরনো কিছু মনিব কলকাতা চলে গেছেন, কেউ কেউ অন্য

www.pathagar.com

শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। শহর নতুন প্রশাসনের অধীনে এবং নতুন আইন তৈরি হয়েছে। আসফ-উদ-দৌলার ইমাম বাড়ার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং চারদিকে চৌকি বসানো হয়েছে। শহরের অনেক এলাকায় প্রশস্ত রাস্তা নির্মিত হচ্ছে এবং গলিপথগুলোও শক্ত পাথর বসিয়ে মসৃণ করা হচ্ছে। নালা নর্দমা নিয়মিত পরিচ্ছন্ন করা হয়। লক্ষ্ণৌ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শহরে পরিণত হয়েছে।

খানুমের সাথে কয়েকমাস কাটানোর পর আমি একটি অজুহাত দেখিয়ে আমার নিজস্ব কয়েকটি কামরা নিলাম। তার কাছ থেকে আমি যে বিচ্ছিন্ন হলাম, এ ঘটনা তাকে বিচলিত বা বিস্মিত করলো না। সময়ের সাথে তিনিও বদলে গেছেন এবং জীবনের প্রতিও অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক। কিছু মেয়ে যখন তাদের নিজস্ব জীবন গুছিয়ে নিতে চলে যায়, তিনি আর অকারণে উদ্বিগ্ন হন না। আসলে তার মহলে বসবাসকারী উপার্জিত অর্থের প্রতি ক্রমেই তিনি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলেন।

এ সময়েই জনৈক নওয়াব মাহমুদ আলী খানের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতার সৃষ্টি হয়। প্রথম কিছুদিন তিনি আরো অনেকের মতোই আমার কাছে আসতেন। এরপর তিনি আমার জন্যে মাসিক ভাতা নির্ধারণ করলেন এবং আমাকে তার রক্ষিতায় পরিণত করার আকাংখাও ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। কিন্তু কি করে আমার পক্ষে তা সম্ভব? লক্ষ্ণৌতে বাস করে আমার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলা কি করে সম্ভব, যারা নিয়মিত আমার কাছে আসে। ঐ নওয়াব সাহেবের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি তার সাথেই বরং সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতে চাইলাম। আমার ওপর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমাকে বিয়ে করেছেন দাবি করে দাম্পত্য অধিকারের মামলা দায়ের করলেন। আমি রীতিমতো মুশকিলে পড়ে গেলাম। মামলা লড়ার জন্যে আমাকে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে হলো। প্রথম আদালত নওয়াবের পক্ষে রায় দিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত লুকিয়ে থাকতে হলো আমাকে। একজন উকিলের মাধ্যমে আপীল করলাম এবং এবার রায় আমার পক্ষে এলো। অতঃপর নওয়াব হাইকোর্ট আপীল করলেন। হাইকোর্টের রায়ে তিনি হেরে গেলেন। তিনি আমাকে হুমকি দিতে শুরু করলেন যে, তিনি আমার নাক কেটে দেবেন, আমাকে খুন করবেন। আমাকে সশস্ত্র লোক নিয়োগ করতে হলো, আমি যেখানেই যেতাম, তারা লাঠি হাতে আমার পালকির সাথে থাকতো। এভাবে সশস্ত্র অবস্থায় থাকতে আমার ভালো লাগছিল না। তাকে শাস্তি স্থাপনের বাধ্য করার জন্যে আমি বেপরোয়া হয়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালতে মামলা করলাম । তিনি যে আমার সাথে সহিংস আচরণে প্রতিজ্ঞ তা প্রমাণ করার জন্যে আমি সাক্ষীও সংগ্রহ করলাম। হাকিম তাকে বাধ্য করলো একটি হলফনামায় দস্তখত করতে যে তিনি শান্তি বজায় রাখবেন। অবশেষে আমার শান্তি ফিরে এলো। দীর্ঘ ছ'টি বছর আমাকে এসব মামলার জালে আটকা পড়ে থাকতে হয়েছে। এসব থেকে মুক্তি পেয়ে কেমন স্বস্তি লাভ করেছি, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

www.pathagar.com

মামলা চলাকালেই আকবর আলী নামে জনৈক সুপরিচিত উকিলের সাথে আমার পরিচয় হয়। লোকটির বুদ্ধি বিচক্ষণতা শয়তানের মতো। অবৈধ কার্যকলাপে তিনি অতি নিপুণ, সেরা প্রতারক, ভূঁয়া সাক্ষী সংগ্রহে অদ্বিতীয় এবং আদালতে বিভ্রান্ত করতে জুড়িহীন। তিনি আমার মামলা গ্রহণ করেন এবং আইনী বিষয়ে আমার বিরাট উপকার করেছেন। তিনি না হলে মামলায় আমি জিততে পারতাম না। যদিও এটা সত্য যে নওয়াব ও আমার মধ্যে কোন বিয়ে হয়নি, তা সত্ত্বেও সত্য প্রমাণের জন্যে আমাকে ভুঁয়া সাক্ষী হাজির করতে হয়েছে। বাদীর মামলা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হলেও এতো চতুরতার সাথে আদালতে পেশ করা হয়েছিল যে আমার নিস্তার পাওয়ার সামান্য সুযোগই ছিল। বিয়ের মূল সাক্ষী হিসেবে দু'জন মৌলবীকে আদালতে হাজির করা হয়। তাদেরকে সত্যি সত্যিই দরবেশতূল্য মনে হচ্ছিল; কিবলার দিকে সিজদা করতে করতে তাদের কপালে দাগ পড়ে গেছে, মাথায় বড় বড় পাগড়ি এবং পায়ে ঢিলা চটি। তাদের কাঁধ থেকে ঝুলছিল দীর্ঘ চাদর এবং তসবির ওপর আঙ্গুল ঘোরানো কখনো বন্ধ করেনি তারা, দু'একটি বাক্য বলার পর পরই তারা বলছিল, "আল্লাহ এ কথা বলেছেন, নবী করিম (সঃ) একথা বলেছেন।" তাদের বক্তব্য যে কোন আদালতের যে কোন হাকিম বা যে কোন বিশ্বাসী ব্যক্তি সত্য বলে মেনে নেবে। এই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের বিয়েতে কনের উকিল ছিলেন বলেও দাবি করলেন। সবকিছুর পরও সত্য সত্য হিসাবে এবং মিথ্যা মিথ্যা হিসাবেই রয়ে গেল। জেরার মুখে তারা সবকিছু এলোমেলো করে ফেললো। নওয়াবের অন্য সাক্ষীদের অবস্থা আরো নাজুক হয়ে গেল। এসব সাক্ষ্য প্রমাণের কারণে আপীল মামলায় নওয়াবের হার হয়েছিল। অন্যদিকে আমার দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা, যার পরিচালনায় ছিলেন আকবর আলী , সেটিতেও আমার জিত হলো।

আকবর আলী খান দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমার কাছে নিয়মিত আসতেন এবং প্রকৃত বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন। আমার কাছ থেকে যে তিনি একটি পাই পয়সা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন শুধু তাই নয়, নিজের পকেট থেকে আমার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি তার উপায়ে আমার প্রেমে পড়েছিলেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি জানতাম যে, মন্দ লোকজনও কখনো পুরোপুরি মন্দ হয় না, বরং কারো কারো প্রতি অত্যন্ত ভালো হয়। আপনি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন যে পুরনো দিনে এমনকি চোরেরাও যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতো তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতো। কারো না কারো প্রতি কিছু ভালো কাজ না করে কেউ বাঁচতে পারে না। কারণ কোন লোক যদি সবার কাছে খারাপ হিসেবে থাকে তাহলে সে কারো কাছ থেকে কোন ধরনের সহৃদয়তা আশা করতে পারে না।

যদ্দিন আদালতে মামলা চলছিল, তখন আমি কোন অচেনা লোককে আমার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিতাম না, কারণ নওয়াব কোন লোককে নজরদারি বা আমার ক্ষতি করার জন্যে পাঠাতে পারে বলে আমার সন্দেহ ছিল। আকবর আলী খান আদালতে তার

www.pathagar.com

কাজ শেষ করে আমার বাড়িতে এসে মাগরিবের নামাজ পড়তেন এবং রাতে তার বাড়ি থেকে পাঠানো খাবার খেতেন। আমার খাবার খেতে তার আপত্তির কারণে নয়, বরং আমাদের সবার রান্না এক সাথে হতো বলে তিনি দ্বিধা করতেন। তার কারণে আমিও নিয়মিত নামাজ পড়তে শুরু করেছিলাম। মহররম মাসের রীতি রেওয়াজ পালনের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। রমজান ও মহররমের পবিত্র মাসে তিনি ভালো ও পুণ্যের কাজ করতেন এবং তার বিশ্বাস ছিল যে এতে বছরের অবশিষ্ট সময়ে তিনি যে পাপকার্য করেছেন তা মোচন হয়ে যাবে। এটা সত্য হতে পারে, নাও হতে পারে, কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করতেন।

"এটা যেহেতু বিশ্বাসের ব্যাপার, তাহলে আমাকে বলতেই হয় যে তার ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিল।

"আমারও একই অভিমত।"

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা পাপীদের দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন–যাদের পাপকার্য শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তারা, এবং যাদের পাপকর্ম অন্যদের ক্ষতি করে তারা। আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির মতামত হচ্ছে প্রথম শ্রেণীভুক্তরা কম পাপী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্তরা মহাপাপী। যে কাজে অন্যেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে কাজের জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের কেবলমাত্র সেই ক্ষতিগ্রস্তরাই ক্ষমা করতে পারে। তুমি নিশ্চয়ই হাফিজের লাইনগুলো জানো ;

"সূরা পান করো কিংবা মূর্তিপূজা করো
কা'বা অথবা কোরআন জ্বালিয়ে দাও,
আল্লাহ এসবকে ক্ষমা করতে পারেন।
কিন্তু মানুষকে আঘাত দিলে তার ক্ষমা নেই।"

"উমরাও জান, ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে কারো অনুভূতিকে আঘাত করা সবচেয়ে বড় পাপ। এর কোন ক্ষমা নেই। এ ধরনের পাপের ক্ষমা থাকলে, আল্লাহ আমাকে মাফ করুক, তাহলে মানুষ আল্লাহর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারে।"

"প্রিয় বন্ধু আমার, যদিও আমার পাপ আমার দেহের লোমের মতোই সীমাহীন, তবু আমি মানুষকে আঘাত দিতে ভয় করি।"

"তুমি নিশ্চয়ই অনেকের হৃদয় ভেঙ্গেছো?"

"ওটা তো আমার পেশা। ভগ্ন হৃদয়গুলোই আমার টিকে থাকার বা অপচয় করার মতো লক্ষ লক্ষ টাকা এনে দিয়েছে।"

"তুমি কি ধরনের সাজা পাবে বলে আশা করো?"

"মোটেও সাজার আশা করি না। কোন মানুষের হৃদয় ভাঙ্গার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমি তাকে এক ধরনের পরিতৃপ্তিও দিয়ে থাকি। তাতে তার ক্ষতি পুষিয়ে যায়।"

www.pathagar.com

"কি অদ্ভুত।"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না আপনার? ঠিক আছে, আপনাকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন, একজন লোকের সাথে কোন মেলায় বা মাহফিলে আমার দেখা হলো এবং লোকটি আমার প্রেমে পড়লো। লোকটি যদি কপর্দকশূন্য হয়, তাহলে আমি তাকে গ্রহণ করবো না। সে যদি আহত বোধ করে তাহলে আমাকে কি করে দোষী সাব্যস্ত করা হবে? আরেকটি উদাহরণ দেই। কোন ভদ্রলোক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান এবং সেজন্যে তিনি অর্থও দিতে রাজী। সেক্ষেত্রেও আমি তাকে গ্রহণ করতে অসমর্থ, যেহেতু আমি অন্য কারো হয়ে আছি অথবা তাকে গ্রহণে করতে অনিচ্ছুক যেহেতু তাকে আমার পছন্দ নয়। এতে যদি তার হৃদয় ভেঙ্গে যায়, তাহলে আমি কেন দোষী হবো? কিছু লোক চায় আমি তাদের প্রেমে পড়ি। কেউ কাউকে প্রেমে পড়ার জন্যে বাধ্য করতে পারে না এবং আমি তা করতে রাজী হবো না। এতে যদি তারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে আমাকে দোষ দেয়া সঙ্গত নয়।"

"এ ধরনের মানুষ গুলী খেয়ে মরার উপযুক্ত। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে গণ্য করো না।"

"আস্তাগফিরুল্লা। আপনি তো সুখী জীবনের রহস্য সম্পর্কে জানেন। আপনি কাউকে ভালোবাসেন না এবং কেউ তোমাকে ভালোবাসুক তা চান না। এবং আপনার এই আপাতঃবিরোধী বৈশিষ্ট্যই আপনাকে সকলের ভালোবাসার পাত্রে পরিণত করেছে এবং সবাই আপনাকে ভালোবাসো।"

"এই ব্যাপারটি কি একই সাথে 'আছে' এবং 'নেই' অর্থবোধক?"

"আমি যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানি না, কিন্তু একই বস্তুর দু'টি ভিন্ন বহিরাবরণ হতে পারে। কেউ বিজ্ঞতার সাথে অথবা মূর্খের মতো ভালোবাসতে পারে।"

"দৃষ্টান্ত দিন।"

"যেমন, বিচক্ষণ ধরনের লোক এক্ষেত্রে ভালোবাসাকে গ্রহণ করে, যে ভালোবাসা আমার জন্যে তোমার রয়েছে এবং তোমার জন্যে আমার.....।"

"আমার কথা বলি, তাহলে একমাত্র আমার হৃদয়ই জানে যে সেটি আপনাকে ভালোবাসে কিনা। আর আপনার দিক থেকে আপনার স্বীকৃতিকেই মেনে নিচ্ছি, যা আমার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন দ্বিতীয় ধরনের একটি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হচ্ছে, আমি সেই মৌলবী সাহেবের কাছে নিবেদন করতে চাই, যিনি একজন নর্তকির প্রেমে পড়েছিলেন এবং পাগলের মতো লক্ষ্ণৌর রাস্তায় রাস্তায় চিৎকার করে ঘুরতেন, "আল্লাহর দরবারে আমার দরখাস্ত, আল্লাহর দরবারে আমার দরখাস্ত।"

"এটি খুব বাজে একটি উদাহরণ। আরেকটি দাও।"

"লাইলির জন্যে মজনুর প্রেমের মতো।"

www.pathagar.com

"তোমাকে তাহলে প্রাচীন ইতিহাসের মহাফেজখানা থেকে একটি দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করতে হচ্ছে।"

"তাহলে ধরা যাক,.....নাজিরের কথা.....।"

"তার কাহিনী না শোনাই ভালো। তার প্রসঙ্গ আমাকে একটি কবিতা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমাকে সেটি আবৃত্তি করতে দাও, এরপর তুমি তোমার কাহিনী এগিয়ে নিতে পারবে :

কে চেপে রাখতে পারে প্রেমকে?
এর কঠোর আইনকে কে দিতে পারে ফাঁকি?
অনেক প্রেমিকের ভাগ্য থেকে আমি মৃত্যু দেখি,
কিন্তু আমি কি শিখেছি–কোন্ উপসংহারে পৌঁছবো?"

"আমার মনে হচ্ছে, তুমি কলকাতার সেই ভালোবাসার কথা অবতারণা করছো।"

"এতো দূরে কেন যেতে হবে ; লক্ষ্ণৌতেই কি আমাদের তেমন দৃষ্টান্ত নেই?

"আমাদের কাহিনীতে ফেরা যাক। আমি শুনেছি যে তুমি আকবর আলী খানের হারেমের সদস্য হয়েছিল।"

"আপনাকে সত্যি ঘটনা বলছি। নওয়াব যখন প্রথম আদালতে তার মামলায় জিতে গেলেন তখন আমাকে আকবর আলী খানের বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল এবং সেখানে অমি বেশ ক'বছর কাটিয়েছি। তিনজন মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছিল যে আমি তার হারেমে প্রবেশ করেছিল, যাদের দু'জন ছিল স্বয়ং আকবর আলী ও তার বিবি, তৃতীয়জনের নাম আমি আপনাকে বলবো না।"

"আমি তোমাকে বলতে পারি।"

"আপনার ধারণা , সেটি গওহর মির্জা।"

"মোটেও না।"

"তাহলে সেটি কে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

"আমি একটি কাগজে নামটি লিখে দিচ্ছি এবং তুমি শুধু বলবে যে আমার ধারণা সঠিক কিনা।"

"আমি রাজী।"

"এই যে আমি লিখলাম নামটি, তুমি দেখো।"

"তৃতীয় ব্যক্তিটি আমি!"

"আমি পাঠ করছি। ' স্বয়ং তুমি', তাই লিখা হয়েছে কাগজে।"

"চমৎকার মির্জা সাহেব। অত্যন্ত চমৎকার আন্দাজ করেছেন আপনি।"

www.pathagar.com

"ব্যাপারটি তোমার ধরনের। আমাদের কাহিনী শুরু হোক।"

আকবর আলী খান আমাকে তার বাড়ি সংলগ্ন ছোট্ট একটি বাড়ীতে তোলেন, দু'টি বাড়ি একটি দরজা দ্বারা যুক্ত ছিল। ভঙ্গুর অবস্থার একচালা বাড়ি, ছোট্ট, একটি বারান্দাও ছিল। এর ঠিক বিপরীতে আরেকটি চালা, যেখানে দু'টি চুলা ছিল। বাড়িটি শুধু আমার জন্যেই ছিল না। আকবর আলীর ঘনিষ্ট বন্ধুদেরকেও সেখানে স্বাগত জানানো হতো। তাদের একজন শেখ আফজাল হোসেন আমার অনুরাগীতে পরিণত হয়। লোকটি তার গ্রামের বড়লোক গোছের ছিল এবং অচেনা লোকদের সাথেও তার স্বাধীনতার প্রয়োগ করতো। সে সরাসরি আমাকে 'ভাবী' বলে ডাকতে শুরু করলো এবং আমার হাত থেকে পান নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতো। "কি ব্যাপার ভাবীজি, আমার পানের কি হলো?" শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কারো পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে এমন জ্বালাতন সহ্য করা সম্ভব নয়। একদিন আমি সত্যি সত্যিই ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পানের বাটা ঠেলে দিলাম যাতে সে নিজে ইচ্ছামতো পান খেতে পারে। সে পানের বাটার কর্তৃত্ব গ্রহণ করলো, যেন সেটি তার পৈতৃক সম্পত্তি। পান তৈরি সময় সে তার আঙ্গুল খয়েরের পাত্রে ডুবিয়ে আঙ্গুলগুলো চাটতো। সে পান মুখে পুরে এমন নোংরা ভঙ্গিমায় চিবুতো কেউ চোখে দেখলে চিরদিনের জন্যে পান খাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিতে চাইতো। আমি পান খাওয়া ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র সুপারির টুকরা ও এলাচদানা খেতাম। ওয়াজেদ আলী নামেও একজন লোক ছিল, যে খাওয়ার সময়ে সেখানে আসার নিয়ম করে নিয়েছিল। অশ্লীল সব রসিকতা করতো লোকটি, যা শোভনীয়তার কোন সীমার মধ্যে পড়তো না। এরা ছাড়াও আকবর আলীর অনেক মক্কেল ও উকিল বন্ধু ছিল যারা চব্বিশ ঘন্টা ধরেই আইনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতো। আকবর আলী বাড়ি থেকে বাইরে থাকার সময়টুকুতেই শুধু আমি শান্তিতে কাটিয়েছি।

সেই বাড়িতে অবস্থান করে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং অন্য কোন ব্যবস্থা করার কথা ভাবছিলাম, ঠিক তখনই কৌতুহল সৃষ্টি করার মতো একটি ঘটনা ঘটলো। আকবর আলী খান একটি মামলার শুনানীর জন্যে ফৈজাবাদে গিয়েছেন। আমি একা এবং বাড়ির বাইরের দরজার খিল আটকে দিয়েছি। অন্দর মহলের সাথে যুক্ত দরজাটি হঠাৎ করে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং আকবর আলী খানের বিবি ভিতরে এলেন। তাকে সালাম জানানো ছাড়া আমার আর উপায় ছিল না। আমি যে বিছানার ওপর বসে ছিলাম, তিনি এগিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়ালেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না তিনি। আমিই বললাম, "আল্লাহর দোহাই, আপনি বসুন।" কিছু না বলেই তিনি বসলেন।

"কোন্ সহৃদয়তা আমার মতো হতভাগীর কাছে আপনাকে আসতে বাধ্য করেছে?" আমি জানতে চাইলাম।

www.pathagar.com

"আমার উপস্থিতি তোমার অসহ্য মনে হলে আমি এখনই চলে যাচ্ছি," অত্যন্ত শুকনোভাবে তিনি উত্তর দিলেন।"

"মোহতারিমা, এটি আপনার বাড়ি; আমার নয়। আমাকে যদি আপনি চলে যাওয়ার হুকুম করেন, তাহলে সেটি অর্থবোধক হবে।"

"আমার সাথে এতো স্বচ্ছ কথা বলার চেষ্টা করো না। এ বাড়ি আমার মতো তোমারও। আর প্রকৃত সত্য হচ্ছে, এটা তোমারও নয়, আমারও নয়, বরং মনিবের।"

"আল্লাহ আপনার মনিবকে হেফাজত করুন। এটি আপনার ও তার।"

"তুমি সারাদিন এখানে বসে থাকো কেন? আমিও একজন মানুষ। তুমি কেন কথা বলার জন্যে আমার কাছে আসো না? সম্ভবতঃ আমার স্বামী তোমাকে তা করতে নিষেধ করেছেন।"

"আপনার স্বামীর আদেশ আমাকে আপনার কাছে যেতে বিরত রেখেছে, ব্যাপারটি এমন নয়। আমি আপনার অনুমতির অপেক্ষায় ছিলাম। এখন আমি অনুমতি পেলাম। অবশ্যই আপনার খেদমতে হাজির হবো।"

"তাহলে আমরা আর কি কারণে অপেক্ষা করছি?"

তার সাথে আমি তার বাড়িতে গেলাম। আল্লাহ তাকে সবকিছু দিয়েছেন। সোরাহি, নরম বিছানা, মশারি, কাঠের চেয়ার, গালিচা, কম্বল। কিন্তু সবই এলোমেলো করে রাখা। আঙ্গিনার সর্বত্র ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে আছে। রান্নাঘরে ভনভন করে উড়ছে মাছি, চেয়ারের ওপর পানের পিক পড়ে শুকিয়ে ছোপছোপ দাগ হয়েছে, তার বিছানার নিচেও ময়লার স্তূপ। চাকরানী যে পানের বাটা আনলো সেটি খয়ের ও চুনের রংএর কারণে বিশ্রী রূপ ধারণ করেছে। সেটি দেখেই আমার বমি ভাব এলো।

আকবর আলী খানের বিবি আমাকে একটি খিলি বানিয়ে দিলেন। সেটি মুখে না পুরে আমি আঙ্গুলের ফাঁকে ধরে রাখলাম। তিনি যখন কথা বলছিলেন, তখন এক বৃদ্ধা মহিলা এসে আমাদের সামনে মেঝের ওপর বসলো। আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে প্রশ্ন করলো, "এই মহিলাটি কে?"

"আমার পক্ষে বলাটা কঠিন," আকবরের বিবি উত্তর দিলেন।

আমি চুপ করে থাকলাম। মহিলা আবার তাকে সম্বোধন করে বললো, "যেন আমি কিছু জানি না।"

"বৃদ্ধা মোহতারিমা, আমি মাঝখানে বললাম, "আমি কে তা যদি আপনি জানেন, তাহলে সে প্রশ্ন করেছেন কেন?"

www.pathagar.com

"আমি তোমার সাথে কথা বলিনি। " মহিলা বিদ্রূপ করে বললো। আমার মালকিনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি। তোমার মতো গুরুত্বপূর্ণ কারো সাথে কথা বলার মতো উপযুক্ত নই আমি।"

"বৃদ্ধা মহিলা, কোনকিছুতে নাক গলাতে আপনার মতো মহিলাদের কিছু লাগে না।" আকবর আলী খানের বিবি ধমকের সুরে বললেন।

"তুমি তো আমাকে কিছু বললে না, যেন আমি তোমার দুশমন, মহিলা উত্তর দিল এবং অদৃশ্য কোন শ্রোতাকে উদ্দেশ্যে করে বললো, "ব্যাপারটা দেখো!" আমি তার ভালোর জন্যে বললাম আর সে কিনা আমার ওপর রেগে গেলো।"

"আমার কল্যাণ কামনার কোন প্রয়োজন নেই আপনার," আকবর আলীর বিবি বললেন। আমার ব্যাপারে নাক গলাবার আপনি কে?"

"কেন নাক গলাবো না?" মহিলা বললো। "তোমার কি ধারণা যে, তোমার বিষয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা শুধু নতুন যারা আসবে তাদেরই থাকবে?" বিদ্রূপ তার কণ্ঠে।

আমি না হেসে পারলাম না। হাসি ঠেকাতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। "আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন আপনি আমার সতীন," আকবর আলীর বিবি বললেন। আমার দিকে ঘুরে ফিরে সাথে যোগ করলেন, "এই বৃদ্ধা মহিলা আমার স্বামীর প্রথমা স্ত্রী। তুমি তার স্বামীর ওপর ভাগ বসিয়েছো।"

বৃদ্ধা আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারলো না। "সতীনদের ব্যাপারে এভাবে হালকা কথাবার্তা বলা আমি মোটেই পছন্দ করি না," তার কণ্ঠে রাগ। "ফেলে আসা দীর্ঘ বছরগুলো আমি শুধু জানতাম বড় বেগম অর্থাৎ আকবর আলী খানের মাকে। তার মুখে কোন কঠিন শব্দ বের হতে শুনিনি আমি। আর এই তুমি, এই বাড়ীর গুরুত্বপূর্ণ পুত্রবধু, একজন পুরনো পড়শীর মুখের ওপর গালি দিচ্ছ। রক্ষিতা ও বেশ্যাদের সাহচর্যে তুমি আর কি শিখবে বলে আশা করো?"

আমি উপলব্ধি করলাম যে, মহিলার জিহবা আলগা এবং তার সাথে কোন যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়া সঠিক হবে না। আমার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখলাম। কিন্তু আকবর আলীর বিবি জ্বলে উঠলো, "লাদ্দানের মা, কোনদিন আমার কাছে আসবেন না। এখান থেকে চলে যান এবং বড় বেগমের কাছে যান।"

"আমার ছায়াও তোমার এখানে আসার পরোয়া করে না," বৃদ্ধা বললো।

"জঘন্য মহিলাটি গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধাতে চাচ্ছে. বিবি চিৎকার করলেন। "নোংরা ডাইনি, বাজে বকা বন্ধ কর।"

www.pathagar.com

"আমি কি তোর চাকরানী যে আমার সাথে এই সুরে কথা বলছিস? নাকি আমি তোর কাছ থেকে টাকাপয়সা ধার নিয়েছি? আমি তো সময় কাটাতে তোর কাছে আসি, আর আমি যেভাবে বলি তুইও সেভাবেই কথা বলিস । এরপর আর আসবো না আমি।"

"আমার দরজা আর কখনো কালো করিস না দয়া করে।"

"তোর যদি তাই মনে হয়, তাহলে তো আমি অবশ্যই আসবো। আমি দেখতে চাই যে তুই কি করতে পারিস।"

"তোকে জুতা দিয়ে এমন করে পিটাবো যে তোর খুলিতে আর একটি চুলও থাকবে না।"

"তোর সে সাহস হবে না। সেই ধারও নেই তোর–তোর যে মুখ তা দিয়ে তো নয়ই। সে ভাবে আমাকে ধোলাই করবে। বেচারি!"

"বের হয়ে যা! তা না হলে আমার পায়ের স্যান্ডেল খুলবো।"

বৃদ্ধ মহিলা রুক্ষতার হাসি হেসে উঠলো। "তোর জুতা পেটা না খেয়ে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। নে, শুরু কর। বাপের বেটি হয়ে থাকলে আমার গায়ে জুতা তোল।"

পিতার উল্লেখে আকবর আলী খানের বিবি ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলো। তার মুখ লাল হয়ে গেছে এবং রাগে তিনি কাঁপছেন । "আমি বলছি, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা," কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন।

"জুতা খাওয়ার আগে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না।"

আকবর আলীর বিবি আমার দিকে ফিরলেন । "দেখো," বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন, "সে আমার ওপর ব্যাপারটা চাপিয়ে দিচ্ছে। আমি তাকে ধোলাই না করে যেতে দিচ্ছি না।"

"তার মতো বলতে দিন," আমি বিবিকে বললাম। "উনি তো অতি সাধারণ মহিলার আচরণ করছেন।"

"আমাকে নিয়ে কোন কথা বলবি না, পয়সা থেকে তোর জন্ম। কথা বললে, তোকে ছিঁড়ে ফেলবো অথবা গিলে ফেলবো, আমার উদ্দেশ্যে মহিলা চেঁচিয়ে উঠলো। আকবর আলী খানের বিবি তার এক পায়ের স্যান্ডেল খুলে হাতে নিয়ে বৃদ্ধা মহিলার মাথায় পরপর কয়েকটি আঘাত করলেন।

আমি তার হাত থেকে স্যান্ডেল কেড়ে নিয়ে বললাম , "বেগম তাকে বলতে দিন।"

"আমাকে বাধা দিও না। আমি ওকে কিমা করে ফেলবো।"

"চালাও , চালাও ,"

www.pathagar.com

বৃদ্ধা আরো প্ররোচিত করছিল। আকবর আলী খানের বিবি অন্য পায়ের স্যান্ডেলটি হাতে নিয়ে বৃদ্ধাকে আরো চার পাঁচবার আঘাত করলেন। বৃদ্ধা মেঝের ওপর শুয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে মাটিতে চাপড় দিয়ে চিৎকার শুরু করলো, "হায়, হায়, হায়," সতীনকে বাদ দিয়ে সে আমার উল্লেখ করছিল। "হায়, হায়। আমি খুন হয়ে গেছি.....হায়! আমাকে মেরে ফেলা হচ্ছে।" তার শোরগোলে রান্নাঘর থেকে বাবুর্চি এবং বড় বেগম তার কামরা থেকে বের হয়ে এলেন। বড় বেগমকে দেখে বৃদ্ধার চিৎকার আরো প্রবল হলো, "আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এভাবে আপনি মার খাওয়ালেন।"

"আমি কি করে জানবো যে তুমি বিপদে পড়েছো", বড় বেগম উত্তর দিলেন। "আগে যদি জানতাম তাহলে আমি এসে তোমাকে রক্ষা করতাম। কি হয়েছে?"

বৃদ্ধা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, "পুরুষের কাছ থেকে টাকা বাগাবার তালে থাকা এই মাগী সবকিছুর জন্যে দায়ী। সে আমাকে মেরেছে।"

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এই প্রথম বার আমি বড় বেগমের মুখোমুখি হয়েছি এবং তাকে কি বলবো বুঝতে পারছি না।

"এর মধ্যে তুই আবার এর নাম জড়াচ্ছিস কেন?" আকবর খানের বিবি বললেন।

"ওর নাম আমি বলবো। তুই কি করতে পারবি।"

"কেউ কি আমাকে বলবে যে ব্যাপারটা কি?" বড় বেগম প্রশ্ন করলেন। বৃদ্ধা মহিলা এবার নিজেকে দেখিয়ে বললো, "এই হতভাগী শুধু জানতে চেয়েছিল যে, এই মহিলাটি কে? এটা কি কোন অপরাধ?"

"তুই তো নিজেই আমাকে বলেছিস যে তুই জানিস সে কে", বিবি বললেন, "তাহলে আমাকে আর প্রশ্ন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?"

"খুব শিগগির তুই আমার উদ্দেশ্য জানতে পারবি। আমার অধিকার আমি আদায় করবো। করবোই। এরপর তোর সাথে ফয়সালা হবে।"

বড় বেগম তাদের ঝগড়ায় বাধা দিলেন। বৃদ্ধা মহিলা, তোমার কি সাহস যে তুমি অধিকারের ফয়সালা করার কথা বলছো?" তিনিও রেগে গেছেন।

"আপনার যা ইচ্ছা বলতে পারেন" মহিলা কৃত্রিমতার সুর এনে বললো। "সে অধিকার আপনার আছে। আপনাকে আমি কিছু বলবো না।"

"জাহান্নামে যাও তুমি।! থামাও তোমার গলাবাজি! এখান থেকে বের হয়ে যাও।" বড় বেগম নির্দেশ দিলেন।

"আপনিও আমাকে ছুঁড়ে ফেলতে চান? ঠিক আছে,আমি যাবো।" বৃদ্ধা মহিলা উঠলো, দীর্ঘ জামা ঝেড়ে গজরাতে গজরাতে বের হয়ে গেল। "সে নিজেকে কি মনে

www.pathagar.com

করে, যে আমাকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়। আমি যাবো.....যাবো.....,
কিন্তু দেখে নেব যে, কে আমাকে ফিরে আসতে বাধা দেয়।"

বড় বেগম তার পুত্রবধূর দিকে ফিরলেন; "ডাইনিটার সঙ্গে তোমার তর্কে লিপ্ত হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

"আপনার মাথার কসম আম্মিজান, আমি একটি কথাও বলিনি।" আকবর আলীর বিবি ব্যাখ্যা করলেন। "সে এমন আচরণ শুরু করেছিল যেন বিছুটির গাদা থেকে সবেমাত্র উঠে এসেছে। এই বেচারি মহিলার প্রতিও খারাপ কথাবার্তা বলেছে।" বড় বেগম ভ্রু কুঁচকালেন। বৃদ্ধা মহিলার আচরণে আমি খুব একটা দমে যাইনি। কারণ তাকে কিছুটা বাতিকগ্রস্ত বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বড় বেগমের অহংকারী দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করলো। বাড়িটির আমার অংশে চলে যাওয়ার সময় আমি তার পুত্রবধূকে বলতে শুনলাম, "বেটি, তুমি অকারণে বেচারি বৃদ্ধাকে মেরেছো। সাধারণ একজন পথচারিনীর পক্ষ কেন তুমি নিতে গেলে?"

"সে খুব বাজে ব্যবহার করেছে এবং তার যা প্রাপ্য ছিল তা পেয়েছে," রাঁধুনী বলে উঠলো। "কিন্তু কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, একজন বেশ্যার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের কি কারণ থাকতে পারে, বিশেষ করে সে যদি মনিবের রক্ষিতা হয়? উনি যদি তাকে এখানে নিয়ে আসতেন তাহলে আপনার সাথে অবশ্যই একটি বিবাদ হতে পারতো। কিন্তু এখন আপনি সেখানে গেছেন এবং স্বয়ং দাওয়াত দিয়ে আপনার বাড়িতে এনেছেন?"

"ওকে এ বাড়িতে এনে তোলার সাহস আকবরের নেই, " বড় বেগম বললেন, "তাহলে আমি আছি কেন? বাহির বাড়িতে কে তার সাথে মেলামেশা করে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া এ বাড়ির ভিতরে কারো কোন কাজ থাকতে পারে না। তোমাদেরকে আমি আকবর আলী খানের আব্বার কথা বলছি। বহু বছর ধরে তার সম্পর্ক ছিল হোসেন বান্দী নামে এক বাঈজির সাথে। এ বাড়িতে একটু জায়গা পাওয়ার জন্যে মেয়েটি অনেক অনুনয় বিনয় করেছে, কিন্তু আমি কিছুতেই রাজী হইনি। কারণ আমি জানতাম যে, একবার তাকে মেহমান হিসেবে অন্দরে প্রবেশের সুযোগ দিলে আমার স্বামী তাকে স্থায়ীভাবে বাড়িতে রেখে দেয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলবে। সাপকে নিজের বুকে রেখে পোষার লোক ছিলাম না আমি। কারো মানমর্যাদা সম্পূর্ণ তার নিজের হাতে। আজকালকার মেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেই ভাবে না।"

"বেগম সাহিবা, আপনার কথাগুলো কতো সত্য।" রাধুনী বিস্ময়ের সাথে বললো। "বিবাহিত গণ্যমান্য লোকদের বাড়িতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের কি কাজ? আমাদের মুরুব্বীরা বলতেন, কোন পরিস্থিতিতে পুরুষ মানুষদের অন্দর মহলে প্রবেশের

www.pathagar.com

অনুমতি দেয়া গেলেও খারাপ স্বভাবের মেয়েদের কখনো অন্দরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া উচিত নয়!"

"এর কারণ, পুরুষরা অন্দরে এলেও তারা জোর করে মহিলাদের সাহচর্য পেতে পারে না। খুব আগের কথা নয়, সিপাহী বিদ্রোহের সময় হোসেন খানকে আমাদের বাড়িতে অনেক মাস পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয়েছিল এবং তিনি লুকিয়ে ছিলেন অন্দর মহলে। একই মহলে আমিও ছিলাম। কিন্তু একটি বারের জন্যেও তিনি আমার পরিধেয় বস্ত্রের কোন অংশ দেখার বা আমার কণ্ঠ শোনার সুযোগ পাননি। আমি সারাদিন ভিতরের আঙ্গিনায় কাটাতাম এবং পরিচারিকা ও রাঁধুনীর সাথে কথা বলতাম।"

রাঁধুনী আকবর আলী খানের মায়ের সাথে এমনভাবে কথা বলছিল যেন কোন বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি করছে। "এর কারণ আপনার আম্মা অত্যন্ত ধার্মিক মহিলা ছিলেন, যিনি মহানবীর কন্যার উদ্দেশ্যে যে দোয়া করা হয় সে দোয়া লাভের উপযুক্ত। একমাত্র পবিত্র মহিলারাই এর প্রাপ্য। আরেকটি কারণ হচ্ছে, আপনি যদি বেশ্যাদের সাহচর্যে থাকেন তাহলে কি করে নিজেকে রক্ষা করার আশা করতে পারেন? ওইসব নোংরা মহিলাগুলোর শরীর নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত। খয়ের ও চুনের পাত্রে আঙ্গুল দেয়া থেকে কে তাদেরকে বিরত রাখতে পারে। আপনি না দেখলে তো ওরা আপনার গ্লাসে পানিও খাবে। ওদের ছায়া পর্যন্ত কারো মাড়ানো উচিত নয়।"

"তাদের সাথে আসলেই কারো কোন কাজ বা সম্পর্ক থাকা উচিত নয়।" বড় বেগম বললেন, "তুমি যদি তোমার ওপর তাদের ছায়া পড়তে দাও তাহলে তাদের আছর তোমার ওপর পড়তে পারে। ওদের পানের পিকের ওপর যদি তোমার পা পড়ে তার আছরও তোমার ওপর পড়বে। তাছাড়া নানা ধরনের তাবিজ কবজ ও ওষুধ তৈরি করে ওরা মানুষকে প্রলুব্ধ করতে পারে। মেয়েগুলোর কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই এবং কোনদিকেই তাদের কোন মনোযোগ নেই।" রাঁধুনীর দিকে ফিরে তিনি একটানা বললেন। "ওই মেয়েলোকটি যদি খাবারে কিছু দিয়ে রাখে তাহলে কি হবে? তুমি নিশ্চয়ই মির্জা মোহাম্মদ আলীর ছেলের বউকে জানো, যার রাতের খাবারের সাথে তার সতীন মিশিয়ে দিয়েছিল ওষুধ। এরপর থেকে সে বাঁজা। সে যে শুধু এ জগতই হারিয়েছে তা নয়, পরজগতেও তার আর পাওয়ার কিছু নেই।"

"তা কি আর আমি জানি না," রাঁধুনী বড় বেগমের সাথে সুর মিলালো।

"সতীনদের সাথে ঘর করা জটিল এক ব্যাপার। দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বজায় থাকলেই শুধু এ সম্পর্ক টিকে। কখনো কখনো তাতেও কাজ হয় না। আমার বেলায়ই কি হয়েছে তা দেখো! পালকির বেহারার ছোট মাগীটা আমার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে

www.pathagar.com

তার জানা সকল কৌশল কাজে লাগিয়েছে,–কুফরী কালাম, তাবিজ, যাদুটোনা-সবকিছু। এগুলো আমি পেতাম আমার বালিশের নিচে।"

"আপনি কেন তাকে এ বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলেন," রাঁধুনী জানতে চাইলো।

"সে সামান্য একটা চাকরানী ছিল। আমি কি করে জানবো যে আমার স্বামীর সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক চলছে? যেদিন আমি জানতে পারলাম, সেদিনই তো বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।"

"বেগম সাহিবা, আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, চাকরানী হিসেবে সে খুব ভালো ছিল এবং দাসীর মতো কাজ করতো।"

"সে কারণেই তো আমার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব হয়েছিল যে, সে আমার স্বামীর সাথে আমার স্থান দখল করে নিয়েছে," বড় বেগম বললেন। এরপর তিনি রাঁধুনীকে আরেকটি কথা বললেন, "আর এইমাত্র আমার ছেলের বউ যে বুড়ীটাকে বের করে দিল, তুমি জানো , আমার স্বামীর সাথে এই মাগীরও সম্পর্ক ছিল।"

"তা কি করে হয়. বেগম সাহিবা?" রাঁধুনী হেসে ফেললো।

'আমি কোন বাজে কথা বলছি না। সেজন্যেই তো সে বারবার বলছিল, "আমি আমার অধিকার আদায় করবো।"

"রক্ষিতা.....পুত্রবধূ" আকবর আলী খানের বিবির দিকে ফিরে রাঁধুনী উচ্চারণ করলো। "আপনার শ্বশুরের রক্ষিতাকে কি করে আপনি জুতা পেটা করলেন?"

"এই জমানার মেয়েগুলোর কোন বিচার বিবেচনা নেই, বড় বেগম বলে চললেন, "আমি তো তার মুখের ওপরই বলবো যে সে যা করেছে আমি মানতে পারি না। আজ যদি বাজারের সস্তা এক বেশ্যার কারণে সে তার শ্বশুরের রক্ষিতাকে মারতে পারে, তাহলে আগামীকাল আমাকে মার খেতে হবে।"

"নাউজুবিল্লাহ। কিন্তু কেউ জানে না," রাঁধুনী বললো।

আকবর আলীর বেচারি বিবি ভেঙ্গে না পরা পর্যন্ত দু'জন এভাবে বলে চলেছিল। আমি এতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলাম যে আমার মনে হচ্ছিল যে আমি জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর শুয়ে আছি। এই দুই বৃদ্ধার চোখ ওপড়ে ফেলার ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। "মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখো," মির্জা রুসওয়া বললেন,

"এভাবে যদি তোমার ক্রোধকে সুযোগ দাও, পরে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।"

"মির্জা সাহেব , আমার মেজাজ খারাপ করার যৌক্তিকতা ছিল। এতো ঘৃণার দৃষ্টিতে কাউকে দেখা রীতিমতো অমানবিক ব্যাপার।"

www.pathagar.com

'আমার মনে হয় না যে, এতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠার মতো কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল," মির্জা রুসওয়া বললেন, "ওই দুই বৃদ্ধা যা বলছিলেন আমার বিশ্বাস তারা দোষনীয় কিছু বলছিলেন না। কিন্তু আরেক বৃদ্ধাকে জুতাপেটা করা কিছুতেই ঠিক হয়নি। এটাই সত্য, তুমি পছন্দ করো আর নাই করো।"

"বাহ! মির্জা সাহেব, বাহ্! কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল সে সম্পর্কে কি অদ্ভুত ধারণা আপনার!"

"মোহতারিমা, এটি আমার অভিমত। আমি মনে করিনা যে দোষ পুরোপুরি তোমার। আসলে দোষ করেছে আকবর আলীর বিবি।"

"কেন বেচারি ভদ্রমহিলা কি করেছে?"

"আমার বিবি যদি এহেন আচরণ করতো তাহলে আমি তাকে একটি পালকিতে উঠিয়ে ওর বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম এবং পরবর্তী ছ'মাস তার মুখ দেখতেও অস্বীকার করতাম। যাহোক তুমি আমাকে বলো যে আকবর আলী যখন ঘটনাটি শুনলেন তখন তিনি কি বললেন?"

"তিনিও লাদ্দানের মায়ের বিরুদ্ধেই ক্ষুব্ধ হয়ে নির্দেশ দিলেন যে তাকে যেন এ বাড়িতে আর কখনোই প্রবেশ করতে দেয়া না হয়। বৃদ্ধা মহিলা অনেক মাস পর্যন্ত নিজেকে দূরেই রাখেন। কিন্তু আকবর আলীর আব্বাজান এসে যখন জানতে পারলেন যে কি ঘটেছে, তখন তিনি তার পুত্রবধূকে গালমন্দ করলেন এবং লাদ্দানের মা আবার সে বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলো।"

"বৃদ্ধ লোকটির মাথার নাটবল্টু তখনো ঠিকভাবে কাজ করছিল।"

"আমি জানি না যে লোকটি কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন না পাগল ছিল। লাদ্দানের মা নিয়মিত লোকটির পা মর্দন করতো, অতএব তিনি তার পক্ষ নিতেন। তাছাড়া এক সময়ে মহিলা তো তারই রক্ষিতা ছিল।"

"লোকটির স্থিরতার জন্যে তাকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। লাদ্দানের মা তার তরুণ বয়সে কি একজন বাঈজি, না সম্মানিতা মহিলা ছিলেন? আর রাঁধুনী ওই বাড়িতে কাজ নেয়ার আগে তার পেশা কি ছিল?"

"লাদ্দানের মা ছিল এক জুয়াড়ীর বিবি এবং যৌবনে তার খুব খারাপ সময় কেটেছে। আর রাঁধুনী সান্দিলার এক চাষী মহিলা। তার ছোট ছেলে আকবর আলীর পিতার অধীনে চাকুরি করতো, আর এক মেয়েকে লক্ষ্ণৌর বাইরে কোথায়ও বিয়ে দিয়েছে।"

"রাঁধুনীর সাথে কি আকবর আলী খানের পিতার কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল?"

" কাউকে তো অবশ্যই সত্য বলতে হবে, কারণ তাকে আল্লাহর মুখোমুখি হতে হবে। পুরো মহল্লা রাঁধুনীকে একজন ভালো মহিলা বলে জানে। সে যৌবনেই বিধবা

www.pathagar.com

হয়েছে এবং আকবর আলী খানের বাড়িতে কাজ নিয়েছে। কেউ তাকে সরল সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে দেখেনি।"

"আমি এখন সব তথ্য পেয়ে গেছি, তোমার মনে যে প্রশ্ন আসে তুমি তা করতে পারো।" মির্জা রুসওয়া কিছুটা কর্তৃত্বের সুরে বললেন।

"আপনি কোন মামলার নিষ্পত্তি করতে চাচ্ছেন?"

"অবশ্যই ! এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মামলা। বড় বেগমের মন্তব্যে তুমি অত্যন্ত রুষ্ট ও কাতর হয়েছো। তার এবং অন্যান্য পূণ্যবান মহিলা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো কিছু কথা বলছি। এই মহিলারা তাদের সারাটা জীবন তাদের বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে অবরুদ্ধ অবস্থায় কাটান এবং বন্দী জীবনের সকল যাতনাই ভোগ করেন। আমি মনে করি। যেসব মহিলার সুনাম বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি তাদের সাথে এই মহিলাদের মেলামেশার সুযোগ দেয়া উচিত–কোন পথচারিনীর সাথে অথবা যারা তাদের বেশ্যাবৃত্তির বিষয়টি গোপন রেখে ব্যভিচার চালিয়ে যেতে সক্ষম। সৎ মহিলারা যদি এ ধরনের মহিলাদের কঠোরভাবে বিচার করে তাহলে এতে কারো বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তারা ধৈর্যের সাথে অন্য মহিলাদের নিয়ে তাদের স্বামীদের যৌবন ও অর্থ ব্যয় করার বিষয়গুলো সহ্য করে। এই ধরনের পুরুষেরা পুরুষেরা যখন তাদের অর্থ ও যৌবন দু'টোই হারায় তখন তাদের রক্ষিতারা তাদেরকে আর কোন মূল্য দেয় না এবং তারা স্ত্রীদের কাছে ফিরে আসে, দুঃখের দিনে তারাই থাকে তাদের একমাত্র সঙ্গী। তাহলে এই ভালো স্ত্রীরা কেন অহংকারী, অসহিষ্ণু, রুক্ষ ও ক্ষমাহীন বৈশিষ্ট্যের হবে না? যারা অনুশোচনা করে, আল্লাহও তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু এই ভালো মহিলারা তা করে না। ভালো মহিলারা যে সন্দেহপ্রবণ ও বাজে মহিলাদের ঘৃণার চোখে দেখে তার আরেকটি কারণ আছে। তুমি ভালো করেই জানো যে, একটি মুখ যতো সুন্দরই হোক না কেন এবং কারো স্ত্রী যতো ভালো চরিত্রের হোক ও যতো ভালোভাবেই সে সংসার দেখভাল করুক না কেন, লোকটি রাস্তার মহিলাদের খপ্পরে পড়বেই, তার চেহারার কোন বৈশিষ্ট্য থাকুক বা না থাকুক এবং অন্য সকল গুণের অভাব তার মাঝে থাকলেও। এসব কারণে সদগুণসম্পন্ন স্ত্রীরা এসব মহিলাদের সন্দেহ করে যে তারা তাদের স্বামীদের মন গলাতে তাবিজ ও যাদুটোনার প্রয়োগ করে। এটাও উল্লেখযোগ্য যে, এমন পরিস্থিতিতেও তারা কখনো তাদের স্বামীদের দোষ দেয় না এবং খারাপ মেয়ে মানুষের অশুভ আছড়ের দোষই দেয়। তাদের ভালোবাসার এর চাইতে ভালো দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?"

"আপনার সব কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু পুরুষগুলো এতো আহম্মক হবে কেন?"

"পুরুষ মানুষ বৈচিত্র্য পছন্দ করে। এক অবস্থায় থাকতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেটি যতো উপভোগ্যই হোক না কেন। অতএব, তারা পরিবর্তন আকাংখা করে। তারা

www.pathagar.com

নতুন ধরনের স্বপ্নের অতীত স্বাদ পায় বাজারের মহিলাদের সাথে মিলিত হয়ে। এমনকি তারা যখন বেশ্যাগমণে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এক বেশ্যায় স্থির থাকে না, বরং এক বেশ্যালয় থেকে আরেক বেশ্যালয়ে গিয়ে নতুন নতুন বেশ্যার সাথে শয়ন করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের চেষ্টা করে।"

"সব পুরুষই নিশ্চয়ই এক ধরনের নয়।"

"তা শুধুমাত্র সামাজিকভাবে তারা হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে বলে ভয়ের কারণে এবং নিকটজনের কাছে নিন্দিত হওয়ার ভয়ে। কিন্তু একবার কোন তরুণ শয়তানের ভাইদের সাথে সম্পর্ক গড়তে শুরু করলে এবং তাদের কাছে থেকে নতুন ও অনাস্বাদিত পরিতৃপ্তির কথাবার্তা শুনতে থাকলে তার মাঝেও অদ্ভুত এক আকাংখার সৃষ্টি হয় এবং তখন কে তাকে নিয়ে কি বললো তার কোন পরোয়াই সে আর করে না। তুমি ভালো করে জানো যে, কোন লোক যখন প্রথম বেশ্যালয়ে যেতে শুরু করে তখন এটিকে গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কেউ যাতে তাকে না দেখে, তার কথা যাতে কেউ শুনতে না পায় সে ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে সে। অন্য লোকের উপস্থিতিতে সে যে শুধু তার কথাবার্তা বন্ধ থাকে তা নয়, যখন তাকে বেশ্যার সাথে একা রেখে যাওয়া হয় তখনও সে মুখ খোলা রাখতে সক্ষম হয় না। এই লাজুকতা শিগ্‌গিরই দূর হয়ে যায় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে পুরোপুরি অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়ে। অতঃপর সে দিনের বেলায় প্রকাশ্যে ধুপধাপ শব্দ তুলে বেশ্যালয়ের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে, তার বাঈজি-রক্ষিতার সাথে খোলা গাড়ীতে উঠে বৈকালিক বায়ু সেবন করে, হাত ধরাধরি করে মেলা ও মাহফিলে যায় এবং এ নিয়ে গর্ব অনুভব করে।"

"আপনি যথার্থই বলেছেন। বড় বড় শহরগুলোতে এসব ব্যাপারকে তেমন নিন্দনীয় বলে বিবেচনা করা হয় না।"

"দিল্লি ও লক্ষ্ণৌর মতো শহরগুলোর পতনের এটিই প্রধান কারণ। গ্রামে ও ছোট শহরে কেউ সহজে চরিত্রহীন মানুষের খপ্পরে পড়ে না, যারা তরুণদের পাপের পথে নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ছোট শহরের বেশ্যাদের বড় শহরে তাদের সমগোত্রীয়দের মতো সাহস ও ক্ষমতা নেই। তারা বড় বড় জমির মালিকদের অধীনস্থ হয়ে থাকে তাদের জীবিকার জন্যে। তাছাড়া তাদের পৃষ্ঠপোষকদের অনুগ্রহের কাছে পণবন্দী থাকে তাদের জীবন। জোতদারদের সন্তানদের সাথে মিলিত হতে অবশ্য তাদেরকে যথেষ্ট গোপনীয়তার আশ্রয় নিতে হয়। শহরে বেশ্যাদের ওপর কারো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অচল। কারো ভয় করে না তারা, কারণ তারা যা খুশী তা করার ব্যাপারে স্বাধীন। ব্যভিচারী হওয়ার জন্যেই তাদেরকে অনুমতি দেয় হয়। অতএব ফলাফল বোঝাই যায়।"

"কিন্তু কোন গেঁয়ো যখন ভুল পথে যায়, তখন সে সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়।"

www.pathagar.com

"কোনকিছুর মূল্য যে কতো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে তা যে জানে না, সে তাতে আসক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। শহরবাসীরা এ ধরনের বিনোদনের সাথে পরিচিত এবং এগুলোকে তেমন গায়ে মাখায় না। গ্রামের লোকজনের এককেন্দ্রিকতার কারণে নতুন কিছুতে তারা অতিমাত্রায় উৎসাহী থাকে।"

"উমরাও জান, আমাকে বলো যে, তোমার সাথে যে একটি মেয়ে ছিল তার কি হলো? কি যেন নাম ছিল তার.....?"

"আবাদির কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে মেয়েটি? খুব সুন্দরী ছিল সে। ওর বয়স যখন মাত্র দশ বার বছর তখন আমি ওকে দেখেছিলাম। যৌবনে নিশ্চয়ই তার সৌন্দর্য আরো বিকশিত হয়েছিল?"

"আপনার স্মৃতিশক্তি সত্যিই চমৎকার, মির্জা রুসওয়া?"

"কারো পক্ষে ওই ধরনের কিছু ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি শুধু অবাক হয়ে ভেবেছি যে সে যখন যৌবনে পদার্পণ করবে তখন সে কেমন হবে? নিশ্চয়ই সে অতি ব্যতিক্রমী ধরনের সুন্দরীতে পরিণত হয়েছিল?"

"ও তাই! আপনি দেখছি আবাদির গুণগ্রাহীদের একজন ছিলেন?"

"উমরাও জান, যখনই তোমার চোখে কোন মহিলাকে সুন্দরী বলে মনে হবে, তখন তুমি আমার কথা ভেবো। এবং যদি সম্ভব হয় তাহলে তার প্রেমিকদের তালিকায় আমার নামটিও লিখে দিও। তাকে পাওয়ার চেষ্টায় আমার জীবনও যদি যায় তাহলে আমার নামে দোয়া উচ্চারণ করো।"

"কিন্তু আমি যদি কোন সুদর্শন পুরুষকে দেখে মুগ্ধ হই, তাহলে কি করবো?"

"তাহলে তার প্রেমিকাদের তালিকায় তোমার নামটি অন্তর্ভুক্ত করে দিও, আর আমার নামটি দিও তার বোনের প্রেমিকের তালিকায়। তবে শর্ত থাকবে যে সে যাতে শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ মহিলাদের শ্রেণীর্ভূক্ত না হয়।"

"কি চমৎকার ! এর মধ্যে আবার আপনি আবার শরীয়ত টেনে আনছেন কেন?"

"কারণ এটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশেষ করে ইসলামী শরীয়ত, যেখানে কোনকিছুই বাদ পড়েনি।"

"আপনি শুধু একথা কেন বলছেন না যে, আমি জানি এটি শরীয়তের নিষিদ্ধ হলেও সামাজিক রীতি অনুসারে মার্জনীয়।

"উমরাও জান, জীবনে আমার নীতি একটাই এবং তা হচ্ছে, গুণবতী কোন মহিলার আকাংখা। সেক্ষেত্রে তার ধর্মবিশ্বাস, জাতপাত যাই হোক না কেন। আমার আপন মা ও বোনের ক্ষেত্রেও আমি সে বিশ্বাস নিয়েই দেখি। নিরীহ মহিলাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা

www.pathagar.com

আমার দুঃখের কারণ এবং আমার যদি উপায় থাকতো তাহলে আমি ভালো গুণসম্পন্ন মেয়েদের বিপথে নেয়ার কারণে তাদেরকে দেয়ালে গেঁথে ফেলতাম। একই সাথে যেসব মহিলা পুরুষদের সাথে উদার আচরণ করে তাদের আনুকূল্য গ্রহণে আমি কোন দোষ দেখি না।"

"আলহামদুলিল্লাহ।"

"আমাদের এই অর্থহীন আলোচনা না করাই ভালো। আবাদি জান সম্পর্কে আমাকে বলো।"

"মির্জা রুসওয়া, শহরের সবচেয়ে সুন্দরী বাঈজিতে পরিণত হলেছিল সে। তাকে পূর্ণ যৌবনাবতী অবস্থায় দেখলে আপনি নিশ্চয়ই বলতেন :

ও আমার হৃদয়, বালিকা থেকে কিভাবে সে পরিবর্তিত হলো একটি মহিলায়, তাকে পিছনে ধরে রাখার কি অর্থ আছে নিজের ভাবনাগুলোকেই কেন যাচাই করি না।"

"সে কি আন্দামানে চলে গেছে, অথবা আরো দূরবর্তী কোন স্থানে ? সে কি কোন দুঃখে পতিত হয়েছিল, যে কারণে তার ব্যাপারে এতো বিষাদের সাথে বলছো?"

"আমাদের কাছে এবং বাকী দুনিয়ার কাছেও সে এখন মৃত।"

"শয়তানের কসম, সেই সুন্দরী এখন কোথায়?"

"এক হাসপাতালে। আর কোথায় থাকতে পারে সে?"

"তুমি কি বলতে চাইছো যে, তার যৌবন বিকশিত হতে শুরু করেছিল এবং অদ্ভুতভাবে বিকাশের সময়ই সে বিনষ্ট হয়ে গেছে।?"

"এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তার সেই বিকশিত হওয়ার সাথে আরো অদ্ভুত ফল ধরেছিল। সে তার চেহারা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ঘষা খাওয়া থালার তলার মতো হয়ে গিয়েছিল তার ত্বক। তার সকল পাপকর্ম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। বেচারি এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে।

"কি করে এমনটি হলো?"

"যেদিন তার জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই অশুভ আছড় পড়েছিল তার ওপর। তাকে একটি গুণসম্পন্ন নারীতে পরিণত করার জন্যে আমি সকল যাতনা সহ্য করলেও আমার সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে। তার শিক্ষার জন্যে আমি একজন গানের উস্তাদ ও মৌলভী সাহেবকে নিয়োগ করেছিলাম। কিন্তু এসবে তার মন ছিল না। সে যখন পুরুষ মানুষ গ্রহণের বয়সে পৌঁছলো, তখন আমি তার নিজস্ব একটি কামরা দিলাম। অতঃপর শহরের গুন্ডা বদমাশরা তার কাছে আসতে শুরু করলো। তার কোন বাছবিচার ছিল না। যে আসতো তাকেই স্বাগত জানাতো। অতএব, সারাক্ষণ তাকে নিয়ে ঝগড়াবিবাদ, রেষারেষি, হাতাহাতি, জুতাপেটা করার ঘটনা লেগেই থাকতো। মনে হতো

www.pathagar.com

যেন সেখানে নরক ভেঙ্গে পড়েছে। প্রথমে তাকে বুঝালাম। তাকে ধরে মারলাম কিন্তু কোন কিছুই তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন এলো না। আমি রীতিমতো ত্যক্তবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওই ছিনালটা পুরুষ খেকো হয়ে উঠেছিল। হোসাইনী খালার ছেলে চুট্টান তার সাথে খেলা করতে আমাদের বাড়িতে আসতো। আমি তাকে আসার অনুমতি দিয়েছিলাম যে আবাদি তো মাত্র শিশু। কিন্তু নিজের চোখে নোংরামি দেখে চুট্টানের যাতায়াত বন্ধ করে দিতে হয় আমাকে। এরপর মেয়েটি আমার এক পৃষ্ঠপোষেকের সাথে দহরম মহরম শুরু করলো। লোকটি মশহুর এক পরিবারের। তার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। কিন্তু কোন মানুষ এত খারাপ হতে পারে সে তাই ছিল এবং আমার প্রতি তার কোন শ্রদ্ধা, সহানুভূতি অবশিষ্ট রইলো না। একদিন সন্ধ্যায় আমি শুনলাম, সে আবাদিকে বলছে, আমি তোমার সুন্দর মুখখানি ভালবাসি! কিন্তু উমরাও জানের ভয়ে কিছু করতে পারিনা?"

"আমি আপনার সাথে যাব," আবাদি উত্তর দেয়। "ওটাতো শুধু অজুহাত। তাকে ভয় করার কিছু নেই।"

একদিন দেখি চুট্টান আবাদির গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, "তুমি কি সুন্দর, অথচ কেমন নিষ্ঠুর।" আবেগ জড়ানো তার কণ্ঠ।

"তাতে কি তোমার আসে যায়!"

চুট্টান আবাদির গালে চুমু দেয়, "তোমার মনে হয় আমার কিছু আসে যায় না? তোমার কারণে আমি মরে যাচ্ছি, তোমার জন্যে মরলেও ভালো।"

"চুট্টান সাহেব," আবাদি বাঁকা কণ্ঠে বললো, "আমি অনেককে মৃত্যুর প্রান্তে উপনীত হতে দেখেছি, কিন্তু কখনো কোন জানাজায় শরীক হইনি। তুমি আমার জন্যে মরতে রাজী, কিন্তু তুচ্ছ চার আনা খরচ করতে পারো না।"

"চার আনা! তোমার জন্যে তো আমি জীবন দেব।"

"তোমার এই নগণ্য জীবন নিয়ে আমি কি করবো?"

"আমার জীবনটা কি এতই মূল্যহীন?"

"তুমি শুধু বড় বড় কথা বলতে পারো। তোমার পকেটে যদি চার আনা পয়সা থাকে, তাহলে আমাকে দাও।"

"তুমি জানো যে, সিংহাসনচ্যুত রাজার পরিবারের সদস্য আমি এবং আম্মিজান নিয়মিত ভাতা লাভ করেন। এ মাসের ভাতা এখনো তোলেননি। আল্লাহর কসম কেটে বলছি, পরশু দিন আমি অবশ্যই তোমার জন্যে কিছু পাবো।"

"ঠিক আছে, এখন আমাকে জ্বালাতন করো না।"

"আমাকে আরেকটি চুমু দিতে দাও।"

www.pathagar.com

চুট্টান আবাদিকে জড়িয়ে ধরলো। আবাদি তার পকেটে হাত দিয়ে পকেট থেকে তিনটি পয়সা বের করে আনলো। পয়সাগুলো দেখে চুট্টানের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"আমার মাথার কসম, এ পয়সা আমি দিতে পারবো না," প্রতিবাদ করলো চুট্টান।

"এ পয়সা আমার বড় বোনের, যিনি আমাকে রং ও দাঁতের মাজন কিনে নিতে বলেছেন।"

"আমিও তোমার মাথার কসম কেটে বলছি–আমি, পয়সাগুলো ফেরত দিব না।"

"এ দিয়ে তুমি কি করবে? পরশু দিনই তুমি তোমার চার আনা নিও।"

"বাহ! আমি কিছু চাটমশলা কিনবো।"

"তিন পয়সার চাটমশলা! ঠিক আছে, তুমি এক পয়সা রেখে দাও।"

"তিন পয়সা দিয়েও খুব বেশী চাটমশলা পাওয়া যাবে না। আমি ক'দিন থেকে খেতে চাচ্ছি, কিন্তু মোহতারিমা বলছেন যে এতে আমার পেট জ্বলবে। একদিন আমি লুকিয়ে এক আনার কিনে পুরোটা খেয়েছি। কিন্তু আমার পেটের কিছু হয়নি।"

নিজেকে বললাম, হাভাতে এই মেয়েটির কি ঘটতে পারে, যে সামনে যা পাবে গোগ্রাসে গিলবে। আমি যদি সামান্য চাটমশলা খাই, তাতেই আমার বদহজম হয়।

"তুমি নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষের সময় তাকে খরিদ করেছিলে," মির্জা রুসওয়া বিস্ময়ের সাথে বললেন।

"আপনি ঠিক বলেছেন। সামান্য একটি টাকার জন্যে ওর মা যখন ওকে আমার হাতে তুলে দেয় তখন তারা তিনদিনের অভুক্ত ছিল। আমি তাকে এক টাকার সাথে কিছু খাবারও দেই। ওর মায়ের জন্যে খুবই দুঃখ লেগেছিল আমার এবং তাকেও আমার সাথে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু সে রাজী হয়নি।"

"সেই দুর্ভাগা মহিলা কি পরে কখনো তোমার সাথে দেখা করতে এসেছিল?"

"বেশ ক'বার । তার সন্তান যত্নের সাথে লালিত হচ্ছে দেখে সে খুব খুশী হয়েছিল এবং আমাকে দোয়া করেছিল। বছরে দু'তিনবার আসতো এবং আমার সাধ্যে যা কুলাতো আমি তাকে দিতাম। এরপর বহুবছর ধরে আর আসেনি। আল্লাহ জানেন যে এখনো মহিলাটি বেঁচে আছে না মারা গেছে।"

"আমাদের কাহিনীতে ছেদ পড়েছে। আচ্ছা, চুট্টান কি তাকে চার আনা দিয়েছিল?"

"আমি তা পুরোপুরি স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু সেদিন চুট্টান চলে যাওয়ার পর আমি আবাদিকে চোরা মার দেই। পয়সাগুলো ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে চকের দিকে ছুঁড়ে দেই।

www.pathagar.com

"আমার বাড়ির পাশেই আরেকটি ছোট বাড়ি ছিল, যা হোস্না নামে এক তরুণী বাঈজির দখলে ছিল। আবাদি তার খুব ঘনিষ্ট বান্ধবীতে পরিণত হয় এবং হোস্নার সকল বদভ্যাস সে রপ্ত করে। হোস্নার কাছে যারা আসতো তারাও বদ স্বভাবের লোকজন ছিল। একজন তাকে এক পোয়া পুরি আনার জন্যে পয়সা দিতো, আরেকজন দিতো আমের ঝুড়ি কিনে আনতে, যেগুলো দু'আনায় একশ'টি পাওয়া যেত। তার যা প্রাপ্য তাই সে পেয়েছে। কারণ ভালো কিছুর জন্যে কোন আকাংখা তার ছিল না। একজনের কাছ থেকে দুই গজ নয়নসুক কাপড় অথবা আরেকজনের কাছ থেকে মখমলের জুতা। যখনই সে কোন মেলা বা মাহফিলে যেত, সব সময় তার সাথে ক'জন বদমাশ থাকতো। তারা অভদ্র গোছের লোক , যাদের মাথায় বড় পাগড়ি, পরনে ধুতি বা পাজামা থাকতো। তারা হাতে লাঠি বহন করতো। আর গলায় পরতো ফুলের মালা। এছাড়াও তাদের সাথে থাকতো হোস্না, যে হাঁটার সময় ইচ্ছা করে তার নিতম্ব দোলাতো। কোন সরাইখানায় গিয়ে দেশী মদের বোতল নিয়ে বসতো এবং যখন সেখানে থেকে বের হতো তখন হাঁটতো টলতে টলতে, গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে কিংবা মুখে যা আসে তাই বলতে বলতে। হোস্নাও কারো বাহুতে লুটিয়ে পড়তো, আবার একটু পরই আরেকজনের গলা জড়িয়ে ধরতো। কোনকিছুর নিষ্পত্তির প্রয়োজন পড়লে রাস্তার মাঝখানে তারা দাঁড়াতো, কাউকে দেখে নেয়ার শপথ উচ্চারণ করতো, ঝগড়া করতো, জুতা হাতে মারামারি করতো। তাদের অধিকাংশই স্খলিত পায়ে চলতে গিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়তো। শেষ পর্যন্ত তাদের গুটি কয়েক মেলা পর্যন্ত পৌছে সোজা দেশী মদের আড্ডায় বসতো এবং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তো। তাদের মধ্যে যে চতুরতম সে সকলকে পাশ কাটিয়ে হোস্না বেগমকে নিয়ে কেটে পড়তো। সে হয় তাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেত, অথবা হোস্নার কামরায় এসে রাত কাটাতো। মেলা শেষ হলে দলটি আবার একত্রিত হয়ে হোস্নার বারান্দার সামনে আসতো। তাদের ওপর যে লোকটি কৌশল খাটিয়ে হোস্নাকে নিয়ে ভেগে এসেছে তার উদ্দেশ্যে গালি ছুঁড়তো এবং জানালা লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারতো। হোস্না ভিতরে থাকলেও এসব আমলেই আনতো না। এরপর কোতোয়ালী থেকে একজন পুলিশ এসে হাজির হতো এবং সমাবেশটিকে অবৈধ ঘোষণা করে দ্রুত ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ জারী করতো।

"এ ধরনের জীবন চাইতো আমার আবাদি। কিন্তু কি করে আমার পক্ষে এই অনুমতি দেয়া সম্ভব? অতএব সে জনৈক হোসেন আলীর খপ্পরে পড়লো। যে লোকটি কোন এক নওয়াবের অনুচর ছিল এবং মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসতো। হোসেন আলী তাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তার বিবি তুলকালাম কান্ড বাঁধিয়ে ফেলতো এবং শেষ পর্যন্ত গাল ফুলিয়ে থাকতো। আবাদির প্রতি হোসেন আলী এতোটাই বিমুগ্ধ ছিল যে তার বিবি যে তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে তা নিয়েও তার মধ্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব ছিল না। কিন্তু সত্যি সত্যিই যখন চলে গেল তখন রান্না করার সমস্যা দেখা দিল। কারণ কি করে চুলা

www.pathagar.com

ধরাতে হয় আবাদি তাও জানতো না। পুরনো ধোঁয়া উদগীরণকারী একটি চুলায় একা একা ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাতে চেষ্টা করতো। কিছু সময়ের জন্যে সে লোকটির সঙ্গে কাটালো। তার একটি সন্তানও হয়েছিল। অবশ্য কেউ জানে না সন্তানটি হোসেন আলীর না অন্য কারো। যাহোক দু'মাসের মধ্যে শিশুটি মারা যায়। হোসেন আলীর বিবি খোরপোশের দাবিতে মামলা করলে আদালত হোসেন আলীকে নির্দেশ দেয় তাকে মাসিক দেড় টাকা হারে পরিশোধ করতে। হোসেন আলী নওয়াবের কাছ থেকে মাসে মাত্র তিন টাকা পেত, কি করে অবশিষ্ট দেড় টাকায় তার ও আবাদির পক্ষে চলা সম্ভব? অতিরিক্ত আয় করতে পারলেই তাদের পক্ষে সংসার নির্বাহ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তাতেও কিছু হবার ছিল না, কারণ আবাদির রসনা তীব্র। অতএব হোসেন আলীকে পরিত্যাগ করে একই রাস্তার ওপর এক বাড়িতে বসবাসকারী মুন্নে নামে এক বালকের সাথে পালিয়ে গেল। মুন্নের মা কঠোর প্রকৃতির পাঠান মহিলা, যে নিচু দরের বেশ্যা সংগ্রহ ও একটি বেশ্যালয় পরিচালনার জন্যে পরিচিত ছিল। তার বেশ্যালয়ে আবাদি অত্যন্ত লোভনীয় একটি সংযোজন ছিল এবং এক্ষেত্রে মুন্নের কিছুই করণীয় ছিল না। অতঃপর সাদাত নামে মুন্নের এক বন্ধু তার সামনেই আবাদিকে তার প্রতি অনুরাগী করে ফেলে এবং তাকে বেশ্যালয় থেকে নিয়ে চলে যায়। সাদাতের মায়ের একটি মুরগির খামার ছিল। তারা বাড়ির নিকটস্থ খোলা মাঠে ফসলের পরিচর্যা করতে গেলে আবাদিকে রেখে যেত মুরগিগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে। সাদাত একটি কারখানাতেও কাজ করতো। অতএব, বলা যায়, সারাদিনই সে বাড়ি থেকে দূরে থাকতো। তার অনুপস্থিতিতে আবাদি কাল্লু নামে এক সব্জি বিক্রেতার পুত্র মোহাম্মদ বখশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। সাদাতের মা তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলে এবং পুত্রকে ঘটনা জানায়। সাদাত আবাদিকে আচ্ছামতো জুতাপেটা করে । মোহাম্মদ বখশের এক বন্ধু ছিল আমীর এবং সে নওয়াবের অধীনে কাজ করার কারণে এসব ব্যাপারে নানা কৌশল জানতো এবং আবাদিকে ফুসলিয়ে তার সাথে আনতে তাকে আদৌ বেগ পেতে হয়নি। সে তাকে এক বাড়িতে উঠিয়ে সেখানে তার বন্ধুদের বিনোদনে তাকে ব্যবহার করতো। আবাদির নতুন কাজ ছিল তাদেরকে পরিতৃপ্ত করা তাদেরই একজনের কাছ থেকে আবাদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তার সারা শরীরে গুটি ও ফোস্কা উঠে। যেহেতু সে আর কোন কাজে আসছিল না অতএব আমীর তাকে একটি হাসপাতালে রেখে আসে। সে হাসপাতালেই এখন তার আবাস। আপনি যদি তার উপস্থিতি আকাংখা করেন তাহলে তাকে আনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

"আমাকে রক্ষা করো।"

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

আর কোনকিছুই পেতে চাই না আমি,
আল্লাহ আমার হৃদয়ের আকাংখার
পরিপূর্ণতা দিয়েছেন।

সেদিন ছিল রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। হঠাৎ আমার মনে হলো যে দরগায় গিয়ে আমার মোনাজাত করা উচিত। পালকি আনতে বললাম এবং সন্ধ্যার আগেই সেখানে পৌছলাম। আমি পুরুষদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে কিছু ঘুরাফিরার পর মোমবাতি জ্বালালাম এবং মোনাজাত করলাম। ইমাম হোসাইনের ওপর রচিত কাসিদার আবৃতি এবং তার শাহাদাতের ওপর এক মৌলভি সাহেবের ওয়াজও শুনলাম। এরপর চললো শোক সঙ্গীত ও বুক চাপড়ানো অনুষ্ঠান। এসবের পর লোকজন বিদায় নিতে শুরু করেছে। আমিও চলে যাওয়ার আগে আরেকবার মোনাজাত করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে প্রস্তুত। যখন দরজায় পৌছেছি তখন মনে হলো যে, দরগায় মহিলাদের অংশটুকুও ঘুরে যাওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেখানে পরিচিত কারো সাথে সাক্ষাৎ হবেই। কারণ কাসিদা গায়িকা হিসেবে আমার খ্যাতি ছিল এবং রাজমাতার মহলের সাথে আমার সম্পর্ক আমাকে সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। পালকির পর্দা ফেলে আমাকে মহিলাদের অংশের ফটকে নেয়ার জন্যে বেহারাদের নির্দেশ দিলাম। উপস্থিত একজন আমাকে পালকি থেকে নামতে ও ভিতরে যেতে সহায়তা করলো। আমার ধারণা ভুল ছিল না। বহু মহিলা আমাকে চিনতে পেরে দীর্ঘদিন আমাকে দেখেনি বলে অভিযোগ করলো। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি যখন বিদায় নিতে যাচ্ছি তখনই দেখলাম সংলগ্ন চত্তরে আসছেন কানপুরের বেগম। অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে তিনি এসেছেন, দামি পোশাক পরিচ্ছদ তার পরনে এবং বেশ কিছু সংখ্যক পরিচারিকা পরিবৃত হয়ে। একজন তার দীর্ঘ পোশাক ধরে রেখেছে, একজন তাকে হাঁটার সময়ে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। একজন ধরে আছে পানির সোরাহি ও পানের বাটা এবং একজনের হাতে মিষ্টি এবং সমাবেশস্থলে বিতরণের জন্যে আরো কিছু সামগ্রীসহ পাত্র। আমার ওপর তার চোখ পড়া মাত্র তিনি প্রায় দৌড়ে আমার কাছে এলেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে তার দু'হাত আমার কাঁধে রেখে বললেন, "আল্লাহর দোহাই, আমাকে বলো তো তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? কানপুর থেকে সেই

www.pathagar.com

যে তুমি নিরুদ্দেশ হলে, এরপর থেকে তোমাকে আর দেখিনি। আর এখন তো দেখা হলো দৈবক্রমে। তুমি একেবারেই বিবেচনাহীন।"

"আমার পক্ষে ব্যাখ্যা করা কঠিন" আমি উত্তর দিলাম। "আপনার বাগানে সে রাতের ঘটনার পর সকালে লক্ষ্ণৌ থেকে আমার লোকজন এসে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে। এরপর সংঘটিত হলো বিদ্রোহ এবং আমরা সারাক্ষণ পালিয়ে বেরিয়েছি। আমি জানি না যে, আপনার কি হয়েছিল–তা না হলে হয়তো আপনি আমাকে খুঁজে বের করতে পারতেন!"

"অবশেষে আমরা, দু'জনেই এখন লক্ষ্ণৌতে।"

"আর এই মুহূর্তে তো আমরা একই স্থানে আছি।"

"এই সাক্ষাৎ হিসেবের মধ্যে গণ্য হবে। তোমাকে আমার বাড়িতে আসতে হবে।"

"অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমি যাবো। আপনি কোথায় থাকেন?"

"চৌপট্টিয়ানে। সেখানে সবাই আমার নওয়াবের বাড়ি চিনে।"

আমি তার স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম ঠিক তখনই এক পরিচারিকা বলে উঠলো, নওয়াব মোহাম্মদ তর্কী খানের বাড়ি কে না চিনে।"

"আমি আসতে পারলে আনন্দিত হবো। কিন্তু তাতে নওয়াব সাহেব কি অসন্তুষ্ট হবেন না?

"তিনি তেমন লোক নন," বেগম সাহেবা আশ্বস্ত করলেন। "বিশেষ করে তোমার ব্যাপারে তো অবশ্যই নয়। আমি সেই রাতের ঘটনার পুরো বিবরণ তাকে দিয়েছি। তিনি তোমাকে খুঁজে বের করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এখনও প্রায়ই তোমার প্রসঙ্গে বলেন।"

"অবশ্যই আসবো আমি।"

"কবে? তুমি আমাকে কথা দাও।"

"আগামী বৃহস্পতিবার আমি হাজির হবো।"

"শুধু বৃহস্পতিবার কি তোমার ওপর ভর করেছে? আরো ছয় দিন পর। আর একটু আগে কেন আসছো না?"

"ঠিক আছে। আমি সামনের সোমবার আসবো।"

"তুমি বরং রোববার আসো, সেদিন নওয়াব সাহেব বাড়িতে থাকবেন। সোমবার উনি কোন ইংলিশম্যানের কাছে যেতে পারেন।"

"আপনার যেমন মর্জি। রোববারই তাহলে হোক।"

"ঠিক কখন আমি তোমাকে আশা করবো?"

"আপনি যখন বলবেন, যে কোন সময় আমার জন্যে সমান। বাড়িতে আমার কিছুই করার নেই।"

www.pathagar.com

"তুমি কোথায় থাকো?"

"সৈয়দ হাসান খান দরওয়াজার কাছে, চকে।"

"আমি একজন দাসীকে পাঠাবো তোমাকে আনতে। আল্লাহ্ তোমার হেফাজত করুন।"

"আল্লাহ্ আপনাকেও হেফাজত করুন।" আমি উত্তর দিলাম। এরপরই আমার মনে হলো যে আমি ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। "সেই ছোট্ট মনিব কেমন আছে?"

"নব্বন! আল্লাহর রহমতে সে ভালো আছে। ওর কথা তাহলে এখনো মনে আছে তোমার?"

"অবশ্যই! আমরা অন্য বিষয়ে কথা বলছিলাম এবং যখনই তার কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম তখন অন্য প্রসঙ্গ চলে এসেছে। আমি তাকে ভুলতে পারবো না।"

"আল্লাহ তাকে হেফাজতে রেখেছেন। সে অনেক বড় হয়েছে। রোববার তুমি ওকে দেখতে পাবে।"

"মেহেরবানী করে আর কিছু বলবেন না। আমি এতো উচ্ছসিত যে রাতে যে আমার ঘুম আসবে না, সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আল্লাহ হাফিজ!"

"আল্লাহ হাফিজ!"

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

দিনে ও রাতে এবং রাতে ও দিনে
অনেক ভেবেছি আমি,
কিন্তু বিশ্বের রহস্যময় পথের
কোন নিশানাই খুঁজে পাইনি।

যদিও আমি খানুমের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার প্রতি তার ভালোবাসার ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। আমি তাকে আমার অভিভাবক হিসেবেই গণ্য করতাম। তার টাকাপয়সা এতো অধিক ছিল যে তিনি এসবের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। বার্ধক্য তাকে ঘিরে ধরায় তিনি পৃথিবীর দিকে তার পিঠ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং মেয়েদের আয় উপার্জন নিয়ে তার আর মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু তাদেরকে আগের মতোই দেখতেন তিনি এবং তার মহল থেকে কাউকে বের করে দেননি। আমি তার প্রিয় পাত্রী ছিলাম। তার কন্যা বিসবিল্লাহ তাকে খুবই আঘাত দিয়েছিল এবং তিনি তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বিসমিল্লাহকেই তিনি সাথে রেখেছিলেন, কারণ সে তার একমাত্র সন্তান ছিল। বিদ্রোহের পর খুরশীদ জানও ফিরে আসে। আমীর জান নিজস্ব একটি বাড়ি ভাড়া নেয়, কিন্তু প্রায়ই সে খানুমের সাথে সাক্ষাৎ করতো।

খানুম যদ্দিন বেঁচে ছিলেন , তদ্দিন তিনি আমাকে যে কামরাটি বরাদ্দ দিয়েছিলেন সেটি কেউ খালি করে দিকে বলেনি। আমার জিনিসপত্র সেখানে ছিল এবং দরজায় আমার নিজের তালা লাগিয়ে রাখতাম। যখন আমার ইচ্ছা হতো আমি সেখানে গিয়ে অবস্থান করতাম। মহররম মাসের দশটি দিন আমি খানুমের সাথে কাটানোর নিয়ম করে নিয়েছিলাম। তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার নামে তিনি একটি তাজিয়া সাজাতেন।

বেগম সাহেবার সাথে সাক্ষাতের পরের দিন শুক্রবার এক লোক এসে বললো যে, খানুমের অবস্থা খুব খারাপ এবং আমাকে দেখতে চাইছেন । আমি সাথে সাথে গেলাম। তাকে দেখার পর আমি কামরায় গিয়ে আমার সুন্দর জামাগুলো বের করে নেয়ার কথা ভাবলাম। যখন কামরার দরজা খুললাম দেখলাম সর্বত্র মাকড়শার জাল, বিছানার উপর ধূলির স্তর। গালিচা ও চাদর সরানো হলো, মেঝের ওপর ময়লা আবর্জনার স্তূপ। এই

www.pathagar.com

কামরায় ঘটে যাওয়া দৃশ্যগুলো বেদনার সাথে স্মরণ করলাম। কামরাটি সব সময় সুন্দরভাবে সাজানো থাকতো। দিনে চারবার ঘর ঝাড়ু দিয়ে বিছানার চাদর বদলানো হতো, একটু ধূলির চিহ্নও কোথাও থাকতো না। এখন এখানে এমন অপরিচ্ছন্ন অবস্থা যে আমার এক মুহূর্ত থাকার ইচ্ছা হচ্ছিল না। যে বিছানায় আমি ঘুমাতাম সেটি এতো নোংরা যে আমি বিছানায় আমার পা ফেলতেও রাজী নই। আমার সাথে যেহেতু একজন ভৃত্য ছিল, আমি তাকে বললাম মাকড়শার জালগুলো অপসারণ করতে। গালিচাটি আবার মেঝেতে বিছিয়ে তার ওপর চাদর ছড়িয়ে দেয়া হলো। বিছানার ধূলি ঝেড়ে চাদরগুলো বাতাসে মেলে ধরা হলো। ভাড়ার ঘর থেকে আমি আমার রূপসজ্জার বাক্স, পানের বাটা, পিকদান বের করে এক সময় যেটি যেখানে ছিল সেখানে রাখলাম। গালিচায় বসে বিছানার সাথে হেলান দিয়ে পানের একটি খিলি বানালাম। সামনে আয়না ধরে আমার প্রতিফলন দেখলাম। ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি আমার মনে ভিড় করলো। নিজেকে আমার যৌবনের দিনগুলোর মতোই দেখলাম এবং আমার গুণগ্রাহীদের মুখগুলো পর্দায় ভেসে উঠতে লাগলো। গওহর মির্জার দুষ্টামি, রশীদ আলীর আহম্মকিপূর্ণ আচরণ, ফৈয়াজ আলীর ভালোবাসা এবং নওয়াব সুলতানের সুন্দর চেহারা। সংক্ষেপে, যারা এই কামরায় কাটিয়েছে সবাই আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন চলে যাচ্ছে। ছায়ামূর্তির মিছিলের মতো একটির পর আরেকটি আসছে। এই চিত্রগুলো শেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার একই মিছিলের পুনঃসূচনা এবং তা ধীর গতিতে। এর ফলে আমি প্রতিটি ছবি যেন পৃথকভাবে আরো মনোযোগ দিয়ে দেখতে পেলাম এবং প্রতিটি ঘটনা পরস্পর যুক্ত বলে মনে হলো। এখন প্রতিটি ছবিই আরো অনেক ছবির জন্ম দিচ্ছিল এবং আমার মনের চীনা লণ্ঠন যেন আগের চাইতেও বেশী জনবহুল দেখাচ্ছে। আমি সুলতান সাহেবের কথা এবং আমার প্রথম গানের অনুষ্ঠানের কথা ভাবলাম, যেখানে তাকে আমি আমি প্রথম দেখি, পরদিন তার ভৃত্য আমার কাছে আসে, তিনি স্বয়ং আসেন; তার সাথে আমার আলোকিত আলোচনা ও কবিতা আবৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক সংলাপ; খান সাহেবের রূঢ় হস্তক্ষেপ, পিস্তল দিয়ে সুলতান সাহেব কর্তৃক তাকে হত্যা, শমসের খানের আনুগত্য, কোতোয়ালের আবির্ভাব এবং খান সাহেবের দেহ প্রেরণ, আবার আসার ব্যাপারে সুলতান সাহেবের অস্বীকৃতি, আরেকটি অনুষ্ঠানে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ, বালকের মাধ্যমে চিরকূট প্রেরণ এবং আমাদের সম্পর্ক পুনরায় শুরু, নওয়াবগঞ্জের মাহফিল সবকিছু। যদিও মনে হচ্ছিল যে ঘটনাগুলো মাত্র গতকালই ঘটেছে, কিন্তু তার মাঝেও কিছু একটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না এবং ছবিগুলো প্রতিবারই একটি স্থানে এসে থেমে যাচ্ছিল। আবার শুরু থেকে সবগুলো ঘটনা মনে মনে সাজানো পর বারবার শুধু ভাবছিলাম যে সুলতান সাহেবের ভৃত্য তার মনিবের কাছ থেকে খবর আনা ও অন্যান্য ঘটনার মাঝখানে কোন একটি ঘটনা আমি তুলে আনতে পারছি না। আমার দিবাস্বপ্ন নিষ্ঠুরভাবে ভেঙ্গে গেল সহসা আমার ভৃত্য চিৎকার করে উঠায়, "মালকিন, দেখুন একটি বিছা আপনার ওড়না বেয়ে উঠছে।"

www.pathagar.com

আমি ওড়না ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিছাটি মেঝের ওপর পতিত হয়ে খাটের পায়া বেয়ে উঠার চেষ্টা করছিল। ভৃত্য বিছানাটি তুলে ফেললো এবং আমরা কি দেখতে পেলাম ! পাঁচটি চকচকে সোনার মোহর।

"এখানে এগুলো কি?" ভৃত্য বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো।

"আহ!" আমি মনে মনে বললাম। "এখানে পড়ে আছে আমাকে দেয়া নওয়াব সুলতানের প্রথম উপহার।" সোনার মোহর!" আমি ভৃত্যকে বললাম ।

"এগুলো এখানে কিভাবে এলো?"

"বিছাটি মোহরে পরিণত হয়েছে। মোহরগুলো তুলে নাও," আমি হেসে বললাম । লোকটি মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলো। এরপর মোহরগুলো তুলে আমার হাতে দিল।

বিদ্রোহের সময় খানুমের বাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু খাটের পায়ার নিচে কেউ দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রেমিককে দেখার বাসনা কিভাবে পরিপূর্ণ
হয়েছে তাতো কোন ব্যাপার নয়, যদিও
আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মাধ্যমে তার সাথে
সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাকে তার পাশে দেখেছি
তবুও আমার কোন ঈর্ষা বা অহংকার নেই।

রোববার সকাল আটটায় বেগম সাহেবার দাসী পালকিসহ হাজির হয়ে আমার সাথে রাজ কর্মচারীর মতো আচরণ শুরু করলো। আমি সবে ঘুম থেকে উঠেছি, আমার হুকা টানা তখনো শেষ হয়নি। সে হাঁকডাক শুরু করলো, "জলদি, জলদি!" আমার ধারণা ছিল আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজের পর আশা করা হবে। কিন্তু দাসী বললো যে বেগম সাহেবা চান আমি দুপুরে তার সাথে খাই। সে আমাকে আরো বললো যে নওয়াব খুব সকালে তার এস্টেটে চলে গেছেন এবং সন্ধ্যার আগে তার ফেরার সম্ভাবনা নেই। বেগম সাহেবার সাথে আমার অনেক কিছু বলার ছিল, অতএব যথাশীঘ্র হাত মুখ ধুঁয়ে, চুল আঁচড়ে, বেণী বেঁধে দাসীর সাথে বাড়ি ত্যাগ করলাম।

বেগম সাহেবা আমার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং আমি পৌঁছার পরপরই খাবার পরিবেশন করা হলো। প্রচুর খাবার আয়োজন করা হয়েছে। চাপাতি, সুগন্ধি চালের পোলাও, গোশতের কাবাব ও রেজালা, নয়টি বিভিন্ন উপাদানে তৈরি চাটনি, আপেলের আচার ও হালুয়া। খাওয়া শেষ হলে বেগম সাহেবা কানের কাছে মুখ এনে বললেন, করিমের বাড়িতে পাতলা ডাল ও মোটা রুটির কথা কি তোমার মনে আছে?"

"চুপ! কেউ আমাদের কথা শুনে ফেলতে পারে।"

"তাতে কিছু আসে যায় না। সবাই জানে যে নওয়াবের আম্মা (আল্লাহ তাকে বেহেশত নসীব করুন) তার পুত্রের আনন্দের জন্যেই আমাকে খরিদ করেছিলেন।"

"আল্লাহর দোহাই, চুপ করো। অন্য কোথাও চলো, যেখানে আমরা নিজেদের মতো থাকতে পারবো।"

আমরা হাত মুখ ধুঁয়ে একটি করে পানের খিলি নিলাম। বেগম সাহেবা হুকা আনার নির্দেশ দিয়ে ভৃত্যদের চলে যেতে বললেন।

www.pathagar.com

"তাহলে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছো," সবাই চলে গেলে আমি বললাম।

"তোমাকে প্রথম বার কানপুরে দেখেই বুঝতে পেরেছি যে আমি কোথাও তোমাকে দেখেছি, কিন্তু স্মরণ করতে পারছিলাম না যে কোথায়। দীর্ঘদিন ধরেই মনে মনে খটকা রয়ে গিয়েছিল। আমার স্মৃতির চার কোণা তালাশ করেও কোন কিনারায় পৌঁছতে পারিনি। এরপর আমার চোখ পড়ে করিমনের ওপর। তার নাম আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় করিমের কথা (আল্লাহ তার মস্তক বিদীর্ণ করুক)। তখনই মনকে বলি, হ্যাঁ এইবার পেয়েছি। ওকে আমি করিমের বাড়িতে দেখেছি।

"আমারও একই ধরণের খটকা লাগছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে মগজে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমাদের মহলের মেয়েগুলোর মধ্যে খুরশীদ নামে একটি মেয়ে ছিল, যার চেহারার সাথে তোমার চেহারার খুব মিল। যখনই ওকে দেখেছি তোমার কথা আমার মনে পড়েছে।"

"এবার আমার কাহিনী শোন," বেগম বললেন এবং তার ভাগ্যে কি ঘটেছিল তা বলার প্রস্তুতি নিলেন। "আমরা একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার পর আমাকে নওয়াবের মা উমদাতুন্নেসা বেগমের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়। তোমার মনে থাকতে পারে যে আমার বয়স তখন ছিল প্রায় বার বছর। নওয়াবের বয়স তখন ষোল বছর। তার আব্বা কানপুরে থাকতেন এবং বিবির সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো ছিল না। তিনি তার বোনের কন্যার সাথে পুত্রের বিয়ে ঠিক করেন, যারা দিল্লীতে বাস করতো। নওয়াবের মা এটি মেনে নিতে পারেননি, কারণ তিনি তার ভাই এর কন্যার সাথে পুত্রের বিয়ে দিতে চান। যেহেতু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে আগে থেকেই বিবাদ ছিল, অতএব এই মতানৈক্য তাদের বিবাদের জটিলতা আরো বৃদ্ধি করলো। তাদের এই রেষারেষির মাঝখানে পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়লো। ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন যে রোগীকে অবিলম্বে একটি স্ত্রীর বন্দোবস্ত করে দিতে হবে, তা না হলে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে কেউ বিয়েতে রাজী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তখনই দৃশ্যপটে আমি উপস্থিত হলাম এবং বেগম আমাকে খরিদ করলেন। তার পুত্র আমার এতোটাই অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে তার জন্যে প্রস্তাবিত দুই জ্ঞাতি বোনকেই বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। আল্লাহ তা'য়ালার পথ কি অদ্ভুত। অল্প কিছুদিন পরই বৃদ্ধা বেগম ইন্তেকাল করেন এবং তার অল্প কিছুদিন পরই তার স্বামীও তাকে অনুসরণ করে কবরে যান। দু'জনেরই নিজ নিজ সম্পত্তি ছিল এবং আমার নওয়াব তাদের একমাত্র সন্তান হওয়ায় তিনি তাদের সকল সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন।

"আল্লাহ আমার নওয়াবকে হেফাজত করুন। তার কল্যাণেই আজ আমি বেগমের মর্যাদায় জাঁকজমকের মধ্যে কাটাতে পারছি। তিনি আমাকে এতো ভালোবাসেন যে, আমি যেন সত্যি সত্যিই তার বিয়ে করা বিবি। আমার জানামতে তিনি কখনোই কামনার দৃষ্টিতে ভিন্ন কোন নারীর দিকে তাকান না পর্যন্ত। বাড়ির বাইরে বন্ধুদের সাথে তিনি যা

www.pathagar.com

কিছু করেন তা তার জমিদারী ও ব্যবসা সংক্রান্ত। সবকিছু সত্ত্বেও তিনি তো একজন পুরুষ মানুষ, তার গতিবিধির কোন খবরদারি আমি করি না।

"আল্লাহতা'য়ালা আমার সকল ইচ্ছা পূরণ করেছেন। আমি একটি সন্তান চেয়েছিলাম। আল্লাহর রহমতে আমার একটি পুত্র আছে। এখন আমার একটাই প্রার্থনা যে ছোট্ট নব্বন একজন মানুষে পরিণত হোক, যাতে আমি ওর জন্যে একজন বিবি ঠিক করতে পারি এবং যখন ওদের একটি সন্তান হবে, তখন আমি আমার নাতিকে আমার হাঁটুর ওপর রেখে দোলাতে পারি। তখনই আমি একজন সুখী মহিলার মতো মরতে পারবো। নওয়াব আমাকে কবর দেবেন এবং কবরের ধূলি তার হাতের স্পর্শে ধন্য হবে। এখন তুমি তোমার কথা বলো।"

রাম দেই (বেগম সাহেবার প্রকৃত নাম) যখন তার জীবনের কাহিনী আমার কাছে বর্ণনা করছিল, তখন তার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হচ্ছিল এবং নিজের জন্যে দুঃখ বোধ করছিলাম। কেন আমার জীবনটা এভাবে নষ্ট হলো? একই সময়ে আমরা অপহৃত হয়েছিলাম, একই লোক আমাদের বেঁচে দিয়েছিল—তাকে বিত্তশালী এক বেগমের কাছে আর আমাকে বেশ্যালয়ের এক মালকিনের কাছে। আমার অতীতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাকে দিলাম। আমাদের ব্যক্তিগত আলোচনা শেষ হলে বেগম সাহেবা তবলা, তানপুরা ও সেতার আনার নির্দেশ দিলেন। আমরা কয়েকটি গান গাইলাম।

আমরা দু'জন একত্রিত হলেই আমার কাছে সে ছিল রাম দেই এবং আমি ছিলাম আমিরন। অন্যদের সামনে সে বেগম সাহেবা এবং আমি উমরাও জান। গানের জলসা সন্ধ্যার পর পর্যন্ত চললো।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

একথা সত্য যে প্রেমিকের ওপর প্রেমের দৃষ্টি ফেলতেই চোখ
ভালোবাসে; কিন্তু ধৈর্য ধারণই বিজ্ঞতার কাজ, তা না হলে
ভিড়ের মধ্যে কেউ লক্ষ্য করতে পারে এবং এ নিয়ে গুজব ছড়াতে পারে।

সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ির সহজ পরিবেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং নওয়াব ফিরে আসার আগেই সবকিছুতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা হলো। তবলা, তানপুরা এবং অন্যান্য সুর যন্ত্র সরিয়ে ফেলা হয়। পর্দায় থাকা মহিলারা অন্দর মহলে চলে গেলেন। আমি বেগম সাহেবার অংশে গিয়ে হল কক্ষে আমার জন্যে নির্ধারিত জায়গায় বসলাম। পর্দার আড়াল থেকে প্রবেশ পথের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নওয়াবের আগমণের প্রতীক্ষা করছিলাম। প্রহরীদের একজন উচ্চ স্বরে বললো, "নওয়াব সাহেব আসছেন।" কয়েক মুহূর্ত পর পরিচারিকা পর্দা তুলে উচ্চারণ করলো, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।" নওয়াব হল কক্ষে প্রবেশ করলেন।

তাকে দেখা মাত্র নিজেকে বললাম, "হায় আল্লাহ! এতো সুলতান সাহেব। কি এক বিব্রতকর পরিস্থিতি!" নওয়াবের দৃষ্টি পড়লো আমার ওপর এবং তিনি বিস্মিত হলেন। আমার মুখের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার চোখও তার ওপর নিবদ্ধ।

আমি আমার ভালোবাসার পানে তাকালাম
এবং বিস্মিত হয়ে দেখলাম, সে আমার দৃষ্টির
যন্ত্রণা আঁচ করতে সক্ষম হয়েছে।

"আপনি ওভাবে কি দেখছেন," বেগম সাহেবা স্বামীকে প্রশ্ন করলেন। "ওর নাম উমরাও জান, যে উমরাও জান কানপুরে.....।"

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে। তার কথা তুমি আমাকে বলেছিলে," নওয়াব উত্তর দিলেন কিছুটা অজ্ঞতার ভান করে। বেগমের পাশে গালিচার ওপর বসে পড়লেন তিনি। আমিও বসলাম।

www.pathagar.com

রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। এক চাকরানী কয়েকটি মোমবাতি এনে আমাদের সামনে রাখলো। বেগম সাহেবা যখন পানের খিলি বানাতে ব্যস্ত নওয়াব সাহেব আমার দিকে তাকালেন। আমিও আড়চোখে তার সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলাম। যদিও আমাদের দু'জনের কেউই একটি কথাও বলিনি, কিন্তু আমাদের চোখ অনেক কথা বলে ফেলেছে। আমাদের দৃষ্টির মাধ্যমেই প্রেমিক প্রেমিকার সকল অভিযোগ, অনুযোগ, একান্ত কথা বলা হয়ে গেছে। তিনি আনুষ্ঠানিকতার ঢং এ বললেন, "মোহতারিমা, উমরাও জান, আমরা আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আপনার কারণেই আমাদের কানপুরের বাড়ি লুণ্ঠিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।"

"মেহেরবানী করে আমাকে বিব্রত করবেন না। সেটি অনেকটা দৈব ঘটনার মতো ছিল যে ডাকাতদের একজন আমাকে চিনতো।"

"বাড়িতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দলিল দস্তাবেজ ছিল যেগুলো বিনষ্ট হতে পারতো। আপনার কারণে সেগুলো রক্ষা পেয়েছে।"

"কিন্তু হুজুর কেন জঙ্গলের মধ্যে মহিলাদের রেখে দূরে চলে গিয়েছিলেন," আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

"আমার কোন উপায় ছিল না। বাদশাহ আমার লক্ষ্ণৌর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিলেন এবং আমাকে কলকাতায় যেতে হয়েছিল গভর্নর জেনারেলের কাছে দরখাস্ত করতে। আমাকে এতো তড়িঘড়ির মধ্যে যেতে হয়েছে যে আমার পরিবারের জন্যে কিংবা সফরের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে পারিনি। আমি শুধু শমশের খান ও একজন ভৃত্যকে সাথে নিতে পেরেছিলাম।"

"বাড়িটির অবস্থান এমন নির্জন এক স্থানে। সেখানে প্রায়ই যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।"

"কিন্তু ওই একটি ঘটনা ছাড়া, আর কখনোই এমন ঘটেনি। বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছিল এবং বেআইনী কাজে অভ্যস্ত লোকজন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। দেশজুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল বিশৃংখলা।"

রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা সবাই একসাথে খেলাম এবং নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করলাম। পান চিবুনো ও হুকা টানা শেষ হলে নওয়াব আমাকে গানের ফরমায়েশ করলেন। আমি এই গজলটি পেশ করলাম :

মরণকালেও আমি তো মৃত্যুর কথা ভাববো না,
শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাকে স্মরণ করবো।
আমি তো বিচ্ছেদের রজনী কষ্টে যাপন করেছি
তোমার ভাবনা আমার ক্ষোভ বৃদ্ধি করেনি

www.pathagar.com

বিচ্ছেদের সময়ে প্রতিটি নিঃশ্বাস ছিল যন্ত্রণাময়
হয় তোমাকে ভেবেছি কিংবা প্রায়ই মৃত্যুকে
আমার কাছে জানতে চেয়ো না, পাপপূর্ণ
প্রেমে আমার কেন এতো আনন্দ ছিল
কারণ, প্রেমহীন স্বর্গ আমার কাছে নরক মনে হবে

শেষ লাইনটি ছাড়া অন্যগুলো আমার আর মনে নেই :

"ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর স্মৃতি কি ফিরিয়ে আনে?"

তখন বর্ষাকাল। অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি। আমার কামরায় একট জলসার আয়োজন করা হয়েছে। বাঈজিদের মধ্যে আছে বিসমিল্লাহ জান, আমীর জান ও খুরশীদ জান। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আছেন নওয়াব বব্বন, নওয়াব চব্বন, গওহর মির্জা, আশিক হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন, আমজাদ আলী ও আকবর আলী খান। কেউ গান ধরেছিল, বিসমিল্লাহ জান তাকে বাধা দেয়, "বোন, আমরা তো প্রতিদিনই গাই," সে তাকে বলে এবং এরপর আমাদের সবার দিকে ফিরে। "দেখো, কিভাবে বৃষ্টি ঝরছে। বিশেষ কিছুর মাধ্যমে আমাদের উচিত বর্ষা উদযাপন।"

"বাজার থেকে যা খুশী আমরা কিনতে পারি," আমি উত্তরে বললাম।

"বাজার থেকে কেন!" বিসমিল্লাহ বিস্মিত হলো। "নিজেদের বানানো খাবার অনেক বেশী সুস্বাদু।

"দেখো বোন, হাঁড়িপাতিল নিয়ে রান্নাবান্নার কাজ নিশ্চয় তোমার ভালো লাগে," আমীর জান মাঝখানে বললো, "কিন্তু আমি জীবনে কোনকিছু রান্না করিনি এবং রান্না করে কিছু খাইনি পর্যন্ত।"

"ঠিক আছে বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে তারপর রান্না করা যাক," বেগা জান পরামর্শ দিল।

"তোমাদের কি হয়েছে, বলো তো," আমি বললাম। "তোমরা সবাই কি ক্ষুধার্ত?"

"আমি ক্ষুধার্ত নই," বেগা জান বললো। "বিসমিল্লাহকে বলো। এ প্রস্তাব তো তারই।"

"এমন দিনে আমাদের অবশ্যই কিছু করা উচিত," বিসমিল্লাহ প্রতিবাদ করে বললো।

"আমি তোমাদের বলছি, কি করা উচিত," আমি বললাম। "চলো আমরা সবাই বকশী হ্রদে যাই বনভোজন করতে।"

"চমৎকার বলেছো," বিসমিল্লাহ জান সম্মত হলো।"

www.pathagar.com

"খুব ভালো সময় কাটবে আমাদের," অন্য মেয়েরাও উল্লাসে চিৎকার করলো। আমরা তিনটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে হাঁড়ি পাতিল, খাবার তৈরির যাবতীয় উপকরণ এবং নওয়াব বব্বনের বাড়ি থেকে আনা তাবু গাড়ীর ছাদে তুলে নদীর দিকে এগিয়ে গেলাম। গোমতী নদী অতিক্রম করার পর বেগা জান একটি জনপ্রিয় গান শুরু করলো :

ও আমার প্রিয়, তোমার জন্যে আম গাছের ডালে
কে ঝুলিয়ে দিয়েছে এই দোলনা?"

তার গানে এতো মগ্নতা ছিল যে গানের কথাগুলো আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে স্পর্শ করলো।

চারদিকে সবুজের বিশাল বিস্তার প্রকৃতিকে অপূর্ব সাজে সজ্জিত করেছে। আকাশ ঘন মেঘে ছাওয়া এবং অবিরাম বৃষ্টি ঝরছে। ঝর্ণা ও নদীগুলো উপচে তীর পর্যন্ত প্লাবিত করেছে। গাছগুলো বিধৌত এবং পাতা দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়েছে। কোয়েল ডাকছে এবং পেখম খুলে ময়ুর ভাবাবেশে নাচছে।

আমরা বকশী হ্রদের পাশে পৌঁছে গ্রীষ্মাবাসে আমাদের গালিচা বিছিয়ে দিলাম। চূলা সাজিয়ে আগুন জ্বেলে কড়াই চাপিয়ে আমরা পুরি ভাজতে শুরু করলাম।

ভৃত্যরা তাঁবু খাটিয়ে নিকটস্থ গ্রাম থেকে কয়েকটি চারপায়া সংগ্রহ করে এনেছে। গওহর মির্জা ঝুড়ি ভর্তি আম নিয়ে এলো। আমরা আম নিয়ে মেতে উঠলাম এবং জায়গাটি আমের খোসা ও আঁটি দ্বারা পরিপূর্ণ হলো। দলের কেউ কেউ পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে সাঁতার কাঁটছে এবং একে অন্যকে পানির ঝাপটা দিচ্ছে। অন্যেরা কর্দমাক্ত মাঠে খেলতে নেমেছে। কেউ পা পিছলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেলেও অল্পক্ষণ বৃষ্টিতে দাঁড়ালেই কাদা ধুঁয়ে পরিস্কার হয়ে যাচ্ছিল। বেগা জানের মতো যারা হুশিয়ার, যারা বৃষ্টিতে ভিজতে অনিচ্ছুক তারা তাঁবুতেই কাটালো। অবশ্য বিসমিল্লাহ জান চুপি চুপি পিছন থেকে এসে বেগার মুখে আমের রস মাখিয়ে দিয়েছিল। সে চিৎকার করে উঠলেও অন্যেরা জোরে হেসে উঠে।

কোথা থেকে এসে হাজির হলো তিনটি বেঁদে মেয়ে। আমরা তাদেরকে নাচ গান করতে বললে তারা তা করলো। কিন্তু তাদের নাচ গানের ধরণ আমাদের মতো লোকদের সন্তুষ্ট করার মতো না হলেও সেই পরিবেশের জন্যে একেবারে খারাপ ছিল না।

সূর্যাস্তের ঘন্টাখানেক আগে আকাশ পরিস্কার হলে সূর্যের মুখ দেখা গেল। আমরা ভিজা কাপড় বদলে সাথে আনা শুকনা কাপড় পরলাম এবং পাশের জঙ্গলে হাঁটতে বের হলাম। নওয়াব চব্বন তার বর্ষাতি পরে বন্দুক হাতে এলেন। আমি একা।

ঘন গাছের প্রাচীরের আড়ালে চলে গেছে বিকেলের সূর্য। সূর্য রশ্মি হ্রদের পানিতে পড়ায় কম্পমান পানি যেন তরল সোনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। সূর্য আরো ঢলে পড়লে

www.pathagar.com

পশ্চিমাকাশ লাল ও গোলাপি বর্ণ ধারণ করলো। কি অপূর্ব সেই দৃশ্য। আমার মতো আবেগ প্রবণ যে কেউ অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকবে যে মেঘ কিভাবে শুধু রং পাল্টাচ্ছে।

আমি জানি না যে আমি কতটা অবাক হয়েছিলাম তখন কর্দমাক্ত রাস্তায় লাঙ্গল কাঁধে একদল কৃষক সামনে তাদের হালের বলদগুলো নিয়ে ঘরমুখী হয়েছে, তাদের মুখোমুখি হলাম। একটি ছোট্ট মেয়ে এক পাল গরু ও মহিষ তাড়িয়ে নিচ্ছিল। একটি বালক, তার পিছনে পিছনে যাচ্ছে অনেকগুলো ভেড়া ও বকরী। আমাকে আবার একা রেখে কৃষক ও রাখালেরা আড়াল হয়ে গেল। আমি সেই কর্দমাক্ত রাস্তা অনুসরণ করছিলাম রাস্তাটি হ্রদের দিকে গেছে মনে করে। দিনের আলো ম্লান হয়ে গেলে আমি দ্রুত পা চালালাম। একটি ফকিরের আস্তানা পড়লো যেখানে কিছু লোক বসে হুকা টানছিল। আমি তাদের কাছে পথের সন্ধান জানতে চাইলে তারা বললো যে হ্রদের পথ আমি বামে ফেলে এসেছি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গেছে এমন একটি পায়ে চলা পথ ধরতে হলো আমাকে। একটি ছোট্ট ঝর্ণা পড়লো। ঝর্ণার অপর তীরে গাছের নিচে এক লোককে মাটি খুঁড়তে দেখলাম। একটি ফতুয়া ও ময়লা ধুতি তার পরনে। আমার পায়ের শব্দ তার কানে যাওয়ায় সে ফিরে তাকালো। আমাদের চোখ মিলিত হলো।

আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো এবং আরো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলাম লোকটিকে। এটি দিলাওয়ার খান ছাড়া আর কেউ হতে পারে না, যে আমাকে আমার শৈশবে অপহরণ করেছিল। আমি কিছুটা সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম এবং তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। আমি নিশ্চিত যে সে আমাকে চিনতে পারেনি। আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম যদি না শুনতাম যে আকবর আলী খানের ভৃত্য আমাকে ডাকছে।

দিলাওয়ার খানও ভৃত্যের কণ্ঠ শুনতে পেয়েছে এবং শুনেই পালিয়েছে। ভৃত্যটি যখন আমার কাছে এলো তখন আমি কাঁপছিলাম এবং আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হচ্ছিল না। আমাকে এ অবস্থায় দেখে সে প্রশ্ন করলো, "আমার ডাকে কি আপনি ভয় পেয়েছেন?" আমার জিহবা যেন আটকে গেছে। আমি শুধু আঙ্গুল দিয়ে গাছটির দিকে দেখাতে পারলাম। "ওটাতো একটা কোঁদাল," সে মন্তব্য করলো; "আপনার কি মনে হয় যে লোকটি কবর খুঁড়ছিল? কিন্তু সে গেল কোথায়?" আমি তখন ঝর্ণার দিকে দেখালাম। "নিশ্চয়ই সে ফকিরের আস্তানায় গেছে গাঁজায় দম দিতে," ভৃত্য বললো। "চলুন, নওয়াব চব্বন একটি বুনো মোরগ মেরেছেন গুলী করে এবং সব জায়গায় আপনাকে খুঁজছেন। আমি যদি জঙ্গলের এদিকটায় না আসতাম তাহলে আপনি হয়তো পথই খুঁজে পেতেন না।"

আমরা মাঠ পেরিয়ে হ্রদের পাশে গেলাম।

www.pathagar.com

রাতের খাবার শেষে আকবর আলী খানকে আমি যা দেখেছি খুলে বললাম। তিনি বললেন, "আমাকে আগে কেন বলোনি। লোকটি যদি ফৈজাবাদের দিলাওয়ার খান হয়ে থাকে, তাহলে সে ঘোষিত অপরাধী। আমরা তাকে পাকড়াও করে সরকার ঘোষিত এক হাজার টাকা দাবি করতে পারতাম। সে কি খুঁড়ছিল?"

"আমি জানি না," আমি উত্তর দিলাম। "সেটি যেন তার কবর হয়, আমি তাই আশা করি।"

"তার নাম তোমার চেহারাকে ফ্যাকাসে করে দিচ্ছে। এখন সে তোমার আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

আমার উত্তেজনা চেপে রেখে বললাম, "আমি নিশ্চিত যে বিদ্রোহের সময়ে মাটির নিচে সে কিছু পুঁতে রেখেছিল এবং এখন তা খনন করে নিতে এসেছে।"

"চলো সেখানে গিয়ে দেখা যাক।"

"না, আমি যাব না। আপনার জীবনকেও বিপন্ন করতে দেব না।"

"আমি আমার ভৃত্যকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি।"

"এখন ওখানে যাওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? আপনি কিছুই পাবেন না। সে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে তুলে নিয়ে চলে গেছে।"

"তবুও আমি যাবো," তিনি কিছুটা জোরের সাথে বললেন। নওয়াব চব্বন ও বিসমিল্লাহ জান, যারা কাছাকাছি তাঁবুতে ছিলেন তারা তার কণ্ঠ শুনতে পেয়েছেন। "খান সাহেব, আপনি কোথায় যেতে চান?" নওয়াব প্রশ্ন করলেন।

"হুজুর কি এখনো শুয়ে পড়েননি?" আকবর আলী জানতে চাইলেন।

"না জনাব, এখনো শুইনি।"

"তাহলে আমি কি আসতে পারি?"

"আমি তাতে আনন্দিতই হবো।"

আকবর আলী খান ও আমি নওয়াবের তাঁবুতে গেলাম এবং তাকে পুরো কাহিনী বললাম। নওয়াব চব্বন আমাকে প্রশ্ন করলেন, "এই বদমাশটাকে তুমি কি করে জানো?" তাকে আমার জীবনের পুরো কাহিনী বলার অর্থ ছিল না। অতএব শুধু বললাম, "আমি ওকে ভালোভাবে চিনি। আমিও ফৈজাবাদের মেয়ে।"

"এই খুনীর ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই কিছু করা উচিত," আকবর আলী খান বললেন।

"খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি সে। তাকে ধরা খুব কঠিন হবে না।"

আকবর আলী তার ভৃত্যকে ডেকে কাগজ কালি ও কলম আনতে বললেন। নিকটস্থ থানার দারোগার কাছে একটি চিরকূট লিখে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরই দশ-বারজন

www.pathagar.com

সিপাইসহ দারোগা এলো এবং আমি তাকে ঘটনাটি বয়ান করলাম। তিনি গ্রামের লোকদের সাহায্য চেয়ে খবর পাঠালেন।

প্রথমে তারা সেই স্থানে গেল, যেখানে আমি তাকে দেখেছিলাম। সিপাইদের একজন ভারত সম্রাটের সোনার একটি মোহর পেয়ে দারোগার হাতে দিল। এরপর তারা গেল ফকিরের আস্তানায় এবং লোকটির গতিবিধি সম্পর্কে কিছু তথ্য পেল। "আল্লাহ চাহে তো আমরা তাকে লুটের মালসহ পাকড়াও করবো," দারোগা বললেন।

দারোগা ও তার সিপাইরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে রাত তিনটায় দিলাওয়ার খানকে মল্কাগঞ্জ থেকে পাকড়াও করে সকালে হ্রদের পাশে আনলো। তার কাছ থেকে চব্বিশটি সোনার মোহর উদ্ধার করা হয়েছে। আমাকে বলা হলো তাকে সনাক্ত করার জন্যে। সকাল দশটারা মধ্যে পুলিশ তদন্ত কাজ শেষ করে দিলাওয়ার খানকে লক্ষ্মৌতে প্রেরণ করলো। দু'মাস পর তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হয় এবং তার কলংকিত আত্মা জাহান্নামে চলে যায়।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

সবকিছু লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বে ন্যস্ত ফেরেশতারা কি লিখেছে তা পাঠ করার আগ্রহ সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। আমার জীবনের পুরো কাহিনীই তো সবার সামনে খোলা।

মির্জা সাহেব, আমার জীবনের ওপর লিখা আপনার পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করে আমি এতো রেগে গিয়েছিলাম যে, সেটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল। আমি কি জীবদ্দশাতেই আমার মুখকে যথেষ্ট কালিমা লিপ্ত করিনি, এর প্রমাণ রেখে যেতে চেয়ে, যা আমার মৃত্যুর পরও একটি লজ্জার ব্যাপার হয়ে থাকবে? শুধু আমার নিস্পৃহ প্রকৃতি এবং আপনার অশেষ পরিশ্রমের কথা বিবেচনা করে আমার হাতকে নিরস্ত রেখেছি।

গত রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ঠিক মাঝ রাতে। দীর্ঘক্ষণ ধরে আমি শুধু এপাশ ওপাশ করেছি ঘুম আসবে আশায়। এরপর আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ি, বালিশের পাশে রাখা প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি পান মুখে দেই। পরিচারিকাকে ডেকে হুকা ধরিয়ে দিতে বলি। বিছানায় শুয়ে খানিক সময় হুকা টানি। বিছানার পাশের আলমিরায় অনেক উপন্যাস ও গল্পের বই ছিল। আমি একটি একটি করে নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকি। যেহেতু বইগুলো আগে বহুবার পড়েছি, সেজন্যে সেগুলো সরিয়ে রাখলাম। এরপর আমার হাত পড়লো আপনার পাণ্ডুলিপির ওপর। এটি পাঠ করার পর থেকে আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত বোধ করছিলাম এবং ছিঁড়ে ফেলবো বলে স্থির করলাম। হঠাৎ আমার পাশে কারো উপস্থিতি অনুভব করলাম, যে আমার কানে কানে বললো, "ঠিক আছে উমরাও জান, আমরা ধরে নিচ্ছি যে পাণ্ডুলিপিটি ছিঁড়ে ফেলে কোথায়ও ছুঁড়ে ফেললে বা আগুনে জ্বালিয়ে দিলে, কিন্তু তাতে কিঁইবা আসে যায়? ন্যায়পরায়ণ ও প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহতা'য়ালার হুকুমে মানুষের সকল কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ফেরেশতারা তো ইতোমধ্যেই তোমার জীবনের সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখে ফেলেছেন। সেখান থেকে কার পক্ষে একটি লাইন মুছে ফেলা সম্ভব?"

সেই রহস্যপূর্ণ কণ্ঠ শুনে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরে একটি কম্পনের সৃষ্টি হলো এবং পাণ্ডুলিপিটি আমার হাত থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। অতএব সেটি ছিঁড়ে

www.pathagar.com

ফেলার ধারণা পরিত্যাগ করে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু পড়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পড়তে শুরু করলাম সিদ্ধান্ত পাল্টে। প্রথম পৃষ্ঠা শেষ করে দ্বিতীয় পৃষ্ঠার কয়েকটি লাইন পড়লাম। ততোক্ষণে আমি আমার নিজের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানতে এতোটাই মগ্ন হয়ে পড়েছি যে পাঠ থেকে আমি আর নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছিলাম না। অন্য কোন কাহিনী পড়ার সময় আমি এতোটা আনন্দ উপভোগ করিনি। কারণ আমি কখনো ভুলতে পারবো না যে সেগুলো ছিল সত্যতার বাইরে কোন সারবস্তু ছাড়া মনের কল্পনা মাত্র। আর আমার জীবনীতে আপনি যে ঘটনাগুলোর সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন সেগুলো বাস্তবে ঘটেছে। সেগুলো আমার চোখের সামনে ঘটেছে। পান্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো কেউ যদি আমাকে পাঠ করে দেখে তাহলে তার মনে কোন সন্দেহই থাকবে না যে আমি একটা আস্ত পাগল। কখনো কখনো আমি হাসি ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি, এরপর আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে । পড়তে গিয়ে খটকা লাগলে আপনি আমাকে সংশোধন করে দিতে বলেছেন । আর আমি বুঝেও উঠতে পারিনি যে আমি কি করছি। ভোররাত পর্যন্ত আমি পড়লাম। বিছানা ছেড়ে উঠে অজু করে আমি ফজর নামাজ আদায় করে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটু ঘুমিয়ে নেয়ার জন্যে। সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে আবার পান্ডুলিপি নিয়ে বসলাম। সারাদিন ধরে পান্ডুলিপি পড়ে সন্ধ্যার মধ্যে শেষ করলাম।

আমার জীবন কাহিনীতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে বিষয়টি পেলাম তা হচ্ছে সদগুণসম্পন্ন ও বাজে মহিলাদের সম্পর্কিত আপনার জ্ঞানগর্ভ বিবরণী । আমি আপনার সাথে একমত যে, গুণী মহিলাদের অহংকার করার সকল অধিকার আছে, আর আমার মতো রাস্তার মহিলারা সেক্ষেত্রে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ভাগ্য এবং পরিস্থিতির অনেক সম্পর্ক আছে আমার জীবনের এই বিশেষ গতির সাথে। আমার বাজে পথ অবলম্বনের মূল কারণ ছিল দিলাওয়ার খান। সে যদি আমাকে অপহরণ না করতো তাহলে আমি খানুমের কাছে বিক্রি হতাম না, কিংবা আমার জীবন এই হীন অদৃষ্টে পরিপূর্ণ হতো না।

আমার জীবন পদ্ধতি পাল্টাতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। যে সব কাজের বাজে পরিণতি সম্পর্কে আমি জানি সেসব কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছি। আরো আগে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি খানুমের মহলে অবস্থানের কারণে এবং সেসব কাজের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারিনি বলে। খানুমকে আমি দেখেছি আমার প্রভু ও শাসক হিসেবে এবং তিনি যা বলেছেন আমাকে তাই করতে হয়েছে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে আমি তা করেছি গোপনে, যাতে আমাকে পিটুনি বা বকুনি খেতে না হয়। অবশ্য খানুম আমাকে কখনো মারেননি, কিন্তু সে ভয় সবসময় ছিল। যাদের মাঝে আমি বড় হয়েছি, আমার জীবনও তেমন এ ধারণাই গড়ে উঠেছিল আমার মধ্যে। নীতি ও নৈতিকতার প্রশ্ন নিয়ে ভাবার কোন সুযোগ কখনোই হয়নি। আমার পরিস্থিতিতে কারো পক্ষেই ভিন্নতর কিছু আশা করার উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

আমাকে ধর্মের নির্দেশ ও বিধনাবলী শেখানো হয়নি এবং ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য কখনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। সেজন্যে এ ধরনের বিষয়গুলোর কোন অর্থ ছিল না আমার কাছে। বাস্তবিক পক্ষেও ওই সময়ে আমার কোন ধর্ম ছিল না এবং অন্য লোকদের অনুকরণ করেই সন্তুষ্ট ছিলাম। সঠিক কাজ করার ব্যাপারে আমার যদি অলসতা থাকতো এবং আমার আহম্মকির কারণে যদি কোনকিছু ভুল হতো তাহলে আমি তা ভাগ্যের কাছে সপে দিতাম। ফার্সি শেখার কারণে আমি সবকিছুর জন্যে নক্ষত্রকে দোষারোপ করতে অভ্যস্ত ছিলাম। কোন কাজ যদি ভেস্তে যেত অথবা আমি যদি কারো দ্বারা আহত হতাম তাহলে আমি আকাশকে অভিশাপ দিতাম :

নিজেকে আমার ভাগ্যের প্রভু ভেবেছি,
আমার একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছে,
কোন কিছুতে ভুল হলে ভাগ্যকে অভিশাপ দেয়া।

আমার উস্তাদ অথবা হোসাইনী খালা কিংবা অন্য কোন প্রবীণ ব্যক্তি অতীতের কথা বলতেন, আমার তখন মনে হতো এখনকার চাইতে ওই দিনগুলো অনেক ভালো ছিল এবং তাদের মতোই কোন কার্যকরণ ছাড়াই বর্তমানের চেয়ে অতীতের প্রশংসা করতাম। যেহেতু মানুষের যৌবনের দিনগুলোই তাদের জীবনের সেরা সময় সেজন্যে সবাই তাদের ফেলে আসা দিনের প্রশংসা করে। একটি ফার্সি প্রবাদ আছে, "জীবনে যদি কারো স্বাদ থাকে, তাহলে গোটা দুনিয়াই জীবন্ত। আর কেউ যদি মৃত অনুভব করে তাহলে তার কাছে দুনিয়া মৃত ।" তরুণরা অন্ধের মতো অনুসরণ করে প্রবীণদের এবং বর্তমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করার অভ্যাস রপ্ত করে ।

আমি যৌবনে পদার্পণ করলে পাপ দ্বারা পুরুষদের আকৃষ্ট করা আমার মূল পেশা হয়ে দাঁড়ালো। অন্যান্য মেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতায় সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করতো আমার সুখ ও দুঃখ। অন্য মেয়েদের মতো সুদর্শনা ছিলাম না আমি, কিন্তু সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্যে আমার জ্ঞানের কারণে আমি তাদের চাইতে পেশায় ভালো করি এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই। এতে অবশ্য আমার কিছু ক্ষতিও হয়। যেহেতু আমি প্রশংসা অর্জন করেছিলাম, সেজন্যে আমার মধ্যে আত্ম-অহংকারের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্য বাঈজিরা তোয়াক্কাও করতো না যে কিভাবে তারা প্রথাগুলো রপ্ত করেছে। আমার বায়না থাকতো এবং অনেক খ্যাতিমান ও অখ্যাত লোকদের বায়না ফিরিয়ে দিতে হতো। অন্যরা যে কারো ডাকে সাড়া দিত আমাদের পেশার রীতি অনুযায়ী। আমি একটু ভিন্ন ধরনের ছিলাম এবং লোকদের সাথে তড়িঘড়ি পরিচিত হতে চাইতাম না। আমার অনুরোধ উপেক্ষিত হলে আমি দারুণভাবে মর্মাহত হতাম। অন্য বাঈজিদের জানার একমাত্র বিষয় ছিল যে তাদের পৃষ্ঠপোষকরা কতো বিত্তবান এবং তার কাছ থেকে তারা কতোটা খসিয়ে নিতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে আমার অধিকাংশ সময় কেটে যেত আমার পৃষ্ঠপোষকদের পারিবারিক প্রেক্ষাপট ও তাদের আগ্রহ সম্পর্কে জানতে। আমার অন্যান্য

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য ছিল যা অনিবার্যভাবে বেশ্যাবৃত্তির সাথে সম্পর্কিত নয় এবং এর ফলে আমি এ পেশায় নিয়োজিত অন্য মহিলাদের চাইতে ভিন্নভাবে চিহ্নিত ছিলাম। তারা আমাকে দেখতো আত্মকেন্দ্রিক, ভাবপ্রবণ ও কিছুটা পাগলাটে হিসেবে। আমি অন্যের কোন কিছু অনুসরণ না করে আমার খেয়াল খুশীতে চলতাম।

অতঃপর এমন একটি সময় এলো যখন আমি আমার পেশাকে অনৈতিক হিসেবে দেখতে শুরু করলাম এবং পেশা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি সকলকে আমার কামরায় স্বাগত জানাতে অস্বীকার করতাম এবং কখনো কখনো শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সাথে দীর্ঘ-মেয়াদী চুক্তিতে আবদ্ধ হতাম । এরপর আমি সেই প্রক্রিয়াও পরিত্যাগ করি এবং জীবিকার জন্যে শুধু নাচ ও গানের ওপর নির্ভর করতে থাকি।

এসব অনৈতিক পথ পরিহার করার পর কোন একজন ব্যক্তির সাথে স্থায়ীভাবে বাস করার ধারণা আমার মধ্যে কাজ করতে থাকে। এই পরিকল্পনাও আমি বর্জন করি, কারণ লোকজন বলাবলি করবে, ওতো একজন বেশ্যা ছিল , এখন রক্ষকের ব্যয়ে চলার ফিকির করেছে।" এ ধরনের কথাবার্তার উৎস হচ্ছে একটি ধারণা যে, কোন বেশ্যা তার যৌবন শেষ করে যখন কোন লোকের সাথে বাস করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তার উদ্দেশ্য থাকে তার অন্তিম সৎকারের ব্যয় পরিশোধ নিশ্চিত করা। সে যখন মৃত্যুপথযাত্রী, তখন তার কফিনের মূল্য আদায় করে। এটা বেশ্যাদের চরম স্বার্থপরতা, লোভ ও প্রতারণামূলক বৈশিষ্ট্যকেই মূর্ত করে তোলে। কোন মহিলা যদি তার অতীত থেকে পিঠ ফিরিয়েও নেয় এবং পরিপূর্ণভাবে সাধ্বীতে পরিণত হয় সেক্ষেত্রেও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার নিষ্ঠাকে বিশ্বাস করবে না। তখনও যদি সে তার সকল আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে কারো প্রেমে পড়ে, তাহলেও তার প্রেমের লক্ষ্য যে পুরুষ স্বয়ং সে এবং যারা এ কাহিনী শুনবে তারাও তা বিশ্বাস করবে না। তার প্রেম পুরোপুরি তাকে পরিত্যাগ করে।

গুজব আছে যে, আমি অত্যন্ত ধনবতী মহিলা। সে কারণে , আমার যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু লোক আমার জন্যে তাদের আকাংখা ব্যক্ত করেছে এবং বিভিন্নভাবে তারা আমাকে তোষামোদ করে। আমার লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করে, যদিও আসল সত্য হচ্ছে যে, আমার চাইতে অনেক সুদর্শনা মহিলার সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। অনেকে আমার গানের উচ্ছসিত প্রশংসা করে, যদিও গান উপলব্ধি করার মতো কান তাদের নেই এবং একটি তাল থেকে আরেকটি তালের পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম। কিছু লোক আছে যারা আমার কবিতা নিয়ে উচ্ছাস প্রকাশ করে যদিও কোন কবিতার একটি পংক্তিও তারা নির্ভূলভাবে আবৃতি করতে পারবে না, কবিতা লিখা তো দূরের কথা। কেউ কেউ আমার জ্ঞানের প্রশংসা করে এবং যদিও তারা নিজেদের পন্ডিত বলে মনে করে, কিন্তু আমাকে সবচেয়ে বিজ্ঞ বলে অভিহিত করে এবং ধর্মতত্ত্ব রোজা ও নামাজের মতো ইবাদতের নিয়ম সম্পর্কিত প্রাথমিক প্রশ্নগুলোর ওপর আমার নির্দেশনা চায়, যেন তারা আমার শিষ্য। অনেকে প্রবলভাবে আমার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগ প্রদর্শন করে। আমি

www.pathagar.com

একটি হাঁচি দিলেও তারা এমন ভাব দেখায় যেন এতে তাদের মাথা ব্যথা হয়েছে। আমার মাথা ব্যথা হলে তারা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়। প্রতিটি বাক্যের সাথেই তারা যোগ করে, "আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন।" অনেকে কল্যাণকামী পরামর্শকের ভূমিকা নেয়। তারা আমার সাথে শিশুতূল্য আচরণ করে।

আমি অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মহিলা, যে বহু ঝর্ণার পানিতে তার তৃষ্ণা মিটিয়েছে। আমি সবসময় নমনীয় দেখাতে চেয়েছি নিজেকে এবং ভান করেছি যে লোকদের দ্বারা দলিত মথিত হতে প্রস্তুত। কিন্তু বাস্তবে আমিই তাদেরকে নাকানিচুবানি খাইয়েছি। আমার কিছুসংখ্যক প্রকৃত বন্ধু ছিল, যারা সংস্কৃতিবান, সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্যরসিক এবং তারা সুন্দর আলোচনা ছাড়া আর কিছুই দাবি করতো না। তারা আমার কাছে বেশী কিছু চাইতো না এবং আমিও তাদের কাছে চাইতাম না। আমার হৃদয়ের গভীর থেকে আমি তাদেরকে পছন্দ করতাম এবং তাদের বন্ধুত্বকে গুরুত্ব দিতাম। এই বন্ধুত্বের মধ্যে যেহেতু চাওয়া পাওয়ার কিছুই ছিল না। অতএব এটাই আমার কাছে সবকিছু হয়ে দাঁড়ালো। তাদের সাহচর্য ছাড়া আমি শান্তি খুঁজে পেতাম না। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের কেউই আমার সাথে স্থায়ীভাবে কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। অতএব আমি সেজন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকবো? তাহলে সেটি হবে কারো যৌবন ফিরে চাওয়ার মতো ব্যাপার।

একজন মহিলার আসল জীবন ততোদিনই টিকে যতোদিন তার যৌবন থাকে। আহ্, যৌবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে জীবনেরও যদি অবসান ঘটতো, তাহলে কতোই না ভালো হতো! বার্ধক্য সকলের জন্যেই কষ্টদায়ক–বিশেষ করে মহিলাদের জন্যে। আর আমার পেশার মহিলাদের ক্ষেত্রে বার্ধক্য অনিবার্যভাবে জাহান্নামের চিত্র। আপনি যদি লক্ষ্ণৌর রাস্তায়, অলি গলিতে কোন বৃদ্ধা মহিলা ভিখারিনীকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, যৌবনে তাদের অধিকাংশই বেশ্যা ছিল–তাদের অনেকে এতো সুন্দরী ছিল যে, এমনকি অহংকারে মাটিতে পা ফেলতেও তাদের অনীহা ছিল। তারা পুরুষের জীবনে বিপর্যয় এনে দিয়েছে, হাজারো সমৃদ্ধশালী বাড়ি উজাড় করেছে এবং শত শত নিরীহ তরুণকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিয়েছে। তারা যেখানে যেতো পুরুষরা তাদের পা ফেলার জন্যে দৃষ্টির গালিচা বিছিয়ে দিতো। এখন কেউ তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ তাদের সঙ্গলাভে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। তাদের কোন কষ্ট হোক কেউ তা চাইতো না। তখন সময় ছিল তাদের কেউ না চাইলেও তাদের ওপর মুক্তা ছড়িয়ে দেয়া হতো। এখন তারা ভিক্ষা করে এবং এক টুকরো শুকনা রুটিও আর তাদের ভাগ্যে জোটে না।

এই মহিলারা আসলে তাদের নিজেদের মাথার ওপরই সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আমি একজনকে জানতাম যে একসময় বিখ্যাত বাঈজি ছিল এবং প্রচুর বিত্তের মালিক হয়েছিল। সে বলা যায় পুরুষদের অনুরক্ত হতো। তার যৌবন যখন ফুরিয়ে গেল তখন নিজের অর্থে পুরুষদের বিনোদন করতে শুরু করলো। তার বার্ধক্যে এক তরুণ, সুদর্শন

www.pathagar.com

বিবাহিত লোকের সাথে বাস করতে লাগলো, যে লোকটি স্পষ্টতঃই তার প্রেমে পড়েনি। মহিলাটিকে গ্রহণ করার আসল কারণ লোকটি তার স্ত্রীকে অবহিত করে। দম্পতিটি বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হতো এবং কোন না কোন অজুহাতে তার অর্থসম্পদ বাগিয়ে নিতো। তার অর্থ নিঃশেষিত হলে তারা তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এখন সে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে।

কিছু মূর্খ বাঈজি কম বয়সী মেয়েদেরকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাদের খুব ঘনিষ্ট থাকার চেষ্টা করে। এই মেয়েগুলো যখন বড় হয় তখন নিজেদের মর্জিমত চলে এবং তাকে দত্তক নেয়া বাঈজিদের ছেড়ে চলে যায়। কেউ যদি রয়েও যায় তাহলে সে ধীরে ধীরে সবকিছুর ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং দত্তক গ্রহণকারীকে বাড়ির পরিচারিকা বা রাঁধুনীর পর্যায়ে নামিয়ে আনে । আবাদিও আমার ক্ষেত্রে ঠিক এই কাজটিই করেছিল এবং আমার সবকিছুই সে লুটে নিতো যদি আমি সময় মতো হুশিয়ার না হতাম। বাঈজিদের অবরুদ্ধ জগতে ভালোবাসা বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই। কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন কোন লোক কোন বাঈজির প্রেমে পড়বে না। কারণ সে জানে যে বাঈজি কারোই হতে পারে না। তাছাড়া একজন বাঈজির আরেক বাঈজির প্রতি কোন রকম মমত্ব থাকে না। কারণ অনিবার্যভাবে তাদের মাঝে থাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটি আরো প্রবল হয়ে দেখা দেয় কেউ কোন মেয়েকে দত্তক নিলে। তরুণী বাঈজি শিগ্‌গিরই তার লালনকারীকে বুঝিয়ে দেবে যে, যেহেতু আয় উপার্জনের সব কাজ তাকেই করতে হয় অতএব তার অর্থ নেয়ার অধিকার অন্য কারো থাকতে পারে না। কোন বাঈজি যখন তারা রূপলাবণ্য হারাতে থাকে, তার সাবেক প্রশংসাকারীরা তার প্রতি ক্রমশঃ শীতল হতে শুরু করে। সে যেহেতু তোষামোদে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল অতএব কেউ তোষামুদ ও প্রশংসা না করলে তার জীবন অসহনীয় ও বিষবৎ হয়ে পড়ে। এতে পুরুষরা তাকে আরো এড়িয়ে চলে এবং পরিবর্তে সকল পুরুষের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ পোষণ করতে শুরু করে।

এক সময়ে আমি বাঈজিদের কাছ থেকে পুরুষ মানুষের বিশ্বাসহীনতার দীর্ঘ কাহিনী শুনতাম এবং তারা যা বলতো বেশী কিছু না ভেবেই তাদের সাথে একমত পোষণ করতাম। গওহরকে আমি মনে করি না যে মহিলাদের চাইতে বেশী বিশ্বাসঘাতক। বিশেষ করে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত মহিলাদের চেয়ে তো নয়ই। আমার এ ধরনের কথা বলায় আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি বলতে চাই যে, প্রেমের ব্যাপারে পুরুষরা গভীরভাবে আন্তরিক এবং মহিলারা চরম ধূর্ত। প্রেমের বিনিময়ে অধিকাংশ পুরুষ সৎ, আর অধিকাংশ মহিলা শুধু প্রেমের ভান করে। পুরুষ মানুষ প্রেমের ঘোষণায় তড়িঘড়ি করে এবং গভীরভাবে জড়িত হয়ে যায়, মহিলারা সময় নেয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করে। একারণেই পুরুষের ভালোবাসায় দ্রুত ভাটা পড়ে। আর মহিলারা স্থির থাকে। যদি দু'জনই, অথবা অন্ততঃ তাদের একজনও যদি একটু মাথা খাটায় তাহলে সন্তোষজনক নিষ্পত্তিতে উপনীত হতে পারে এবং সুন্দর জীবন কাটাতে পারে।

www.pathagar.com

প্রেমের ব্যাপারে পুরুষ মানুষ সহজে বিশ্বাস করে, আর মহিলারা থাকে সন্দিগ্ধ। মহিলাদের মর্জির কাছে পুরুষ সহজে ধরা দেয়, আর অন্যদিকে পুরুষের মাধুর্যে মহিলারা খুব সহজে প্রলুব্ধ হয় না। আমার বিশ্বাস যথার্থ যে কোন কারণেই আল্লাহ পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। মহিলারা যেহেতু দুর্বল, সেজন্যে তা পূরণের জন্যে তাদেরকে অন্যান্য ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে সহজে প্রেমে পড়ার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতাও একটি। আমি বলতে চাই যে এটি আসলে একটি গুণ, যা তাদের সকল দুর্বলতাকে পুষিয়ে দেয়। প্রাণীজগতেও এই নিয়মটি কার্যকর। দুর্বল প্রাণী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়।

অধিকাংশ পুরুষ ভাবে যে, মহিলারা সুন্দরী। এই চিন্তার সাথে আমি একমত নই। আসলে নারী পুরুষ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে সুন্দর নয়। নারী বা পুরুষ প্রত্যেককে এক ধরনের সৌন্দর্য দিয়ে দেয়া হয়েছে তা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করে। যদিও প্রতিটি সুদর্শন মানুষই প্রশংসা লাভ করে , কিন্তু কোন পুরুষের চেহারার প্রকৃত বিচারক একজন নারী এবং নারীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষ। কিন্তু একজন নারীর কাছে সবচেয়ে সুন্দর নারীও সুগন্ধিবিহীন সুন্দর একটি ফুল ছাড়া আর কিছু নয় এবং যে পুরুষদের অন্য পুরুষরা কুৎসিৎ ভাবে নারীর কাছে তারাও মনোমুগ্ধকর।

কিন্তু পুরুষ ও নারী উভয়ই ইন্দ্রিয়গত আবেগকে আয়ত্ত্ব করতে ব্যর্থ হয়, যার ফলে এ বিষয়ে উভয়ের ধারণা পুরোপুরিই ভিন্নতর হয়ে যায়। একজন পুরুষ কোন নারীর মধ্যে যে গুণগুলো পেতে চায় একজন নারী কোন পুরুষের মাঝে সেগুলো পেতে চায় না।

যেসব পুরুষ বিত্তশালী মহিলার সেবায় ন্যস্ত থাকে অথবা যারা বয়সে তরুণ তারা বয়স্কা মহিলার ভালোবাসার স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, নারীর কাছে ভালোবাসার মর্ম কি।

এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে মহিলারা বয়স্ক পুরুষের চাইতে তরুণদের অগ্রাধিকার দেয়। এই অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রেও তরুণদের মাধুর্য অথবা সৌন্দর্য তাদের আকর্ষণের মূল কারণ হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং নিজেদের দুর্বলতার কারণে আকৃষ্ট হয়, তারা নিজেদেরকে কোন হেফাজতকারীর অধীনে দেখতে চায় বলে। তরুণরা সুদেহী বলে সমস্যা মোকাবেলায় বয়স্কদের চাইতে অধিক নির্ভরতা দিতে পারে।

একজন পুরুষ মানুষের কাছে প্রেম হচ্ছে আনন্দের সন্ধান। আর মহিলাদের ক্ষেত্রে আনন্দের সন্ধানের পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যেহেতু বিশ্বাস করা হয় যে, প্রেম তখনই খাঁটি হতে পারে যখন এর কোন উদ্দেশ্যে থাকে না। মহিলারা যেহেতু নিরাপত্তা খোঁজে, অতএব এই উদ্দেশ্যে গোপন রাখতে চেষ্টা করে।

লোকজন যদি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু মাথা ঘামায় তাহলে তাদের জীবনের বহু জটিলতা এড়াতে পারে। পুরুষ ও মহিলারা যদি তাদের উপযুক্ত অবস্থান এবং তারা আসলে কি চায়, সে সম্পর্কে জানতো তাহলে তারা নিজেদেরকে বহু অপ্রীতিকর

www.pathagar.com

পরিস্থিতির থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হতো। সমস্যা হচ্ছে কেউ যদি কোন উপদেশ দিতে চায়, তাহলে তৈরি উত্তর থাকে, "কপালে যা লিখা আছে তা কেউ খন্ডন করতে পারে না।" এর অর্থ হচ্ছে লোকদের বলা যে তারা নিজেদের কাজ নিয়ে থাকুক এবং তাদেরকে যা খুশী তা করার স্বাধীনতা দিক। যেহেতু তারা যা কিছু করছে তা কপালের লিখনের কারণেই করছে, সেজন্য তারা মনে করে যে তাদের কর্মের পরিণতির জন্যে কিছুতেই তারা দায়ী নয়। সবকিছুর জন্যে দায়ী করা হয় আল্লাহতা'য়ালাকে–তিনি ক্ষমা করুন। এ ধরনের অর্থহীন কথাবার্তার কোন মানে পুরনো দিনে থাকতে পারতো, যখন কোন কিছু সহজে পরিবর্তিত হতো না, কিন্তু এখন এসব অর্থহীন। এ প্রসঙ্গে অযোধ্যার বাদশাহদের দিনের একটি কাহিনী আমার মনে পড়ছে।

বলা হয় যে, একদিন এক সিপাই মুক্তা প্রাসাদের ফটকের কাছে ঘুমাচ্ছিল। দরিদ্র ছিল বলে তার পরনে ছিল ছেঁড়া ময়লা জামা। ঠিক সেদিনই বাদশাহ সে পথে সকালের পায়চারি করছিলেন। তার সাথে কোন প্রহরী ছিল না। কেউ জানে না যে তার মনে কি উদয় হয়েছিল। তিনি নিদ্রিত সিপাইকে জাগিয়ে দেন। সে চোখ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়ায়। বাদশাহকে সামনে দেখে চমকে উঠে। নিজেকে কোনমতে সামলে নেয় এবং তার হতদশার কথা মনে হয়। বাদশাহকে সে তার তরবারি উপহার হিসেবে দেয়। তরবারিটি পুরনো এবং জং ধরে গেছে। বহু কষ্টে খাপ থেকে তরবারি বের করলো সে। বাদশাহ অস্ত্র গ্রহণ করেন, ভালো ভাবে পরখ করে তরবারির চমৎকারিত্বের প্রশংসা করেন। তিনি আবার সেটি খাপে ভরে কোমরবন্দে বেঁধে নেন। এরপর নিজের সোনার হাতল সম্বলিত দামেশকীয় তরবারিটি বের করে সোনাখচিত কোমরবন্দসহ সিপাইকে প্রদান করেন। সেই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন অযোধ্যার প্রধান উজির হুজুর আলম আলী নকী খান। বাদশাহ সেই সিপাহী ও তার তরবারির উল্লেখ করে বলেন , "দেখুন, যৌবন কি চমৎকার! এবং সে আমাকে কি সুন্দর এক তরবারি দিয়েছে!" তিনি পাশ থেকে তরবারি বের করে উজিরকে দেখান। "এটি লক্ষ্য করে দেখুন।"

"আলহামদুলিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর," উজির বিস্ময়ের সাথে বলেন , "জাঁহাপনা, এমন একজন লোক ও এমন একটি তরবারি খুঁজে বের করার জন্য আপনার মতো রত্নের বিচারক থাকতে হবে।"

"কিন্তু আমি যে তরবারি দিয়েছি, সেটিও একেবারে খারাপ নয়," বাদশাহও বিস্মিত হয়ে বললেন।

"হে আল্লাহর ছায়া,–আপনার তরবারি কি করে ভালো না হয়ে পারে!" উজির উত্তর দিলেন।

"তার পোশাক মানানসই নয়," তরুণ সৈনিকের দিকে তাকিয়ে বাদশাহ বললেন। ইতিমধ্যে তার সভাসদ, ভৃত্য, প্রহরীরা এসে উপস্থিত হলো, যারা ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল কৌতুহল নিয়ে।

www.pathagar.com

"মহামহিম যথার্থ বলেছেন," উজির একমত হয়ে বললেন।

"আমাদের পোশাকে তাকে কেমন দেখায়, তা দেখা যাক," বাদশাহ বললেন। সভাসদরা ইঙ্গিতটি বুঝতে পারলেন। তারা প্রাসাদে গেলো এবং প্রচুর পরিমাণে শাহী বস্ত্রাদি নিয়ে ফিরলো। বাদশাহ তার জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, মুক্তার মালা, হীরার কণ্ঠহার খুলে সৈনিককে দিলেন। সৈনিক যখন বাদশাহ পোশাক পরিধান করলো তখন বাদশাহ বললেন, "এখন তাকে দেখুন।"

"বাস্তবিক পক্ষেই তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ মনে হচ্ছে," উজির বললেন। সভাসদরাও সৈনিকের প্রশংসা শুরু করলেন। বাদশাহ শকট এলে তিনি তাতে আরোহণ করে বায়ু সেবনে চলে গেলেন।

সৈনিক প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরে এলো। গহনা নির্মাতা, মহাজন ও দালালরা তাকে অনুসরণ করলো। বাদশাহ প্রদত্ত দানের তারা মূল্য নির্ধারণ করলো পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক।

তরুণ নাজিব নামে এক সেনাধ্যক্ষের পল্টনে মাসে সামান্য তিন টাকা বেতন পেত সে। আগের রাতে খেতে বসে বউ এর সাথে ঝগড়া হয়েছিল তার। রাগে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং সারারাত শহরের রাস্তায় ঘুরে বিক্ষিপ্তভাবে। এক সময় ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে মুক্তা প্রাসাদের ফটকে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপরই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটে। ভাগ্য তাকে সকালে জাগিয়ে দেয় এবং তার অনুকূলে হাসে। এক নিংশ্বাসে সে পথের ভিখারী থেকে রাজপুত্রে পরিণত হয়েছে।

বাদশাহী আমলে এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। আসলে এগুলো সম্ভব ছিল শাসন ক্ষমতা মাত্র একজন লোকের হাতে ছিল বলে এবং তিনি আইনের উর্ধে ছিলেন। দেশকে তিনি মনে করতেন নিজস্ব জাগীর এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বৃটিশ শাসনাধীনে এ ধরনের অপচয়ের কোন সুযোগ ছিল না। কোন কারণ ছাড়া কাউকে বিপুল অংকের অর্থ দিয়ে দেয়াকে দোষণীয় বিবেচনা করা হতো। বর্তমান ব্যবস্থায় বাদশাহ থেকে শুরু করে ভিক্ষুক পর্যন্ত সকলে আইনের শাসনে আবদ্ধ। আইন যদি কোন ব্যতিক্রম করে অথবা কোন সুবিধা দেয় তাহলে এ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। ভাগ্য ক্ষমতাহীন হয়ে গেছে। এখন কেউ শুধুমাত্র প্রচেষ্টা দ্বারাই সাফল্য লাভ করতে পারে।

নওয়াব চব্বন, যিনি আমার জীবনের পৃষ্ঠা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন তার কি ঘটেছিল তা আপনাকে বলছি। একথা সত্য যে তিনি নদীর দিকে গিয়েছিলেন এবং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন আর উঠে না আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। কিন্তু জীবন সবার ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত এক ব্যাপার। তার দম যখন বন্ধ হয়ে আসছিল তখন শেষবারের মতো দম নিতে পানির ওপরে মুখ তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এরপর অনিচ্ছার সাথে তার হাত ও পা দিয়ে পানিতে ঝাপটা দিতে শুরু করেন। আবার তিনি পানির নিচে ডুব দেন এবং একই

www.pathagar.com

কারণে আবার পানির ওপর ভেসে উঠেন । ইতিমধ্যে তিনি স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে চত্তর মঞ্জিল পর্যন্ত চলে গেছেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সিংহাসনের এক উত্তরসূরী তার ইয়ারদোস্তদের নিয়ে নৌবিহারে বের হয়েছিলেন। ডুবন্ত মানুষটির ওপর তার চোখ পড়ে এবং তিনি মাঝিদের নির্দেশ দেন তাকে পানি থেকে তুলে আনতে। নওয়াব চব্বন প্রাণপণ চেষ্টা করেন উদ্ধারকারীদের হাত থেকে ছুটে যেতে, কিন্তু পেরে উঠেন না। তারা তাকে তীরে তুলে আনে। শাহজাদা দেখতে পান যে লোকটি অভিজাত বংশের। তিনি তার কাপড় বদলে তাকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন।

নওয়াব চব্বন অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। এছাড়া তিনি মার্জিত স্বভাবের এবং জানতেন যে কোথায় কিভাবে আচরণ করতে হবে। তিনি অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ও সুরসিক এবং যথার্থই একজন শাহজাদার সহচর হওয়ার উপযুক্ত। মোটা অংকের বেতনে তাকে শাহজাদার সভাসদ হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্য তাকে অগ্রীম অর্থ প্রদান করা হলো। তাকে ভৃত্য, প্রহরী, ঘোড়ার গাড়ী দেয়া হলো এবং তিনি আগের চাইতেও অধিক জাঁকজমকের সাথে জীবনযাপন করতে লাগলেন। তিনি চক দিয়ে অতিক্রম করতেন হাতিতে চড়ে এবং তার সামনে পিছনে থাকতো পঞ্চাশজন পদাতিক সৈন্য এবং সামনে ঘোষক ও সতর্ক করার লোকজন। বিসমিল্লাহ জান এবং আমি এ দৃশ্য দেখতাম অবিশ্বাস নিয়ে। আমরা পুরো কাহিনী জানতে পারলাম নওয়াব চব্বনের বহরে শামিল মাখদুম বখশের কাছ থেকে। ভাগ্যের এই পরিবর্তনে নওয়াব চব্বনের চাচা তার সিদ্ধান্ত পাল্টে পূর্বের ব্যবস্থামতো তার কন্যার সাথে চব্বনের বিয়ে দেন। আমরাও বিয়েতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। খানুম একটি সুন্দর শাল ও ওড়না উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু নওয়াব চব্বন আমাদের কোঠায় আর কখনো আসেননি। কারণ বিসমিল্লাহ জানের সাথে তার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে তাকে শপথ নিতে হয়েছিল।

রাজতন্ত্রের যুগেই এ ধরনের ঘটনা ঘটা সম্ভব ছিল। ইংরেজ শাসনামলে কখনো এমন কিছু ঘটেনি। ইচ্ছামতো চলার স্বাধীনতার দিনগুলোর অবসান ঘটেছিল। আমাদের বলা হতো যে সম্পদ অন্ধ। কিন্তু দেখা গেল যে কোন অস্ত্রোপচারের অলৌকিকত্বে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা হলো এবং সে এখন আহম্মক ও যোগ্যতাসম্পন্নের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম।

রাজতন্ত্রের সময়ে প্রথম অক্ষরটি পর্যন্ত জানে না এমন লোকদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হতো। কি করে তারা কাজকর্ম পরিচালনা করতো তা ভাবলে যে কারো অবাক হওয়ার কথা। আরো হাস্যকর ব্যাপার ছিল তা হিজড়া বা খোজাদেরকে পদাতিক পল্টন ও অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ করার মতো বিষয়গুলো। যার ফলে ভাগ্য সব সময় পরাভূত হতো এবং বিজ্ঞতার বিজয় ঘটতো। এখন ব্যক্তির মেধাকে মূল্য দেয়া হয়। মেধার বিকাশ যেহেতু নির্ভর করে খ্যাতি অর্জনের ওপর, অতএব দেখা যায় যে সক্ষম ও জ্ঞানী লোকজনকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। যেহেতু কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি ভাগ্য ও স্বাধীন ইচ্ছার দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। এরপর আমি একটি উপসংহারে পৌঁছি যে, মানুষ "ভাগ্য' শব্দটি সম্পর্ণ ভুলভাবে ব্যবহার করে। এর অর্থ যদি এটা হয় যে, আল্লাহ আমাদের ভাগ্য সম্পর্কে জানেন, তাহলে শুরু থেকেই ভাগ্য নিয়ে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। শুধুমাত্র একজন অবিশ্বাসীই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ তাদের অপকর্মের ফলাফলের জন্যে ভাগ্যকে দোষ দেয়। এটা আল্লাহর চিরন্তন ক্ষমতার ওপর দোষারূপ এবং স্পষ্টতই খোদাদ্রোহিতার শামিল।

আমার সত্যিই দুঃখ হয় যে, এই বিষয়গুলো আমি আরো আগে উপলব্ধি করতে পারিনি। কেউ আমাকে এসব বিষয়ে বলেনি এবং আমিও নিজ থেকে এগুলো শেখার মতো দূরদৃষ্টিতাসম্পন্ন ছিলাম না। মৌলভি সাহেব আমাকে সামান্য যা শিখিয়েছেন তা আমার অনেক কাজে লেগেছে। তখন আমি এ সবের কোন গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভালোভাবে সময় কাটানো ও আরাম আয়েশের মধ্যে থাকা। তাছাড়া আমার অনেক ভক্ত অনুরক্ত ছিল, যে কারণে নিজের জন্যে আমার খুব কম সময়ই থাকতো। তারা যখন আমার জীবন থেকে এক এক করে ঝরে পড়তে থাকলো এবং আমার ভালো কিছু করার ছিল না অতএব বইপত্রের প্রতি আমি আগ্রহ বোধ করতে থাকি।

আমার মধ্যে যদি পড়াশোনার এই আগ্রহ সৃষ্টি না হতো তাহলে আমার পক্ষে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। আমি হয়তো আমার হারানো যৌবন ও পুরনো গুণগ্রাহীদের হারিয়ে ফেলার দুঃখে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতাম। প্রথমে আমি গল্প উপন্যাস পাঠ করে সময় অতিবাহিত করতাম । একদিন আমার পুরনো বইগুলো বের করে রোদে ছড়িয়ে দিয়েছি। এসবের মধ্যে ছিল 'গুলিস্তাঁ', যেটি মৌলভী সাহেব আমাকে পড়িয়েছিলেন। বইটি পৃষ্ঠা উল্টাতে শুরু করি। আমার মনে পড়ে একটি শিশু হিসেবে আমি বইটি পড়ছে পছন্দ করতাম না, কারণ এটি দিয়েই আমার শিক্ষা শুরু হয়েছিল এবং এর বিষয়বস্তু আমার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে মনে হতো। এবং যেহেতু আমি অজ্ঞ ছিলাম, অতএব এর মর্মও উপলব্ধি করতে পারিনি। এখন আমি এটি বার বার পড়ি, প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। প্রতিটি পংক্তি আমার হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নেয়। এরপর আমি কাউকে 'আখলাক-ই নাসিরি' নামে একটি গ্রন্থের নাম বলতে শুনি এবং তার কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করি। এটি একটি কঠিন গ্রন্থ, কারণ এর মধ্যে বহু আরবী শব্দ আছে। আমি এক সাথে অল্প কিছুটা পাঠ করতাম বলে বইটি শেষ করতে অনেক মাস লেগে গেছে। এরপর শুরু করি 'দানিশ নামা গিয়াস মনসুর' যেটি নাওয়াল কিশোর প্রেস থেকে তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এটির পর যুক্তি শাস্ত্রের দু'টি বই 'সুগরা' ও 'কুবরা' পাঠ করি। পড়তে গিয়ে যে অংশ আমি বুঝতাম না, তা অন্যের কাছ থেকে বুঝে নিতাম। এগুলো পড়তে গিয়ে আমার মনে হতো যে বিশ্বের রহস্য যেন আমার সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। এই বইগুলো পড়ে শেষ করার পর আমি উর্দু ও ফার্সি ভাষায় আরো

www.pathagar.com

অনেক বই পড়ি এবং আমার মন এতে সমৃদ্ধ হয়। আমি আনোয়ারী ও খাকানির লিখা ফার্সি কাসিদার ওপর চোখ বুলাই। কিন্তু এসব কাসিদা আমাকে আকৃষ্ট করেনি. যেহেতু মিথ্যা প্রশংসার কোন প্রয়োগ ছিল না। অতএব আমার আলমিরা থেকে কাসিদার বই নামিয়ে ফেলি।

আমি বেশকিছু সংবাদপত্র পাই এবং দুনিয়ায় কি ঘটছে সেসবের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখি। জীবনের শেষ পর্যন্ত চলার মতো সঞ্চয় আমার আছে, যা সম্ভব হয়েছে আমার মিতব্যয়িতার কারণে। পরবর্তী জীবনে আল্লাহই আমার দেখাশোনা করবেন। আমি সত্যিকার অর্থেই একজন অনুশোচনাকারী এবং যতোটা আমার পক্ষে সম্ভব, আমি নামাজ পড়ি, রোজা রাখি। আমি বোরখা পরি না এবং পর্দার অন্তরালে অবরুদ্ধ জীবন কাটাই না, যে কারণে আল্লাহ চাইলে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু যারা পর্দা পালন করে আমি তাদেরকে আমার হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া করি। আল্লাহ তাদের স্বামী ও ঘরকে হেফাজত করুন এবং পৃথিবীর বিলয় পর্যন্ত আল্লাহ তাদের সচ্চরিত্র অক্ষুন্ন রাখুন।

শেষ করার আগে আমার পেশায় নিয়োজিত মহিলাদের উদ্দেশ্যে আমি ক'টি কথা বলতে চাই। যে কথাগুলো তাদের হৃদয়ে খোদাই করে নেয়া উচিত । হে বোকা মেয়েরা! কখনো এই বিভ্রান্তির মধ্যে থেকো না যে কেউ তোমাদের সত্যিকার অর্থে ভালোবাসে। তোমাদের প্রেমিকরা, যারা আজ তোমাদের জন্যে তাদের জীবন উৎসর্গ করার শপথ উচ্চারণ করে, কিছু পরেই তোমাদের জীবন থেকে তারা সটকে পড়ে। তারা কখনো তাদের শপথে স্থির থাকে না, কারণ তোমরা স্থিরতার যোগ্য নও। সত্যিকার প্রেম সেইসব মহিলাদের জন্যে যারা একজন মাত্র পুরুষের মুখ দেখে। আল্লাহ কখনো কোন বেশ্যাকে খাঁটি প্রেমের উপহার মঞ্জুর করবেন না।

আমি আমার জীবন অতিবাহিত করেছি, এখন জীবনাবসানের প্রতীক্ষা করছি। আমার জন্যে যতোদিন নির্ধারিত ততোদিন পর্যন্ত আমি পৃথিবীর বাতাসে নিঃশ্বাস নেব। আমার ভাগ্যের সাথে আমি বুঝাপড়া করে নিয়েছি। আমার সকল ইচ্ছা আকাংখা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং আর কিছু আমি চাই না; যদিও আকাংখা হচ্ছে শয়তানের মতো, যা দেহ থেকে শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলা সম্ভব হবে না। আমি আশা করি আমার জীবনের এই কাহিনী কিছু লোকের কিছু কল্যাণ করবে। এই দু'টি লাইন দিয়ে এবং পাঠকরা আমার জন্যে দোয়া করবে এই আশা নিয়ে আমি শেষ করছি :

আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, মৃত্যু অতি নিকটে
আমি তো জীবনের তলানি পর্যন্ত পান করেছি।

—0—